বাবু গৌরবের কলকাতা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল—১৯৫৭

প্রকাশিকা :
শাওনি ঘোষ
কাঁচরাপাড়া
২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

রমাপদ চৌধুরী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই গ্রন্থের প্রায় সব লেখাই পূর্বে প্রকাশিত। 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার', 'দেশ', 'অমৃত' ও রবিবারের 'যুগান্তর' ইত্যাদি সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সময়ে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিকে প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি গ্রন্থের আকারে এখন ধরে ফেলা হল। 'বাবুসংস্কৃতির' বিভিন্ন দিককে তুলে ধরাই হল বর্তমান লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এখন গ্রন্থটি সমাদৃত হলেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক।

লেখক

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে একপ্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

'বাবু'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খুড়ী তুড়ি যশ দান
আখড়া বুলবুলি মজিয়া গান
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥

'কলকাতা' সম্পর্কিত প্রাচীন ছড়া থেকে।

লেখকের অন্য বই :

দুই মধুসূদন
পুরনো কলকাতার নায়িকা



॥ বাবু গৌরবের সোনালি সকাল ॥

সে এক ভ্যাপসা দুপুর। ভাদ্রমাস। মাথার ওপর ঠেলে উঠছে জলভরা কালো মেঘ। নদীর জলে, গাছের পাতায় ছায়া নামছে। মাঝে মাঝে এক পসলা বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। তবে তা বেশিক্ষণ থাকছে না, কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসছে এক ঝলক ঝকঝকে রোদ। চলছে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। কখনো রৌদ্র, কখনো মেঘ।

সে এক আশ্চর্য দুপুরে গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে চার পাঁচখানা বাণিজ্য জাহাজ চলেছিল উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে। যাঁরা কলম্বাসের কাহিনী পড়েছিলেন তাঁদের হয়ত এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ ঐ কলম্বাসের কথা মনে হতে পারত। জাহাজগুলির মাথায় কোম্পানীর নিশান। উঁচু মাস্তুল। বেজায় উঁচু। সেই মাস্তুলের ওপর মাঝে মাঝে উড়ে এসে বসছিল গাংচিল। পতাকা উড়ছিল পত্‌পত্‌ করে।

জাহাজগুলি চলেছিল ধীর ও মন্থর গতিতে। এই বাংলাদেশের জমিদারেরা যেমন আগে পিছে বরকন্দাজ নিয়ে চলতেন, এই জাহাজগুলিও তেমান করে নিয়ে চলছিল ছিপ-বোট-ভাউলিয়া ইত্যাদি।

ভাদ্রমাসের নদী এমনিতেই ভরা, এর ওপর এসেছে ভরা জোয়ার। সুতরাং জলভারে নদীটা টলমল টলমল করছিল। একূল-ওকূল কোনো কূলই চোখে পড়ছিল না। কেবল জল আর জল, অবিরাম জল। তীব্র কুটিল জলস্রোত। ঐ স্রোতের আঘাতে ভেঙে পড়ছিল পাড়, নামছিল ধস্‌।

ক্যাপটেন ব্রুক, সাদা মুখো লাল চুলো এক সাহেব, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ এঁটে কলম্বাসের মতন সত্যি সত্যিই চেষ্টা করছিলেন এক অজানা দেশ আবিষ্কারের।—'তবে ভালো করে দূরবীণ আঁটার আগেই কপালের ঘামে দূরবীণের কাঁচ আসছিল ঝাপসা হয়ে, অস্বচ্ছ হয়ে আসছিল দৃষ্টি'।

এদিকে ভ্যাপসা গরমে সব জাহাজীরই শরীর করছিল আইঢাই। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি বৃষ্টি নামে!

সাঁকরাইল পৌঁছুনোর পর জাহাজগুলিকে থামবার নির্দেশ দিলেন সাহেব। সঙ্গে ছিলেন কোর্তাকুর্তিপরা আরেক সাহেব, এঁর নাম জব চার্নক। দীর্ঘদিন এ দেশে থাকার দরুণ এঁর চামড়া একটু তামাটে। পোষাকে-আশাকে অনেকটা নেটিভদের ভাব। গম্ভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে এঁরা যেন কী সব পরামর্শ করলেন, জব চার্নক চোখে তুলে নিলেন দূরবীণ, আর তারপরেই চীৎকার করে উঠলেন, 'ইউরেকা—ইউরেকা'—

এরপরই উত্তেজনায় উদ্বেলিত তরঙ্গে জাহাজীদের দেহ মনে খেলে গেল শিহরণ! জব চার্নক এবং আরো কয়েকজন জাহাজ থেকে নেমে এলেন ছোট নৌকোয়। এরপর ঐ নৌকো স্রোত ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পূব দিকের নদী তীরে। জব চার্নকের চোখমুখ সেদিন নতুন দেশ আবিস্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত।

এই নতুন দেশ আর কিছু নয়, গ্রাম সুতানুটি। গ্রাম সুতানুটির হাটের কাছেই একটি জায়গায় এসে এঁরা নৌকো বাঁধলেন। কয়েকমাস আগে এখানে এসেছিলেন, বেঁধে গিয়েছিলেন কয়েকটি চালাঘর, ছাউনী। পাকাপাকি ভাবে এখানে এসে থাকবেন, এই ছিল এদের ইচ্ছে। কিন্তু আজ এখানে এসে একবারে বোকা বনে গেলেন!—কোথায় চালা? কোথায় ছাউনী? অজানা এক জাদুকরের হাতের খেলায় তারা অপস্থত। ঐ চালাঘরের এক টুকরো বাঁশও তাঁরা খুঁজে পেলেন না। আর খড় বা গোলপাতার কথা না তোলাই ভালো।

এদিকে এই গ্রাম সুতানুটির মাটিতে এই বিষণ্ণ অপরাহ্ণে যে দু'দণ্ড দাঁড়াবেন, তাও সম্ভব হল না। চারদিকে গাছপালা আর জঙ্গল। এঁটেল মাটিতে পা ডুবে যায়। মাছি আর ডাঁসের উৎপাতে তিষ্ঠানো দায়। এমন সময় আকাশ ফুঁড়ে নামল বৃষ্টি। উঃ সে কী বৃষ্টি—কী বৃষ্টি! চারদিকে নেমে এলো রাত্রের অন্ধকার।—চারদিক মুখর হয়ে উঠল ব্যাঙের ডাকে। ঝিঁঝিঁর আওয়াজ।

নিরাশ্রয় ও নিরুপায় সাহেবরা শেষ পর্যন্ত নৌকোতেই ফিরে গেলেন।

তবে এই অল্প সময়ের ভেতরেই একটি তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করলেন। পেলেন একটি ষড়যন্ত্রের আভাস। আবিষ্কার করলেন এক চক্রান্তকারী নায়ককে।

এই নায়ক আর কেউ নন, 'মল্লিক বরকুদার'।

জাহাজে ওঠবার পর এ দিনের স্মৃতি কথায় এঁরা লিখলেন: 'এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয়। আমাদের আশ্রয় নেবার মতন উপযুক্ত কোনো স্থানই নেই। যা কিছু সবই গেছে। বৃষ্টি, শুধু রাত দিন বৃষ্টি! নদীর ওপর নৌকোতে বাসও স্বাস্থ্যকর নয়। এর আগে এই সুতানুটির মধ্যে যে দু একখানি চালা ঘর রেখে গিয়েছিলাম, তার চিহ্নমাত্র নেই—'নাথিং বিয়িং লেফ্ট ফর আউআর অ্যাকোমোডেসন্।' আমরা এখান থেকে চলে যাবার পরেই মল্লিক বরকুদার এবং কিছু লোক যা ছিল সব দিয়েছে জ্বালিয়ে এবং যা-পেয়েছে নিয়ে পালিয়েছে।'

জব চার্নক, ক্যাপটেন ব্রুক এবং অন্যান্য সাহেবরা যদিও সে রাতের জন্য জাহাজে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরে যাবার জন্য তাঁরা এখানে আসেন নি। সেদিন থেকে তাঁরা রয়ে গেলেন এই নতুন দেশে। আমেরিকার কাছে কলম্বাসের আগমনের দিনটি যেমন স্মরণীয়, শহর কলকাতার ইতিহাসে এই দিনটিও অনুরূপভাবে মনে রাখবার মত। এ দিনের তারিখ হল, চব্বিশে আগষ্ট, খ্রীষ্টাব্দ ষোলশ নব্বই।

হুগলীর কুঠিতে সেবার গণ্ডগোল চরমে উঠেছিল। তাই সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন জব চার্নক। এই পলাতক সাহেবটি হঠাৎ পেয়ে গেলেন আবিষ্কারক কলম্বাসের সম্মান। এ যেন হঠাৎ লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার মত। রাখাল ছেলে বনে গেল রাজা।

তা রাজা যেই হোন না কেন, বিপরীত দিক থেকে একটি প্রশ্ন থেকে যায়।

জব চার্নক যে দেশ আবিষ্কার করলেন, সে কাদের দেশ? কোন দেশ?—এ দেশ যে কাদের, এ প্রসঙ্গে একটা নাম অবশ্য তিনি করেছেন, সেই নাম ধরেই কী তাহলে এগোতে হবে?

কোনো নবাব নন, বাদশা নন, এঁদের স্বীকারোক্তি থেকে একটি নাম পাওয়া যায়, সে নামটি হল, 'বরকুদার' এবং এঁর উপাধি হল 'মল্লিক'। 'বরকুদার' কথাটি বিদেশী উচ্চারনে বিকৃত। সম্ভবতঃ আসল নাম, 'বৃকোদর'।

কে এই বৃকোদর মল্লিক; এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো তথ্য জানা যায় না। শেঠ-বসাকরা যদি প্রাচীন কলকাতার আদি বাসিন্দা হন, তবে ইনিও নিশ্চয় ছিলেন ওদের সঙ্গে। গোত্তার নকুধরের সঙ্গে ইনিও গ্রাম সুতানুটিতে

নিশ্চয় একদা পাশাপাশি বাস করেছিলেন। পরের যুগে ঐ সব বংশ থেকেই বাবুদের আবির্ভাব। সুতরাং এ অনুমান সম্ভবতঃ অমূলক নয় যে বাবু বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ভেতর স্বয়ং বৃকোদর ছিলেন একজন।—তাই ষোলশ নব্বই খ্রীষ্টাব্দের চব্বিশে আগষ্ট, এক বৃষ্টি ঝরা দিনে, জব চার্নক যে দেশ আবিষ্কার করলেন, সে দেশ হল বাবুদের দেশ। প্রথমে এর নাম ছিল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর ইত্যাদি। কিন্তু কয়েক বছর পেরোতে না-পেরোতেই সব এলাকাটির নাম হয়ে গেল কলকাতা। আর এই কলাকাতা, এটি কোনো বাদশাহের নয়, নয় কোনো নবাবের বা রাজার, এমন কী কোনো ইংরেজেরও নয়; এই কলকাতা হল বাবুদের। তাই জব চার্নক যদি কলকাতার প্রথম সাহেব হন, বৃকোদর হলেন এখানকার প্রথম বাবু।

কলকাতার সঙ্গে 'বাবু' কথাটির যোগ যে কত নিবিড় তা পুরনো দিনের ছড়াদাররা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বার বার। এক ছড়াদার লিখেছিলেন,

'ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতির চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হল যে কাঙাল ।।
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে ।।'

'বাবুরা যে নকল প্রিয়, এই ছড়াই তার সাক্ষী। আর এই বাবু-কলকাতার বাবুরা যে সকলেই এসেছিলেন বাইরে থেকে এবং বড়ো লোক হবার জন্য, সে বিষয়েও কোনো দ্বিমত নেই।—সপ্তগ্রাম ছিল এক কালের বিখ্যাত বন্দর। বিরাট বন্দর। সেই বন্দর একদিন হারিয়ে ফেলল নাব্যতা। বড়ো বড়ো জাহাজ আর সেখানে ঢুকতে পারে না। ফলে বড়ো বড়ো ব্যবসাদাররা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কেনা-কাটা আর হয় না। কাজ-কারবার প্রায় বন্ধ। সব অচল।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন সপ্তগ্রাম থেকে শেঠবসাকরা চলে এলেন হুগলী পেরিয়ে আরো দক্ষিণে। আরো দক্ষিণে মানে সুতানুটিতে। গ্রাম সুতানুটি আকারে ছোট হলে কী হয়, দেখতে দেখতে এর হাটটি হল বিরাট।

সুতো আর কাপড় বিক্রয় হত এখানে। এই সুতোর নুট বিক্রয়ের জন্ম এর নাম হল, 'সুতানুটি।'

যাই হোক, এই গ্রাম সুতানুটির হাট থেকেই সুতো কিনতেন ইউরোপীয় বণিকেরা। 'ইণ্ডিয়ান কটন্' সেকালে খুবই নামকরা। ইউরোপের বাজারে তার চাহিদা অনেক, এই চাহিদা জোগাতে জোগাতে সুতানুটির বণিকেরা হিমসিম খাচ্ছেন। আর সত্যি কথা বলতে কী, বেশ দু পয়সা 'নাফাও' করছেন।

ইংরেজরা আসবার পর এ ব্যবসা বেড়ে গেল। আর চারদিকে টাকা পয়সা যখন উড়ছে, তখন নানান জায়গা থেকে লোকজনও আসতে আরম্ভ করল। শোভরাম বসাকের সুতোর হাট দিনে দিনে হয়ে উঠল সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। মুকুন্দরাম শেঠ এই গ্রাম গোবিন্দপুরে এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে। বংশানুক্রমে এঁদের ব্যবসা ফেঁপে উঠল। পিতা জনার্দন শেঠ এবং পুত্র বৈষ্ণবচরণ পুরণো কলকাতার দুটি বিখ্যাত নাম। অর্থ সমৃদ্ধির দিক থেকে এঁরা 'বাবু' হিসাবে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন নিশ্চয়।

কলকাতায় আসবার পর মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন চার্নক সাহেব। ষোলশ তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে এই কলকাতার মাটিতেই তিনি দেহ রাখলেন। এর নয় বছর পরের একটি বিবরণ থেকে জানা যায়, '১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ২টি রাস্তা, ৮টি গলি, ১৭টি পুষ্করিণী, আটটি পাকা ঘর ও আট হাজার মেটে ঘর ছিল। বাকি সমস্ত স্থান বাগান, বন জঙ্গল এবং আবাদি জমি ছিল।'—কেবল কলকাতা নয়, গোটা বাঙলা দেশ জুড়ে সেকালের সাধারণ লোকেরা মাটির ঘরেই থাকতেন। আট হাজার যেখানে ঘর, সেখানে অনুমান করা কঠিন নয় যে জনসংখ্যা কত! এই জনসংখ্যা যে দিনে দিনে বেড়েছে, সে সংবাদও পাওয়া যায় আরেকটি খবর থেকে। সংবাদে প্রকাশ, "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা যাহা ছিল, ১৭০৮-এ তাহা দ্বিগুণ হয়।'—অর্থাৎ পাঁচ বছরের ভেতরেই এ অবস্থা।

পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই এ শহর দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকল। বলা বাহুল্য যে সব বংশ থেকে 'বাবু-দের' উদ্ভব, সেই সব কৃতী মানুষদের কথা প্রচারিত হতে থাকল লোকের মুখে মুখে,—ছড়াদাররাও

মুখে মুখে তৈরী করেছিলেন ছড়া। সেকালের একটি ছড়া এই রকম:

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি
নকুধরের কড়ি
উমি চাঁদের দাড়ি।

এ ছড়ার আবার ভিন্ন পাঠও আছে। এ পাঠে 'বনমালী সরকারের বাড়ির পরিবর্তে পাওয়া যায় 'মথুর সেনের বাড়ি'। আর ছড়ির ব্যাপারে গোবিন্দরাম মিত্রের জায়গায় পাই 'নন্দরামের নাম'—নন্দরাম ও গোবিন্দরাম দু জনেই ছিলেন ব্ল্যাক জমিদার। তবে এ পেশায় নন্দরাম প্রথম। র‍্যালফ্ শেলডনের অধীনে তিনি কোমপানীর জমিদারী দেখাশোনা করতেন। হিসাব-পত্তর রাখতেন। সমাজে ইনি বেশ প্রতাপশালী লোক ছিলেন। ছড়াদারের 'ছড়ি' ঐ প্রতাপেরই প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে বিত্তেরও ইংগিত।

গোবিন্দরাম এ ব্যাপারে আরো খ্যাতিমান। জন্মসূত্রে ইনি বড়োঘরের ছেলে। চলাফেরাও তাই। চানক গ্রাম থেকে ইনি এসেছিলেন চার্নক সাহেবের শহরে। এঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত, সাহেবরাও ভয়ে কাঁপত থরথর করে। এই শৌখীনবাবু কুমোরটুলিতে বানিয়েছিলেন নিজের অট্টালিকা। আর শখ করে তৈরী করে দিয়েছিলেন নবরত্নের মন্দির। এ মন্দির যদি আজ থাকত, তাহলে দেখা যেত যে তা ছাড়িয়ে গেছে আমাদের একালের 'শহীদ মিনার'-কে! অর্থাৎ গড়ের মাঠের মনুমেনট এর কাছে মাথা নীচু করেই থাকত! সুতরাং এই বাবুর ছড়ির প্রতাপ হবে না ত, কার হবে?

বনমালী সরকার, মথুরা সেন ও নকুধরবাবু এঁরা সকলেই এক একজন ধনকুবের। অঢেল এঁদের খ্যাতি। অঢেল বিত্ত। আর শৌখীনতাও তেমনি।

বাবু কলতারার সোনালি সকাল এঁদের আলোতেই প্রথম ঝলমল করে উঠল। কুমোরটুলীতে বনমালী সরকার যে বাড়ি বানিয়েছিলেন, তা দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে আসত নানান লোক। আর ধনকুবের লক্ষীকান্ত ধর ওরফে নকুধরের নাম জানত না, এমন লোক সেকালের কলকাতায় কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। জন কোমপানি এর কাছে আসত টাকা ধার করতে। একবার কোমপানিকে নয় লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর

কোমপানিও এঁর কাছে ছিল ভীষণ কৃতজ্ঞ। নকুধরের দৌহিত্রকে এঁরা এনে দিয়েছিলেন 'রাজা' উপাধি। তাই সুখময় হয়েছিলেন, 'রাজা সুখময় রায়'।

তা রাজা হলেও 'বাবু আনি'-তে এরা কিন্তু হুবো বাবু।

আর 'বাবুআনি'র অর্থ হল সৌখীনতা। যার বিত্ত আছে, অথচ শৌখীনতা নেই। তিনি আর যাই হোন না কেন, অন্ততঃ বাবু নন।

সুপ্রচুর অবকাশ, সুবিহল সৌখীনতা এবং অঢেল বিত্ত নিয়ে দেখা দিলেন পরের যুগের বাবুরা। অর্থাৎ এদের বংশধররা। এই বাবুদের অভ্যাগমে কলকাতা হয়ে উঠল গরবিনী। এদের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখকের কলম হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত, স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন: 'বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গণা দিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের ও ঘোষ পাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গণা দিগকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।'

ঘুড়ি ওড়ানো যে রীতিমত শৌখীন ব্যাপার, তা এঁদের না দেখলে বোঝাই যেত না। গড়ের মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে ওঁরা ঘুড়ি ওড়াতেন। সে সব ঘুড়ির আবার কত নাম! কোনোটি চাউস ঘুড়ি, কোনোটি ফানুষ ঘুড়ি এবং আরো কত নামেরই ঘুড়ি!—আর বুলবুলির লড়াই? সে আরেক মজার ব্যাপার।

যাইহোক, এইসব বাবুআনির ব্যাপার যিনি যতই অভ্যাস করুন না কেন, খ্যাতি হয়েছিল কিন্তু মোট আটজনের। এই আটজন, সেকালের কলকাতায়, আটবাবু নামে পরিচিত। এই আটজনের কথা নানা প্রসঙ্গে আমাদের বিবৃত করতেই হবে।

এই আটজনের শিরমণি হলেন 'তনুবাবু'। পুরো নাম রামতনু দত্ত। হাট খোলার দত্ত বাড়ির ছেলে। বাবার নাম মদনমোহন। এই তনুবাবু ছাড়া রয়েছেন—নীলমনি হালদার, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা নবকৃষ্ণের ছেলে রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতুসিংহ, ঠাকুর পরিবারের উর্ধতন পুরুষ দর্পনারায়ণ, নকুধরের দৌহিত্র রাজা সুখময়, আর রয়েছেন চোর

বাগানের মিত্তির বাড়ির ছেলে।

অপরিমিত অপব্যয় এবং রুচির সূক্ষ্ম বিচারে এঁরা যে 'বাবু'র গৌরব পেয়েছিলেন তা রীতিমত ঈর্ষাযোগ্য। এবং এ বিষয়ে নানান গল্প ছড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গান্তরে সে সব গল্পে আসা যাবে। তবে একথা ঠিক পুরনো যুগের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেল নতুন যুগের। আর রুচির তো বটেই। হুতোমের ভাষা দিয়ে এই পরিবর্তনকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায়, 'পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশ-লোচন জন্মাতে লাগলো।'

হুতোমের লেখায় আধুনিকদের ওপর সামান্য একটু কটাক্ষ থাকলেও একথা মেনে নিতেই হবে যে বাবুআনির সৌখীনতায় কলকাতায় রীতিমত প্লাবন এসে গেল। নানান দিক থেকে দেখা গেল তার প্রকাশ। ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে আসা যাক। সেকালে টাকার কী রকম ছড়াছড়ি ছিল, তা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দেখলেই বোঝা যাবে। বাবুর পায়ের আঙুলে দু একটি কড়া পড়েছে। বড়ো কষ্ট। বেচারি যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে দিয়ে বসলেন বিজ্ঞাপন, 'আমার পায়ে কতকগুলি কড়া হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। যে লোক এই কড়া আরাম করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার সিক্কা টাকা পারিতোষিক দিব। ৮২নং জিগজ্যাগ লেনে সংবাদ লউন।'

এই বিজ্ঞাপনের তারিখ সতেরোশ তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দ।

তবে বাবুদের মূল যন্ত্রণাটি দেহের নয়, হৃদয়ের। মদন-আগুনে বেচারিরা একেবারে ধরাশায়ী। রীতিমত দগ্ধ। এই প্রসঙ্গে একটি গানের কথা মনে আসে, এ গানটি পরের যুগে ধ্রুবপদের মতন বাবু কাহিনীতে যুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং তা' উদ্ধার করা যেতে পারে, বাবুদের এই মদন-আগুনের জ্বালা বড়োই পীড়া দায়ক—

> মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, কি গুণ কল্লে ঐ বিদেশী
> ইচ্ছা করে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী।
> দারুণ কটাক্ষ-বানে, অস্থির করেছে প্রাণে,
> মনে না ধৈরজ মানে, মন হয়েছে তাই উদাসী॥

এখানে ব্যবহৃত 'উদাসী' শব্দটি কিন্তু 'উদাসীনের সমার্থক নয়। এই উদাসী-মনে বিরহ যন্ত্রণাই প্রবল। সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর। নারীর

প্রতি আসঙ্গলিপ্সা দুর্ধার। এর ফলে দেখা দিয়েছে গনিকা চর্চা, বাঈজীদের প্রতি আসক্তি। এর জন্য যদি অপরিমিত অর্থ ব্যয় হয়, তা হোক না কেন বাবুতে বাবুতে এই নিয়ে লেগে গেল প্রতিযোগিতা। বাঈজী ও গনিকাদের আদর বেড়ে গেল হু হু করে। —চারিদিক থেকে বহু কটাক্ষ বর্ষিত হল, বর্ষিত হল বহু ব্যঙ্গোক্তি। —তবু এঁরা অটল, লক্ষ্যে স্থির। কেননা, গণিকা চর্চা বাবুকালচারেরই অঙ্গ।

এই ভাবেই দেখতে দেখতে বাবুরা খেয়াল-খুশির খেলায় মেতে উঠলেন। বুলবুলির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো, ইত্যাদির সঙ্গে মদ্যপানও এসে জুটে গেল। গাঁজা খেয়ে কেউ কেউ পাখির দলে ঢুকে গেলেন। এদিকে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই, এই পার্বণ গুলিকে এরা কিছুতেই গতানুগতিক ভাবে ছেড়ে দিতে চান না। সেখানেও এই বাবুরা নিজেদের একটি নিজস্ব ভূমিকা রাখতে চান। কালীপূজো—দুর্গাপূজো—এসবও আছেই। এর সঙ্গে রথ-দোল-চড়ক বাদ যায় কেন?

সুতরাং কিছুই বাদ গেল না।

এদিকে দেখতে দেখতে বাবুদের ভেতর গড়ে উঠল দুটি শ্রেণী। একদল পেলেন পশ্চিমের শিক্ষা। পশ্চিমের ভাবধারা। এঁদের পালে লাগল নতুন যুগের হাওয়া। এঁদের ভেতর অনেকেই নেমে পড়লেন সমাজসংস্কারে, অনেকে ধর্মসংস্কারে। শিক্ষা সংস্কার থেকে আকাশে বেলুন চড়ে ঘুরে বেড়ান সবেতেই এঁদের অপরিসীম উৎসাহ। নানা রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও এঁরা সুনিপুণ। পান থেকে চুন খসলে এঁরা হৈ চৈ বাধিয়ে দেন। যে সাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের অভ্যুদয়, সেই সাহেবকুলেরও এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে এঁরা সহজে ছেড়ে দেন না। এঁরা দল বেঁধে পত্রিকা বের করেন, এবং সেই পত্রিকায়, দরকার হলে, এই বাবুরা বিরোধীদের এক হাত নিয়ে নেন। রামমোহন-রামগোপাল-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই রয়েছেন এই দলে। এই দলের ভেতর 'ইয়ং বেঙ্গলও' রয়েছেন। এঁরা সকলেই কেমন যেন এক সুরে সাধা। গোবিন্দরাম মিত্রের 'ছড়ি' যদি ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়, তা হলে বিদ্যাসাগরের 'চটি' এবং বঙ্কিমের 'কলম' ও তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি।—রামমোহন অনুরূপ ভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করেছিলেন 'আধুনিক ভারতে'র স্বপ্ন ভাবনায়। 'ইয়ংবেঙ্গল' তাঁদের পাখা মেলে দিয়েছিলেন 'পশ্চিমা' ভাষা-সাংস্কৃতির ঝোড়ো বাতাসে।—মোটকথা,

এ সবই শৌখীনতা। সবই বাবুআনি। এর ভেতর যেটি নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি হয়েছে, তাকে আমরা বাবুআনি ছাপ দিয়ে চেনাতে পেরেছি, নতুবা বাবুগৌরবের ঢোলের আওয়াজের নীচে তারা চাপা পরে গেছে। মিন মিন কাঁসির আওয়াজ কখনো ঢোলের আওয়াজকে ছাপাতে পারে না। সুতরাং কাঁসির প্রশঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

শুধু উৎসবে-আনন্দে নয়, এমন কী খেয়াল-খুশির ফানুষ উড়িয়েও নয়, বাবুগৌরবের যথার্থ স্বরূপ যদি চিনতে হয়, তবে উপকরণের দিকেও আমাদের একটু তাকাতে হয়। আলবোলা-গড়গড়া ছাড়া কোনো বাবুর ছবি আঁকা কী সম্ভব? আর তরঙ্গায়িত বাউরি চুল ও দাঁতে মিশি যদি না থাকল, তবে আর তিনি বাবু কিসের? ফিন্ফিনে কালা পেড়ে ধুতি, মসলিন বা কেমব্রিকের বেনিয়ান্, গলায় চুনট করা পাকাশে উড়ুনী ইত্যাদি উপকরণ গুলি বাবুর জন্য ভীষণভাবে আবশ্যক। বাবু যাবেন পালকিতে বা অশ্বশকটে, সুতরাং সেই পালকি বা শকটটিও বাবুর বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট হওয়া দরকার। বাবুগৌরবের সবে যখন সোনালি সকাল, তখন কলকাতার পথ কাঁপিয়ে চলত পালকি। গোবিন্দরাম মিত্র থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অনেকেই ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন এই পালকিতে। পরে পালকিকে সরিয়ে দিল ঘোড়ার টানা গাড়ি।—তখন ঘোড়ার খুড়ে খুড়ে পথের অনেক ধূলি উড়ল। অনেক অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে মন্ত্রিত হল বাবুকলকাতার পথঘাট। সেকালের এক ইংরেজ লেখক এই ঘোড়ার গাড়ির ভিতর পেয়েছিলেন শৌখীনতার মেজাজ। উনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন, '...দেখো বাবু, যানবাহনের সংখ্যা নয়, ভ্যারাইটির দিকে অর্থাৎ বৈচিত্র্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো।'

'...Count not the number of carriages, but the number of varieties of carriages that pass—Britzkas, Barouches, Landolets, Chariots, Phaetons, Buggies, Palauquins, Palkigherries, Brown-berries, Cranchys...'

আরো অনেক। আমাদের গৌরবান্বিত বাবু এখন কোন্টায় যাবেন? —ব্রিৎস্কাস, বারুচ-ল্যাণ্ডোলেট, চ্যারিয়ট, ফীটান, বগী, প্যালানকুইন, পালকি ঘেরী, ব্রাউন বেরী, ক্রাহানচি বা কেরাঞ্চি গাড়ি কোনটিতে আমাদের বাবু যাবেন?

গৃহসজ্জায় বা শৌখীনতায় বাবুদের দৈনন্দিন জীবনে গিয়ে ঢুকলে আরো

নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। 'ফিরেঙ্গী খোঁপা' দেখতে বাবুরা ভারি ভালো বাসতেন। সুগন্ধের প্রতি এঁদের অনুরাগ ছিল প্রায় নবাব বাদশার সমতুল্য। অনেকের বাড়িই আতর দিয়ে মোছা হত। তা আতর যতই যথেচ্ছ ব্যবহৃত হোক না কেন, পরের যুগে সৌখীন বাবুদের শয়নাগারে যা পাওয়া যেত, তা হল 'ল্যাভেণ্ডারে'র শিশি। এবং বাথরুমে পাওয়া যেত 'গসনেলের সাবান।' এদিকে আয়েস করবার জন্য বাবুরা যে কোচে বসতে ভালো বাসতেন, তা হল 'ক্লিও প্যাটরা কোচ।' কাশ্মীরী গালিচার থেকেও এরা পছন্দ করতেন ফরাসী গালিচা। এদের বৈঠকখানায় শোভা পেত 'ম্যাকেবের খুখু ঘড়ি।'— রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করতে এরা চাইতেন 'অসলারে'র ঝাড় বাতি।

না, এই সব উপকরণের তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। এদের শৌখীনতা কত সূক্ষ্ম ছিল, তা এক বাবুর অপরাহ্ণিক ভ্রমণ যাত্রার সামান্য একটু বিবরণ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। এই বাবু ছয় ঋতুতে ছয় রঙের পোষাক ব্যবহার করতেন। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন এই ঠাট। বসন্তকালে ইনি অঙ্গে চাপাতেন হলুদ রঙের চাপকান, জরির টুপি দিতেন মাথায়। সাজ সজ্জাকে একবারে নিখুঁত করে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। এই বাবুর কথায় অবন ঠাকুর লিখেছেন, 'বিকেল বেলায় সেজেগুজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গিন্নিকে ডেকে বলতেন, দেখোত গিন্নি, ঠিক হয়েছে কিনা। গিন্নি এসে হয়তো টুপিটা আর একটু বেঁকিয়ে দিয়ে, গোঁফ জোড়া একটু মুচড়ে দিয়ে, ভালো করে দেখে বলতেন, হ্যাঁ এবারে হয়েছে। গিন্নি সাজ 'অ্যাপ্রুভ' করে দিলে তবে তিনি বেড়াতে বের হতেন।'

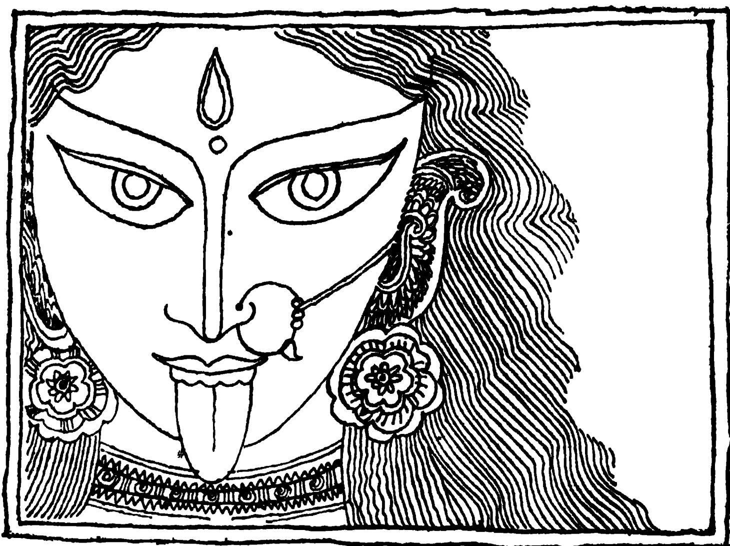
বলা বাহুল্য, এ শৌখীনতা বাবুর বৃদ্ধ বয়সের ব্যাপার। যৌবনে ইনি যখন সাজগোজ করে বাগান বাড়ি যেতেন, তখন নিশ্চয় গিন্নির 'অ্যাপ্রুভাল' লাগত না!

এহ বাহ্য, আগে কহ আর। না, আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। বাবুদের দৃষ্টান্ত একমুখে বা এক কলমে শেষ করা যায় না। এদের লীলা যে কোন অনন্ত তাই নয়, এরা রূপেও বহু বিচিত্র। যা সংক্ষেপে 'বহুরূপী'ও বলা যায়। সুতরাং—

সুতরাং উপসংহার টানাই ভালো। তবে উপসংহার টানার আগে একটি কথা বলা দরকার। এই কথাটি হল, বাবুদের ধর্মব্রত। যদিও বাবুরা ধর্মীয় উৎসবে প্রায়ই গা ঢেলে দিতেন, এবং কোনো কোনো বাবু, যথা রামমোহন

স্বায় প্রমুখ ব্যক্তিরা, নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তবু কী আশ্চর্য, মনে মনে এরা কিন্তু পুরোপুরি 'সেকুলার।' অন্যে পরে যা কথা, আমাদের রামমোহনের কাছে সূর্যনারায়ণ নামে এক অনুপ্রদেশীয় যুবক এসেছিলেন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' বিষয়ে জানতে। কিন্তু বেচারি ধর্মের ব্যাপারে রামমোহনের কাছে ভীষণভাবে হতাশ হন, এবং দেশে ফিরে গিয়ে এর সম্পর্কে লেখেন, 'হি ইজ নাইদার এ ক্রিশ্চিয়ান্, এ মেহামেডান, অর এ হিন্দু, বাট এ ফ্রী থিংকিং ম্যান, অ্যাবানডান্ড বাই অন রিলিজিয়ন্স।'—অর্থাৎ ইনি খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু—কোনটাই নন, উনি একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ, সব ধর্মের দ্বারাই উনি পরিত্যক্ত।

মোটকথা এই হল বাবু। এরা ধর্মের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা ধর্ম নিরপেক্ষ। মোহের মধ্যে থেকেও নির্মোহ। এদের আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, পোষাক-আশাক সবই অনন্য। এরা মদ খেয়ে মদকেই বেশি করে গালাগালি দেন। নিজেদের নিয়ে যে আত্মসমালোচনা করেন, তা রীতিমত কঠোর। কর্ণসুবর্ণ-গৌড়-মুর্শিদাবাদ-নবদ্বীপ ইত্যাদি ঐতিহাসিক রাজধানীগুলিতে অনেক সম্পদই হয়ত ছিল, কিন্তু বাবু গৌরবের সম্পদে শহর কলকাতা সকলকে দিয়েছে হারিয়ে। তাই বাবুহীন কলকাতার কথা ভাবাই যায় না।—



কালীমাহাত্ম্য ও কলকাতা

আঠারোশ' বাইশের কথা। মাঘের শেষ। শীতও আসছে কমে। মঙ্গলবার। চতুর্দশী। পুষ্যা নক্ষত্র। উত্তর কলকাতার অভিজাত এক বাড়ি থেকে একটি পুজো চলেছে কালীঘাটের পথে। ঢাকঢোল বাজছে। বাজছে কাড়া-নাকড়া। সে এক এলাহি শোভাযাত্রা। একাল হলে ট্রাফিক জাম হয়ে যেত। সেকালে অবশ্য এ বস্তুটি ছিল না। তবে ইতিউতি লোক জমে গেল। সকলেরই চোখে একটি জিজ্ঞাসা ঝিলিক দিয়ে উঠল : 'কার পুজো? কে চলেছেন পুজো দিতে? এ আড়ম্বর কার?'

ওপক্ষ থেকেও সাড়া এলো।—এ পুজো চলেছে শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে। সঙ্গে আছেন রাজা বাহাদুর স্বয়ং। রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর। তিনি রাজা, তাই রাজকীয় আড়ম্বরেই চলেছেন পুজো নিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে তিনি সোনার অলঙ্কারে মাকে মুড়ে দিলেন। নানারকম জড়োয়া অলঙ্কার তিনি দিলেন মাকে। দিলেন সোনার চারিটি হাত। পৈঁছা আর বাউটি দিলেন চার ছড়া ও চার গাছা। বিজটা দু খানা। মন্ত্রের হাতে ঝুলিয়ে দিলেন সোনার মুণ্ডু। আর একহাতে রূপোর খাঁড়া। জড়ির কাপড়, পাটের কাপড় আর শাল দো-শালার কথা না তোলাই ভালো। অঢেল দক্ষিণা দিলেন।

বলিও পড়ল। —এ পুজো দেখবার জন্য এত ভিড় হল যে পুলিশেও ঠেকা দিতে পারে না। তবে পুলিশ এসেছিল বলেই কোন রকমে পুজোটা সাঙ্গ হতে পারল।

সেকালে এই ছিল কেতা। কলকাতা মানেই কালীঘাট। কালীর নামেই তার নাম। তার বৈভব। এ কালীকে কেউ কী এড়িয়ে যেতে পারে? তিনি যতো বড়ো সাহেব হোন, আর যত বড়োই বাবু হোন না কেন! জন কোম্পানি কেরেস্তান, কিন্তু মায়ের মাহাত্ম্যে সেও বাঁধা। তাই তার পুজো গেছে সকলের আগে ভাগে। পাঁঠা পড়েছে সকলের প্রথমে। রাজনারায়ণ বসুও সেকথা স্বীকার করে লিখেছিলেন 'কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত।'—ইংরেজ কোম্পানি যখন আবার এক একটি করে যুদ্ধ জিতত, তখন কালী আরাধনা আরো বেড়ে যেত। ঢাকঢোল বাজিয়ে শহরবাসীদের কানে তালা লাগিয়ে মায়ের থানে পুজো গিয়ে পৌঁছুতো।

সাহেবদের পিছনের থাকে ছিলেন বাবুরা। বাইরে এমনি বেওয়ারিশ জীবন যাপন করতেন বটে, কিন্তু কালীঘাটের মায়ের কাছে তাঁরা সর্বদাই মাথা নত করে থাকতেন। সাবর্ণ চৌধুরীদের ঠাকুর ছিলেন মা-কালী, সুতরাং তাঁদের পুজো যে মায়ের কাছে আসবে এতে আর আশ্চর্য কী! পাইকপাড়ার রাজবাড়ি থেকেও রোজ পুজো আসত। রোজ। মায়ের ওপর ছিল তাঁদের অগাধ ভক্তি। তাই কালীর আমিষ ভোগের নিত্যব্যয় পাইকপাড়ার ইন্দ্রসিংহ তুলে নিয়েছিলেন নিজের ঘাড়ে। তাঁর পাঠানো ছাগ সকলের আগে মায়ের কাছে বলি দেওয়া হত। মায়ের মুখে সোনার জিহ্বা তাঁরই দেওয়া। কলকাতার আরো সব সাহানশারা আসতেন। তাঁরাও অঢেল নৈবেদ্য দিয়ে তুষ্ট করতেন মাঁকে। রাজা নবকৃষ্ণ আসতেন নিয়মিত। মায়ের গলার সোনার মুণ্ডমালা তাঁরই গড়ানো।—মায়ের প্রতি এই ভক্তি কেবল বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সুদূর নেপালেও মায়ের ভক্তেরা ছিলেন। মায়ের মাথায় সোনার ছাতা গড়িয়ে দিয়েছিলেন নেপালের প্রধান সেনাপতি স্বয়ং।

পুরনো কলকাতার ইতিহাসে অনেক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কালীর মত মাহাত্ম্য আর কোন হিন্দু ঠাকুরের ছিল না। মজুমদার.দের ক্ষাবরায়, কিংবা সুতানুটির হাটের কাছে একটি চালা ঘরে স্থাপিত মজরেশ্বর শিবকে হাটুরেরা পুজো দিত বটে, কিন্তু পুরনো দিনের কালী মাহাত্ম্যের

কাছে এ সব ব্যাপারগুলি ছিল খুবই তুচ্ছ। আর বাগবাজারের মদনমোহন তো সেদিনের। সুতরাং তার প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

তবে একটি জিজ্ঞাসা আমাদের সকলের মনেই দেখা দিতে পারে। কালী-ঘাটের কালী ছাড়া আর যে সব কালী রয়েছেন তাঁরা কতদিনের? চিত্রেশ্বরী কালী, ঠনঠনের কালী, সিদ্ধেশ্বরী, ফিরিঙ্গী-কালী বা আনন্দময়ী—এঁরাও কী পুরনো কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন? সুতানুটি-গোবিন্দ-পুর-কলকাতার পুরনো দিনের রোজনামচার সঙ্গে এঁরাও কী অচ্ছেদ্য!

না, এদের প্রাচীনতা সমান নয়। কালীঘাটের কালী এবং চিত্রেশ্বরীই সব থেকে প্রাচীন। এবং ঐ প্রাচীনতা যে কতদিনের তা সুনিশ্চয় করে বলা যায় না। এদের সম্পর্কে নানারকম কিংবদন্তী। নানান অলৌকিক গল্প আছে ছড়িয়ে।

ঐ চিত্রেশ্বরী কালীর নাম থেকেই আজকের 'চিৎপুর' নাম। পুরনো কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে এ চিত্রেশ্বরীর মন্দির। বাগবাজারের গঙ্গার ধারে। ইতিহাসের কোন্ লগ্নে কে বা কারা ঐ মন্দির তৈরী করেছিলেন, তার হদিশ পাওয়া যায় না। শোনা যায়, চিতে ডাকাতের দল সাড়ম্বরে মায়ের পুজো করত। চারদিক ছিল গভীর জঙ্গল। খাল-খোঁদলে ভরা। নদীতে ছলকে উঠত জোয়ার। এক প্রহর বেলা থাকতে অন্ধকারের ছায়া নামত মায়ের মন্দির ঘিরে। চিতে ডাকাতের দল মশাল জ্বালিয়ে মায়ের সামনে নরবলি দিত। তারপর নররক্তে কপাল রঞ্জিত করে তারা বেরোত ডাকাতি করতে। নিষুতি রাত মায়ের ভক্তদের উল্লাসে উঠত কেঁপে কেঁপে।

কালীঘাটের কালী সম্পর্কে অবশ্য এ জাতীয় রোমহর্ষক খবর পাওয়া যায় না। তবে এখানেও মায়ের আবির্ভাব বিষয়ে নানান রকম লোকশ্রুতি।

সেকালে লালদীঘির দক্ষিণে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। কেন না, ওর পরেই ছিল গভীর জঙ্গল। সে জঙ্গলে বড়ো বড়ো বাঘ ছিল। আর ছিল ডাকাতের ভয়। তবে একটি সংকীর্ণ পায়ে হাঁটার পথ ছিল। চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের কাছ থেকে পথটি ডিহি-কলকাতা হয়ে বরাবর চলে গিয়েছিল দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত। হলওয়েল সাহেব পর্যন্ত এ পথ দেখেছিলেন। তিনি এর বর্ণনায় বলেছেন—'দি রোড লিডিং টু কোলীগট অ্যাণ্ড ডিহি ক্যালকাটা।'

সংকীর্ণ রাস্তা। একে দুর্গম, তাতে ভয়ঙ্কর। একটু সন্ধ্যা হলে পালকি বেহারারা পর্যন্ত সওয়ার নিতে ভয় পেত। বদিবা কেউ নিত, তাকে ভবল-

তিন-ডবল ভাড়া হাঁকতে হত। জোগাড় করতে হত লোক-লস্কর। তারপর আগে আগে মশাল চলত। চলত পালকি। আর আগে পিছে লোক-লস্কর।

হলওয়েলের সময় ছিল এরকম অবস্থা। সুতরাং তারো আগে কী ছিল, তা কল্পনার বাইরে। শোনা যায়, ঐ গভীর অরণ্যের ভেতর এক সময় এক ব্রহ্মচারী তপস্যা করছিলেন। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ অদূরে একটি তীব্র আলোক ছটা দেখে ব্রহ্মচারী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ওরকম তীব্র আলোকরশ্মি জীবনে তিনি দেখেন নি। সুতরাং তাঁর কৌতূহল তীব্র হল। এগিয়ে গেলেন আলোকের উৎস সন্ধানে। গিয়ে দেখেন অদূরে এক দহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তীব্র জ্যোতি। —সে রাতে দহে আর নামলেন না।

পরের দিন দহের ধারে একটি প্রস্তর-খোদিত মূর্তি আবিষ্কার করলেন ব্রহ্মচারী। আর পেলেন একটি জ্যোতির্ময় অঙ্গুলী। —পায়ের অঙ্গুলি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী প্রত্যাদেশ পেলেন। ওটা যে সতীদেহের অঙ্গ তখন তা জানতে পারলেন। নকুলেশ্বর-ভৈরবকেও পেলেন ব্রহ্মচারী। এবং সেই থেকে না কী কালীঘাটের উৎপত্তি। আর ঐ আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী না কী তপস্যার দ্বারা এই অসাধ্য সাধন করেন।

আরেকটি কাহিনীতে আছে সেই শাঁখা বিক্রয়ের গল্প। ভবানী নামে এক ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রি করে খেত। এক সধবা ব্রাহ্মণীর বেশে ওর কাছে কালিকা স্বয়ং শাঁখা পরলেন; পরে দেবী নদীতে নামলেন স্নান করতে। তারপর যা হয়, নদী থেকে আর উঠলেন না। কেবল জানিয়ে গেলেন,—'তোমার ঘরের অমুক জায়গায় দেখো একটি কৌটা আছে।'—ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরল। খুলল কৌটো। কৌটোর ভেতর পাওয়া গেল পাষাণময় আঙুল। পরে ব্রাহ্মণ কালীকুণ্ডে এসে পাথরের মুখাবয়ব পেল। আর সেই থেকে কালীঘাটে দেবীর প্রতিষ্ঠা।

এ ছাড়া আরো কিংবদন্তী আছে। আরো। সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে কয়েকটি কাহিনী। শোনা যায়, চৌধুরী পরিবারের কেশব ঘোর শাক্ত ছিলেন। তাঁর সাধনার সময় তিনি প্রত্যাদেশ পান। সেই দৈববাণীর কল্যাণে তিনি কালীকুণ্ড থেকে মায়ের প্রস্তরময় মুখমণ্ডল উদ্ধার করেন। সন্তোষ রায় সম্পর্কেও গল্প আছে। গভীর জঙ্গলের ভেতর তিনি না কী ব্রহ্মচারীকে মায়ের পুজো করতে দেখেন। পরে জনসমাজে ঐ কালীমূর্তির কথা তিনিই প্রচার করেন।

তবে এ সব লোকশ্রুতির ভেতর সব থেকে যেটি যুক্তি গ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য,

তার কাহিনী অন্যরকম। কলকাতা নামকরণের পিছনেও যে এই কালিকা আছেন, এ কিংবদন্তীটি তার সহায়ক।

সে কাহিনী এ রকম।—আজ যেখানে পান-পোস্তা সেখানেই ছিল না কী দেবীর আদি বাসস্থান। দেবী চিত্রেশ্বরীর কাছাকাছি। ডিহি-কলকাতার গঙ্গার ঠিক ওপরেই ছিল তাঁর মন্দির। চারদিকে জঙ্গল। নীচে গভীর গঙ্গা। মন্দিরের কোলটি মজবুত করে পোস্তা বাঁধান। ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল মাঝে মাঝে আসত। বসত মায়ের মন্দিরের কোলে। বাঁধান পোস্তার ওপর। পরে এখানে একটু একটু করে কেনা-বেচা আরম্ভ হল। মায়ের মন্দির এরপর পর্যবসিত হল হাটতলায়। শেষের দিকে হাটটাই হল মুখ্য। দেবী মাহাত্ম্য একেবারে ডুবে গেল। লোকে ভুলেই গেল যে এখানে একজন জাগ্রত দেবী ছিলেন। এদিকে ধীরে ধীরে মন্দির ভেঙ্গে পড়ল। দেবী এক দিন ভাঙা মন্দিরের তলায় গেলেন হারিয়ে।

কয়েক বছর পরে একদল কাপালিক হঠাৎ সেখানে এলেন। তাঁরা মন্দিরের ভেতর থেকে কেবল মায়ের মুখ-প্রস্তরটুকু খুঁজে পেলেন। সেটুকু নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন ভবানীপুরের দিকে। গভীর জঙ্গলের ভেতর। সেখানে গিয়ে নরবলি দিয়ে মাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরবলি জুটল না বলে মাকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। জঙ্গলের ভেতর মাটির তলায় ঐ পাথরটুকু পুঁতে রেখে তাঁরা কোথায় যেন চলে গেলেন।

এদিকে জঙ্গলের ভেতর থাকতেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল, চৌরঙ্গী। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী। কেউ বলেন, তিনি শৈব। কেউ বলেন,—তান্ত্রিক। হঠাৎ একদিন তিনি অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন জঙ্গলের ভেতর একটি গোরু দাঁড়িয়ে। সেই দুগ্ধবতী গোরু অজস্রধারায় একটি জায়গায় দুধ দিচ্ছে। এই অভাবিত দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসীর বড়ো কৌতূহল হল। দুধসিক্ত সেই জায়গাটি খুঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করলেন কাপালিকদের লুকিয়ে রাখা সেই মুখশ্রী। মাকে পেয়ে মহর্ষি চৌরঙ্গী নতুন করে পুজো আরম্ভ করে দিলেন। পরে উনি যখন গঙ্গাসাগরে চলে যান, তাঁর এক শিষ্যের ওপর এই পুজোর ভার দিয়ে যান। —আর ঐ শিষ্যের কাছ থেকেই কেশব রায়চৌধুরী বা সন্তোষ রায় মাকে জনসমাজে নিয়ে এসে পরিচিত করে দেন।—এককালে জমিদারের পুজো

যেমন জাক করে তাঁরা সম্পন্ন করতেন, একালেও সেই রকম জাঁকজমকেই মায়ের আরাধনা শুরু করলেন। শ্যামরায়ের দোল-উৎসবে দীঘির জল লাল হয়ে উঠত বলে, তার নাম হয়েছিল 'লালদীঘি'। একালেও কালীঘাট পশুর রক্তে কেবল রক্তিমই হল না, উঠল পিচ্ছিল হয়ে। শ্যামের বদলে এলেন শ্যামা। এই ভাবেই দিন বদলের সঙ্গে হল পুজো বদল।

সাবর্ণ চৌধুরীরা মায়ের পুজোর জন্য রাখলেন পূজারী। নিয়মিত পূজারী। হালদার পরিবারের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। সেই সেকাল থেকে আজও তাঁরা পূজো করে আসছেন। মায়ের অঢেল প্রসাদ এঁরা পেয়েছেন। অঢেল। অনেক পাঁঠা পড়েছে কালীঘাটে। সে সব মাংসও পেয়েছেন এঁরা। পাঁঠার মাংসলোভী কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ নিয়ে রঙ্গ রসিকতাও করছেন। পাঁঠার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল হালদারদের কথা। তাই 'কলির দেবল' বলে চিহ্নিত করে কবি সকৌতুকে লিখেছেন,—

প্রতি কোপে যত পাঁঠা বলিদান করে।
দেবী বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে।।
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গা'য়।।

এই বাহু। কালীঘাটের কালী কেবল দেবী নন, তিনি কালের বিচিত্র সাক্ষী। কয়েকশ' বছর ধরে অনেক অভাবিত ঘটনা তিনি দেখেছেন। শেঠ বসাকদের কাল থেকে একালের প্রতিটি ঘটনার ভিতর দিয়ে তিনি দেখছেন কলকাতাকে। কেউ রাজ্য জয় করে তাঁর কাছে পুজো দিতে এসেছে, কেউবা এসেছেন রাজ্যের মুক্তিতে। জব চার্নক-লর্ড ক্লাইব-ওয়ারেণহেস্টিংস থেকে ইয়ং বেঙ্গল—আধুনিক বাঙালার সকলকেই তিনি একটু একটু করে দেখলেন। এসব নিয়ে কিছু কিছু মজাদার ঘটনাও তাঁর সামনে ঘটল। কিছু কিছু প্রহসন।

সেবার আঠারোশ একত্রিশ। গরম কাল। কলকাতার এক গৃহকর্তা এলেন মায়ের কাছে। সঙ্গে একটি কিশোর ছেলে। জগদম্বাকে তিনি প্রণাম জানাবেন। গঙ্গায় চান করে এলেন এই বয়স্ক মানুষটি। তারপর মন্দিরে এসে শুয়ে পড়লেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন মাকে। ছেলেকে হাঁক দিলেন,

'প্রণাম কর বাবা।' ছেলেটি হঠাৎ একটি কাণ্ড করে বসল। যিনি ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা, তাঁর কাছে ছেলেটি বেল্লিকের মত আচরণ করে ফেলল। পা দুটি জোড় করে সোজা দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে হঠাৎ সে মা কালীর দিকে তাকিয়ে বলল : 'গুড মর্নিং ম্যাডাম!'—এ দৃশ্য দেখে ছেলের বাবা 'হায় হায়' করে উঠলেন। তেড়ে মারতে গেলেন ছেলেটিকে। অবশ্য আশেপাশের লোকেরা এসে আটকে দিল। তখন নিরুপায় হয়ে ছেলের বাবা খেদোক্তি করতে থাকলেন—'আমি কী ঝকমারি করে তোকে 'হিন্দু কালেজে' দিয়েছিলাম রে!'—বলা বাহুল্য, ছেলেটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল। হিন্দু কলেজের ছাত্র।

কেবল হিন্দু কলেজের ছাত্র নয়, কয়েকটি কালী ঠাকুরকেও তিনি এই কলকাতার বুকে গজিয়ে উঠতে দেখেছেন। দেখেছেন তিনি সিদ্ধেশ্বরীকে—ঠনঠনেকে। আর 'ফিরিঙ্গী—কালীকে'ও সেদিন হতে দেখলেন, তাই তার কথা না তোলাই ভালো!

হলওয়েল সাহেবের 'ব্ল্যাক জমিদার' ছিলেন গোবিন্দ মিত্তির। বড়োই প্রতাপশালী ব্যক্তি। তাঁর 'ছড়ি' বাংলা প্রবাদ হয়ে আজো বেঁচে আছে। শোনা যায়, তিনিই হলেন সিদ্ধেশ্বরী মায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কেউ বলেন নব রত্নের মন্দির, আবার কেউ বলেন ঐ মায়ের মন্দির—যে কোন একটিকে তিনি খুব উঁচু করে নির্মাণ করেছিলেন। মোটামুটি সতেরোশ' তিরিশের ঘটনা এটি। এটি এত উঁচু ছিল যে একালের গড়ের মাঠের মিনার তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সতেরোশ' সাঁইত্রিশের ঝড়ে এর মাথাটি ভেঙে পড়ে। পরে আঠারোশ' কুড়ির ভূমিকম্প একে একেবারে খর্ব করে দেয়। সাহেব মহলেও এ মন্দিরটির খ্যাতি ছিল। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন—'ব্ল্যাক প্যাগোডা।' —শোনা যায়, এক সন্ন্যাসী এখানকার কালীর প্রতিষ্ঠাতা। আগে যথানিয়মে নরবলি হত। নররক্ত না হলে কী মা তৃপ্ত হতে পারেন? সুতরাং—

আনন্দময়ীর মন্দির অবশ্য বেশি দিনের নয়। বড়োজোর দেড়শ বছর আগেকার প্রাচীন দেবী ইনি। এক মোহন্ত গঙ্গাতীরে এই কালীটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার গঙ্গা এই মন্দিরের কোল দিয়ে বয়ে যেত। মায়ের মাথায় ছিল পর্ণ-কুটীর। পরে ভক্তের কল্যাণে মায়ের মন্দির পাকা হয়। ঠনঠনিয়ার ইতিহাসও অনুরূপ। এক শাক্ত ব্রহ্মচারী এই কালীর প্রতিষ্ঠাতা। ঐ ব্রহ্মচারীর নাম ছিল, উদয় নারায়ণ। যখন মা প্রতিষ্ঠিত হন, তখন এর চারদিকে গভীর জঙ্গল। খাল-খন্দে ভরা। দিনের বেলাতেও শিয়াল ডাকত।

হালদার বংশের এক পুরোহিত ঐ ব্রহ্মচারীর দেহান্তরের পর মায়ের পুজার দায়িত্ব নেন। পূর্বে মায়ের মুর্তি ছিল মাটির। মাত্র কয়েক দশক আগে মন্দির ও মা বর্তমান অবয়ব পান। ঠনঠনের প্রসিদ্ধ ধনী শংকর ঘোষ মায়ের প্রতি ভক্তিতে এ খরচ বহন করেন।

বৌবাজারের 'ফিরিঙ্গীকালী' গত শতকের প্রথম কয়েক দশকের ভেতর নির্মিত হন। শোনা যায়, এঁর কাছেই ছিলেন মা শীতলা। তিনি ছিলেন ডোমেদের ঠাকুর। দেশি খ্রীষ্টানরা খুব ভক্তি করত শীতলাকে। পরে তাঁদের ভক্তিতে ও আতিশয্যে 'ফিরিঙ্গী-কালী'র আবির্ভাব। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মা ফিরিঙ্গী মহলে অর্জন করেন অশেষ প্রতিপত্তি। এবং একটি কিংবদন্তীও ওঠে গজিয়ে। সে কিংবদন্তীর নায়ক হলেন অবশ্য আন্টুনি ফিরিঙ্গী। সেই বিখ্যাত কবিয়াল। শক্তি দেবীর উদ্দেশ্যে একদা তিনি নিবেদন করেছিলেন, —'ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী!' সুতরাং এহেন ভক্তের সাধিকা হিসাবে এক ব্রাহ্মণীকে দেওয়া হয়েছিল যোগ করে। আর শোনা যায়, সেই ব্রাহ্মনী বধুই নাকি ঐ মন্দির ও দেবীর প্রতিষ্ঠাতা।

যাই হোক, প্রতিষ্ঠাতা যেই হোন না কেন, এঁর মহিমা সেকালে সকলেই বিশ্বাস করতেন। ফিরিঙ্গীরা পুজো দিতে আসত দলে দলে। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ কেনারাম ডেপুটির ভণ্ড ব্রাহ্মত্বকে ঘোচাবার জন্ম এই কালীরই ভয় দেখিয়ে ছিলেন। হাত উঁচু করে জিভ বার করে তিনি বলেছিলেন, 'বউবাজারের কালী জিব মেলিয়ে আছেন, ফিরিঙ্গীরা ক্রিশ্চান, তবু তারা কালীকে ভয় করে, তাতে তাঁর নাম 'ফিরিঙ্গী কালী—।'

হ্যাঁ ব্যাপারটা ভয়েরই বটে। কেনারামও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

তবে দোষ কেবল কেনারামকেই দেওয়া যায় না এ দোষে আমরা সকলেই দোষী। এখানে আমরা মানে, আমরা বাঙালীরা। বাঙালীরা যতই খ্রীষ্টান আর ব্রাহ্ম হোন না কেন, কালীর কাছে সকলেই কাৎ। যেখানে বাঙালী, সেখানে কালী। কলকাতায় যা কালীঘাট, দিল্লী সিমলায় সেটা কালীবাড়ি।

আর কালীপুজোর রাত! অমাবস্যার অন্ধকার!—বাঙালীদের এ রাতটি অনেককালের প্রিয় রাত! এক কালে রাঢ়ের তান্ত্রিকেরা নিষুতি নিশীথ-রাতে মায়ের কাছে দিতেন নরবলি। মায়ের হাতের শাণিত খড়্গ সে রক্তে লাল হয়ে উঠত। নর করোটিতে তান্ত্রিকেরা পান করতেন কারণ।—পরে এ রাত

ঝলসে উঠত আতস বাজীতে। আলোর মালা পরত কলকাতা। —সে রাত দীপাবলির রাত।

সে রাতে শ্মশান থেকে যেন ছাড়া পেত দৈত্যদানো। মুসলমান-ফিরিঙ্গী-কাফ্রি-খালাসী সকলে উঠত মেতে। গোছা গোছা পাটকাঠি নিয়ে তাতে আলো জ্বালিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত ঐ ভূত-প্রেতের দল। লোক দেখলেই এই ভূতেরা তাড়া করত। আগুন ধরিয়ে দিত কাপড়ে। একে অমাবস্যা, তাতে এহেন উৎপাত! —পুরনো কলকাতার সাধারণ মানুষেরা বড়োই শঙ্কায় সময় কাটাত।

তবে শ্যামাপূজায় সাধারণ মানুষদের কী কোনো অংশই ছিল না? ছিল। কেন না, তাঁরাই তো যথার্থ ভক্তিমান। তাঁরা মায়ের কাছে পূজো দিতে যেতেন। পূজো দিতেন যাঁর যেমন সাধ্য। আর পাঁঠা ছাড়া মাকে যখন তুষ্ট করা যায় না, তখন অসংখ্য পাঁঠা মায়ের কাছে হত উৎসর্গীকৃত। তাতে আমাদের মত পেটুক মানুষদের বড়োই লাভ হত। রসনা তুষ্ট করার এমন অবারিত সুযোগ আর কোথায়? যাঁরা নাস্তিক, এই আকর্ষণে তাঁদেরও কালী ভক্তি উঠত উথলে। যে কর্মকার এমন কাজটি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করতেন, তাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হত। স্বয়ং গুপ্তকবি এই কারণেই বোধহয় দেবীর অনুগত হয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে সেদিন আমাদের মত সাধারণ মানুষের কথাও নিবেদন করেছিলেন,—

প্রণামামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥

গুপ্তকবির সঙ্গে সবাই একমত হবেন কী না জানি না, তবে কলকাতার কালী মহিমা সম্পর্কে তিনি যে আর সব বাবুদের মত সদা সচেতন ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

বাবু গৌরবের কলকাতায় কালীর মত দেবী দুটি ছিলেন না। তাই তাঁর কথা নিবেদন করে নেওয়া হল প্রথমে। এবার বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক।



পক্ষিরাজ মানুষদের কথা

সিন্ধুবাদ বণিক অনেক আজগুবি জিনিষ দেখেছিলেন। অনেক। এক চোখো সাইক্লোপ্স অথবা রুকপাখির ঠিকানা তিনি জানতেন। তবে হলফ করে বলা যায়, তিনি পক্ষিরাজ মানুষদের খবর নিশ্চয় জানতেন না। সব মানুষই অবশ্য তরুণ-যৌবনে পাখা মেলে উড়তে চান, কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যিই কী কেউ পাখি হয়ে চায় বাসা বাঁধতে? —সিন্ধুবাদ যদি গত শতকের কলকাতায় আসতেন, তবে এ দুর্লভ অভিজ্ঞতা সহজেই তিনি যে সংগ্রহ করতে পারতেন তা প্রায়ই হলফ করেই বলা যায়। পক্ষিরাজ মানুষদের দেখে তিনি অনায়াসে চোখ সার্থক করতে পারতেন। আর যদি তিনি সেকালের অভিভাবক হয়ে জন্মাতেন, তবে ত কথাই থাকত না।

শ'দেড়েক বছর আগেকার কথা। এক অভিভাবকের কাছে খবর পৌঁছুল যে তাঁর ছেলে উড়তে চায়। হঠাৎ সে পাখি হয়েছে। বাগবাজারের আটচালায় তার বাসা। গাছগাছালিতে ঘেরা বাগিচা। তাই তার নাম

বাগবাজার। গাছে গাছে পাখি। পাখির কলস্বরে বাগিচা মুখরিত। সেখানে শোনা যাচ্ছে নতুন কাকলি। তবে ওপরে নয় নিচে। আটচালায়।

সন্তানের ভবিষ্যতে ভাবিত হয়ে অভিভাবকমশাই কোন রকমে অঙ্গে মেরজাই চাপিয়ে এবং কাঁধে চাদর ফেলে পথে বেরোলেন। পুরনো কলকাতা। ধুলোভরা রাস্তা। এপাশে ওপাশে তখনো পোড়ো জমি ও জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক আধটা ঢাউস বাড়ি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে উড়ে বেহারারদের দল। এক পাশে কয়েকটি পালকি। এদের কাছে থেকে একটি পালকি ভাড়া করে অভিভাবক-মশাই চটপট চললেন উত্তরে। সোজা বাগবাজারে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পৌছালেন গিয়ে তিনি বাগবাজারের সেই আটচালায়। তারপর যেসব দৃশ্য একে একে দেখতে থাকলেন, তা'তে তাঁর চোখ উঠল কপালে। অনেকগুলি ভদ্রসন্তান বসে আছেন ইতিউতি। তবে সকলেরই চলাফেরা পাখির ধাঁচে। বিরাট আটচালা। তাই এদের পাখা মেলার পরিসর অবাধ। পালকি থেকে নেমে অভিভাবকমশাই যেমনি চালার ভেতর ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,—'ভিবিগ, পথ কিচি কিচি, কিস কিসিন্।' আরেকটি এগিয়ে এসে ডানা ঝটপট করে দাঁড়াল আগলে,—'চুকু মুকু চুকু, চুক্ চুকুন্।' —এ সময় ঠিক কী করা উচিত, অভিভাবক মশাই তা ভেবে পেলেন না। সেকালের কলকাতায় আরো পাঁচজনেরমত এ পক্ষীদের কথা তিনি শুনেছিলেন মাত্র। তেমন করে কোনোদিন গায়ে মা'খেন নি। আজ এদের দেখলেন স্বরূপে। পাখির কোটরের দিকে সাপ এগোলে পাখিদের মহলার যেমন সাড়া পড়ে যায়, শালিকেরা ওঠে কিচ্ কিচ্ করে—এখানেও ঠিক তাই হল। অভিভাবকমশাই এক-পা এক-পা করে ভেতরে ঢোকেন, আর এদের কাকলিতে আটচালা ওঠে ভরে। একটি ডাকল: 'কিচি কিচি কিচি, কিচিন্ কিন্।' সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে সাড়া এলো,—'কুকু রামশালিকে, কুকু গঙ্গা বিসং।' এরপর যেন একটি জলাশয়ের গন্ধ পাওয়া গেল। পাওয়া গেল যেন তার ছবি। এক ঝাঁক বিলের পাখি যেন একই সঙ্গে উঠল কলরব করে। তাদের কিচির মিচির শব্দে তালা লাগল কানে,—

'ছোট বিলের পাখি মোরা,
বড় বিলের কে।
উড়তে না পেয়ে পাখি
পোষ মেনেছে॥'

বিলের পাখিদের জবাবে মুখর শালিকেরা জানাল,—'কুকু গাংশালিকে কু কু গজা বিসং।' এইভাবে আট চালার ভেতর ঘুরে ঘুরে অভিভাবকমশাই কত পাখিই না দেখলেন! উত্তেজনায় তাঁর মেরজাই গেল ভিজে। চাদরের খুঁট দিয়ে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। নানান ধরণের পাখি তাঁকে রইল ঘিরে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। কেউ করছে কলরব, কেউ বাঁধছে বাসা। যারা বাসা বাঁধছে তাদের মুখে কুটো। কোনো পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে কেউবা খাবার সংগ্রহ করছে। যাই হোক, নিজের ছেলেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন অভিভাবকমশাই। এককোণে সে ছিল বসে। বাপ তেড়ে গিয়ে তার ঘাড় চেপে ধরলেন। ছেলেটি বাপের থেকেও রেগে গিয়ে—'কড়্‌ড় ঠক্' বলে ঠোকর দিল বাপের হাতে। না, এ ঠোকর ইচ্ছাকৃত নয়। সে ছিল কাঠ-ঠোক্‌রা। অবিরাম ঠুকরে যাওয়াই তার স্বভাব। বাপ ধরেছে বলে কী সে স্বভাব বদলে ফেলবে?

অভিভাবক মশাই নিশ্চয়ই তাঁর ছেলেকে পালকির খাঁচায় ভরে ফেরৎ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ধরে রাখতে কী পেরেছিলেন?—সম্ভবত না। কেননা, এ পাখি ওড়ে। সুযোগ পেলেই যায় আটচালায়। আর সেখানে বসে কয়েক ছিলিম গাঁজা টানলেই ডানা গজায়। তখন পুরোপুরি পক্ষীর ভাব।

আটচালা বিহারী এ পাখিদের কথা শুনে অনেকের মনেই হয়ত দেখা দেবে নানারকম কৌতূহল। প্রশ্ন জাগবে,—এরা কারা? কবেই বা এদের অভ্যুদয়! আর যদি বা এলো, আটচালা শূন্য করে উড়ে গেল কেন?—এ-সব জিজ্ঞাসার জবাব পাখিরাই দিতে পারত।—এক-একদিন গোধূলির সময় হঠাৎ যেমন রাশি রাশি পতঙ্গে আকাশ ভরে যায়, সেরকম এক গোধূলিতে হঠাৎ নাকি এদের আর্বির্ভাব। মুঘল আমল ফুরিয়ে এলো—আরম্ভ হল কোম্পানির অন্ধকার রাত। সেই আলো-আঁধারিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এলো পাখি। কলকাতার গোধূলি-আকাশ এদের কলকাকলিতে উঠল মুখর হয়ে। না, এরা দিনের আলোতে ছিল না, রাতের অন্ধকারেও না। কোথা থেকে এলো এবং কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে?

তবু এদের কাহিনী বলতে গেলে রাজা নবকৃষ্ণকে দিয়েই আরম্ভ করতে হয়। নবকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও উত্থান। নবকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ মুঘলদের দপ্তরে কাজ করতেন। পলাশীর যুদ্ধের পঁচিশ বছর আগে তাঁর জন্ম।

ধনকুবের নকুধরের কাছে না কী ইনিও সামান্য কাজ নিয়েই রুজি-রোজগার আরম্ভ করেন। পরে ক্লাইব-হেষ্টিংসের সঙ্গে যোগাযোগ। আর সাহেবদের দাক্ষিণ্যেই উনি হলেন বড়লোক। পরে রাজা। আর এই রাজার আনুকূল্যে কবির বিকাশ। হুতোম সাড়ম্বরে এ তথ্য বিবৃতি করে লিখেছেন,—'রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধ ও ত্যাখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন।'[২]

এই সময়ে ঐ কবির দলের সঙ্গে বাগবাজারের পাখির ঝাঁককেও দেখা গেল। সেকালে রাজা নবকৃষ্ণের এক ইয়ার ছিলেন, তাঁর নাম—শিবচন্দ্র ঠাকুর। শোনা যায়, পক্ষীর দলের স্বষ্টিকর্তা না কী তিনি। অবশ্য এই সঙ্গে আরেকজনের নাম পাওয়া যায়,—শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাগবাজারের রিফর্মেশনে রামমোহনের তুল্য লোক ছিলেন তিনি। হুতোমের ভাষায়,—'তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।' আর এই একটি মাত্র কারণে শহর কলকাতার টেক্কা হয়েছিল বাগবাজার। পাবলিক আটচালার টান তখন থেকেই দুর্মর।

পাখিদের যেমন দুটি ডানা, এদেরও তেমনি। এক ডানায় গাঁজা, আরেক ডানায় কবিত্ব। নেশার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে—গাঁজা, গুলি, মদ ও চণ্ডুর মহিমা বিবৃতি করে—সেকালে যে-সব অঞ্চলকে ছড়ায় গাঁথা হয়েছিল, তার ভেতর বাগবাজার পেয়েছিল গাঁজার গৌরব,—

'বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা,
গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের অড্ডা
চণ্ডুর বৌবাজারে।'

পক্ষীদের ঐ গাঁজা-চর্চা অবশ্য বাগবাজারেই আবদ্ধ থাকে নি, সে বটতলা ও বৌবাজারকেও গ্রাস করে নিয়েছিল। শোভাবাজারের বটতলা সেকালের একটি নামকরা জায়গা। এক আমেরিকান কাপ্তেনের মুৎসুদ্দি হয়ে এক বাবু সেকালে খুব ধনী হয়েছিলেন। তাঁর নাম হল,—বাবু রামচন্দ্র মিত্তির। তাঁর বাড়ির উত্তর দিকে ছিল একটি আটচালা। আটচালা নয়, প্রসিদ্ধ পীঠস্থান।

টপ্পাগানের বিখ্যাত গাইয়ে নিধুবাবু প্রতিদিন সেখানে যেতেন। রাত্তিরে বসত গানের মজলিস। সেকালের আনন্দময়ী কালী মন্দির কিনে নিয়েছিলেন যিনি, সেই বাবু নারায়ণ মিশ্র এখানে পক্ষীর দল নিয়ে আটচালা বিহার করতেন। শৌখীন সুখী বাবুরা ছিলেন পাখির দলের এক একটি পাখি। নিধুবাবুকে এ পাখিরা খুবই খাতির করত। সেকালের পাড়ায় পাড়ায় কবি। এক-একজন ধনী এদের পোষকতা করতেন। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাবুরা, জোড়াসাঁকোর সিংহেরাও মেতেছিলেন এ কবির দলে। এ ছাড়া গরাণহাটার বসাকেরা, শোভাবাজারের ঘোষেদের ছেলেরা, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রমুখ ধনীরা—প্রত্যেকেই পাড়ায় পাড়ায় দল বাঁধলেন। কবির দল। সকলের সঙ্গে লড়াই হল পাখিদের। লড়াইয়ে পাখিদের দলেরই জিত। বাগবাজারের জয় জয়কার। অবশ্য এ জয়ের কারণ ছিলেন নিধুবাবু। শোভাবাজারের বটতলা ছিল বাগবাজারেদের যৌবনের উপবন। পরে অবশ্য বৌ-বাজারেরাও এ কৌলীন্য পেয়েছিল।

তবে একটি কথা জেনে রাখা ভাল, সেকালে ইচ্ছে করলেই কিন্তু সকলে পক্ষী হতে পারত না। আর কুলীন পাখি তো নয়ই। গাঁজা টানার পারদর্শিতার ওপরই নির্ভর করত পাখি হওয়ার যোগ্যতা। তদনুসারেই তারা বুলি পেত। পেত মর্যাদা। আর খগরাজ বা পক্ষিরাজ হওয়া ছিল রাজ্যজয়ের চেয়েও কঠিন।

সামান্য একটি পাখি হওয়ার জন্য এক ভদ্রসন্তান একদা আটচালায় গিয়ে উঠেছিলেন। পক্ষিরাজ এগিয়ে এলেন পরীক্ষা নিতে। যোগ্যতা নির্ধারণের পরীক্ষা। সেই ভদ্রসন্তানটি একাসনে বসে পর পর একশ ছিলিম গাঁজা টানলেন। কিন্তু একবারে শেষে সামান্য একটু ত্রুটি হয়ে গেল। নিরানব্বই ছিলিমের পর শেষ ছিলিমটি টানার সময় খুক্ খুক্ করে একটু কেশে ফেললেন। ব্যস, আর যায় কোথায়! পক্ষিরাজ গেলেন ভীষণ চটে। এ লঘু পাপের জন্য তাকে দেওয়া হল গুরুদণ্ড। তাকে বানালেন একটি বিশ্রী পাখি—'ছাতারে'। ছগড়াটে আর নিকৃষ্ট পাখি। বেচারী পরীক্ষার্থী কাতর প্রার্থনা জানাল তখন খগরাজের কাছে,—'ধর্মাবতার! এই কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কী আমাকে এত অপমান করা কর্তব্য হয়!' এইভাবে সে পক্ষিরাজের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। শেষ পর্যন্ত খগেশ্বর একটু তুষ্ট হলেন। তবে দেবতারা যা পারেন না, তিনিও কী করে তা পারেন? নতুন

:পাখিটির পিঠ চাপড়ে বললেন : 'বাবু হে, যা বলেছি তা তো আর ফেরে না! হাকিম টলে তো হুকুম টলে না। তোর স্তবে আমি সন্তুষ্ট। 'ছাতারে' নামটা একবারে রহিত করতে পারব না, তবে তারই ভেতর একটু ভালো করে দিচ্ছি—তুই হবি স্বর্ণছাতারে।'

উৎকৃষ্ট পাখি হওয়া সেকালে যে কী কঠিন ছিল, এ আখ্যানই তা প্রমাণ করবে। এ-সব ব্যাপারে পক্ষিরাজের মেজাজ-মর্জিই ছিল প্রধান। এঁদের খেয়াল-খুশিতে কেউ হত তোতা, কেউ বা কাঠঠোকরা। আর ওঁদের অসন্তোষ থেকে জন্ম নিত শালিক বা ছাতারের দল।

এইভবে শ'য়ে শ'য়ে পাখি সৃষ্টি হলেও, পক্ষিরাজ কিন্তু সৃষ্টি হত কচিৎ। পাখির রাজা হতে গেলে যে দুরূহ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হত, তা যে কোনো মানুষের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। অনেক চেষ্টা করে ক্লাইভ সাহেব পলাশীর যুদ্ধে জিতেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ চেষ্টা করেও তিনি যে পাখির রাজা হতে পারতেন না তা হলফ্ করে বলতে পারা যায়। রাজা নবকৃষ্ণের অভিষেক থেকে যদি পাখিদের সৃষ্টি ধরা যায়, তবে, এঁরা হুতোমের কাল পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর টিঁকে ছিলেন। এই পুরো যুগটা পক্ষীদের যুগ। লোকশ্রুতি আছে, এই এত বড়ো যুগটায় রাজা ছিলেন মাত্র দেড়খানা। একজন গোটা, আরেকজন গোটা হওয়ার আগেই যান খতম হয়ে। হয়ত বেচারির পক্ষে পরীক্ষার পাঠ একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল, তাই ঐ দুর্ঘটনা। যাই হোক, এ পরীক্ষার ব্যাপারটি কী রকম ছিল তা জানার জন্য এ কালের এক ঔপন্যাসিকের শরণ নেওয়া যাক। এ সম্পর্কে তিনি সেকালের যে যে কিংবদন্তী উদ্ধার করেছেন, তা এরকম—'সেকালের যে-সব মহাপুরুষ একাসনে বসে একশ' আট ছিলিম গাঁজা খেতে পারত তারা একখানা করে ইঁট পেত। এইভাবে উপার্জিত ইঁটে বাসভবন নির্মাণ করতে পারলে পক্ষী পদবী পাওয়া যেত। তখনকার কলকাতায় দেড়জন পক্ষী ছিল। পটলডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষী আর বাগবাজারে নিতাই হাফ্ পক্ষী। হাফ পক্ষীর অর্থ এই যে বাড়ির চার দেয়াল গড়বার পরে হঠাৎ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করে নিতাই। তাই লোকে হাফ্ পক্ষী বলত। বস্তুতঃ রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষী।'

এখানে পক্ষিরাজ অর্থে 'পক্ষী' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই শেষ বাক্যটি হবে,—রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষিরাজ। যে ছকড় গাড়িতে চেপে রাজাবাদশাই হাওয়া খেতে বেরোতেন তার আকৃতি ছিল খাঁচার মত। হঠাৎ দেখলে মনে

কত, এক বিরাট খাঁচায় এক ধেড়ে পাখি বসে আছে। একবারে ছবির মতন দেখাত।

তবে এ রাজা তাসের দেশ বা ছবির দেশের নয়। রাজা নবকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় দেড় যুগ পরে পাখির রাজা রূপচাঁদের জন্ম। শোনা যায়, সত্যিকারের রাজরক্ত এঁর গায়ে ছিল। দক্ষিণ দেশবাসী গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব ছিলেন এর পূর্বপুরুষ। বাবার নাম গৌরহরি দাস মহাপাত্র। ওড়িশার চিল্কা হ্রদের কাছে ছিল এঁদের বাস। বহুকালের পুরানো আস্তানা। বাপ গৌরহরি উঠে আসেন কলকাতায়। নতুন আবাস তৈরী করেন। নতুন খাঁচা। ওড়িয়া রূপচাঁদ এখানেই শিখল উড়তে। পটলডাঙা হল পীঠ-স্থান। নতুন নতুন গানে সে কলকাতার আকাশ ভরে তুলল। পাখিদের গানের ট্রাডিশন সেই শেষ পর্যন্ত বজায় রাখল।

যাই হোক, পক্ষিরাজের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আবার পাখির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বনের পাখিরা যেমন খেয়ালি এবং স্বার্থপর হয়, পুরনো কলকাতার পাখিরা ঐ ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম নয়। পিঞ্জর চাইলে তারা সোনার খাঁচাই চাইত। কৌতুক দেখানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ আদায় করত। কিন্তু আগেভাগে যদি খাবার পেত, সে খাবার খেয়ে কৌতুক দেখানোর কথা একদম যেত ভুলে। তখন নিজের নিজের খাঁচায় ঢুকে পড়ে এরা ল্যাজ ঝুলিয়ে আয়াস করত।—শোভাবাজারে রাজবাড়িতে তারা একবার এমনি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল।

তখন রাজা ছিলেন গোপীমোহন দেব। —নবকৃষ্ণ স্বর্গত। গোপীমোহন একবার শখ হল পাখির দলের কৌতুক দেখার। পাখির দলকে সে খবর জানান হল। পাখিরা প্রথমে আমল দিল না। রাজবাড়ি থেকে তখন আবার অনুরোধ গেল। গেল অনুনয়-বিনয়ও। পাখিরা ল্যাজ দুলিয়ে জানাল, 'আচ্ছা, আমরা যাবো, তবে রাজাকে খাঁচা পাঠাতে হবে।'. — রাজবাড়ি থেকে খাঁচা গেল। খাঁচা নামক পালকি। পাখিরা পালকির খাঁচায় চড়ে এলো রাজবাড়িতে। রাজবাড়িতে সেদিন রাজকীয় আয়োজন। অনেক অতিথি এসেছেন পাখিদের কৌতুক দেখবে বলে। কথা ছিল, প্রথমে পাখিরা নাচ-গান করবে, দেখাবে কৌতুক। পরে আধার নেবে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ খেতে বসবে। রাজামশাই আর অত শত জানতেন না। পাখিরা আসামাত্র তিনি তাদের আপ্যায়ন করলেন কিছু খাবার দিয়ে। কিন্তু ওটুকুই পাখির পক্ষে

যথেষ্ট তা আর কে জানে ? 'পাখির আহার' যে কাকে বলে রাজমশাই তো জানতেনই না। তাই সে আহাম্মুকির জরিমানাও দিতে হল। —যেমনি খাবার খাওয়া শেষ হল, পাখিরা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়তে আরম্ভ করল। বসল গিয়ে নিজের নিজের খাঁচায়। অর্থাৎ প্রালকিতে। রাজা বললেন, 'একি, ব্যাপার ? তোমাদের নাচ-গানের কৌতুক দেখার জন্য এত আয়োজন, সে সব ত কিছুই হল না!' পাখিরা জানল, 'আমরা আধার পেলে কী আর থাকতে পারি ? অমনি হজম করতে হবে। আগে যদি আপনি আধার না দিতেন, তবে সব রকম রঙ্গভঙ্গই দেখাতে পারতাম।'

পাখিদের এ অসভ্য আচরণ এবং এহেন জবাব শুনে রাজামশাই অবাক। হতবাক। পাখিরা ততক্ষণে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে নিজের নিজের খাচায় গিয়ে বসল এবং সে খাঁচায় চড়ে সোজা চলে গেল আটচালায়। রাজামশাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাখিরা যে নিতান্তই বুনো আর বুনো পাখির মতই তারা যে স্বার্থপর, এ ঘটনা তারা প্রমাণ করে দিল। এর সঙ্গে এ ছবিও ফুটে উঠল যে তারা বড়োই খেয়ালী। এত খেয়ালী যে স্বয়ং রাজবাহাদুর পর্যন্ত তার থৈ পান না। তবে খেয়াল বা স্বেচ্ছাচার রাজাকে তেমন বিপদে ফেলে নি। এক পাঁচালিকার কিন্তু এদের পাল্লায় পড়ে দারুণ নাস্তানাবুদ হয়েছিল। সে আরেক কাহিনী। রাজা বলে গোপীমোহনকে হয়ত তারা রেহাই দিয়েছিল।— পাচালিওয়ালাকে তারা সে ঔদার্যটুকু আর দেখায় নি। ফলে একেবারে নাকানি-চোবানি।

পাঁচালিকারের নাম হল, গঙ্গা নন্দর। কেউ বলে, পুরো নাম—'গঙ্গারাম'; কেউ,—'গঙ্গানারায়ণ'। দাশুরথিরের আগে ইনিই ছিলেন বিখ্যাত। গবেষকরা এঁর সম্পর্কে অতিশয় উদার। তাঁরা এঁকে আধুনিক পাঁচালির পথিকৃত মনে করে লিখেছেন—'ফাউণ্ডার অব দিস্ নিউ টাইপ অব পাঁচালি।' শোনা যায়, নবকৃষ্ণের বাড়িতে ইনি লড়াই করতে গিয়ে অপরাজের পাখির দলকে হারিয়ে দেন। পাখিরা উড়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু পালিয়ে এলে কী হবে, নন্দরমশাইকে ওরা ভোলে নি। ভুলতে পারে নি। এদিকে পাখিদের অদ্ভুত আচার-আচরণ দেখে নন্দর মশাইয়ের মনে এক মজার কৌতূহল দেখা দেখা দিল। ওরা আটচালার তলায় কেমন করে থাকে সেটা চাক্ষুস করবেন, এই হল তাঁর ইচ্ছা। সেকালে নিমতলায় রামনারায়ণ মিশ্র বলে এক বাবু থাকতেন। আগে যে নারায়ণ মিশ্রের কথা বলা হয়েছে ইনি তাঁর আত্মীয় হতে পারেন।

এমন কী দুজনে অভিন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়। যাই হোক, এই নিমতলার বাবু তখন পাখিদের খরচ-পত্তর বহন করতেন। গোটা আটচালাকে তিনি পুষতেন। নিধুবাবুও তখন বহাল তবিয়তে পাখিদের নিয়ে বুলি কপচাচ্ছেন। নস্কর মশাই এদের গিয়ে ধরলেন আটচালা দেখবেন বলে। এরা অনুমতি দিলেন। পাখি হয়ে-যাওয়া ছেলেটির অভিভাবক যেমন অপার বিস্ময় নিয়ে আটচালার ভেতর ঢুকতে গিয়েছিলেন, পাঁচালিওয়ালাও তেমনি দুরু দুরু বুকে পাখিদের আট-চালায় গিয়ে হাজির হলেন। তবে অভিভাবক মশায়ের মত তিনি চোঁ-চোঁ করে ঢুকে পড়তে পারলেন না। ঢোকার আগেই এগিয়ে এলো দ্বারপাল পাখি। জিজ্ঞাসা করল: 'তুমি কে? কী জন্যে এসেছ?' নস্কর মশাই গম্ভীরভাবে বললেন- 'আমার নাম, গঙ্গা নস্কর। এসেছি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

দ্বারপাল পাখি বলল: 'বেশ, তুমি এখানে বস। আমি সংবাদ দিচ্ছি। রাজার আজ্ঞা হলে যেতে পারবে।' এরপর পাখিটি ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে রাজাকে জানাল,—'মহারাজ! একজন নস্কর এসেছে।'

রাজা দানা ঠোকরাতে ঠোকরাতে বলল: 'সে কি! একজন নস্কর?' অর্থাৎ নস্কর বলতে রাজার মনে হয়ত 'লশকরের' অর্থ দেখা দিয়েছিল। আর ওর মানে—পদাতিক সৈন্যবাহিনী। কিন্তু একজনে তা কি করে সম্ভব? রাজা তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল,—'সে জন্তু না মানুষ?'

উত্তর এলো, 'মানুষ।'

রাজা প্রশ্ন করল, 'হিন্দু না মুসলমান?

উত্তর এলো, 'হিন্দু'। গলা'য় পৈতে আছে।

রাজার গলায় ততক্ষণে দানা আটকে গেছে। এহেন সমস্যায় কখনও সে পড়ে নি। রাজা তাই চিৎকার করে উঠল: 'একজন নস্কর, সে আবার হিন্দু। সূত্রধর, এ কেমন হল?' সমস্যা-জটিল প্রশ্ন শুনে রাজার কাছে দৌড়ে এলো কাকাতুয়া। আভূমি নমস্কার করে জানাল, 'দ্বিজরাজ, অক্ষরের কোটায় এর কুলজী মিলতে পারে। এক এক বর্গ ধরে নস্কর-কে মিলিয়ে দেখলেই চলবে।' এই বলে সে 'কস্কর-খস্কর নামতা পড়া আরম্ভ করে দিল। তারপর 'ঙ' বর্গে এসেই সে উঠল লাফিয়ে। বলল: মহারাজ পাওয়া গিয়েছে।"

'—তাই নাকি?'

'পাওয়া গেছে। কোথায় যাবে?—তস্করের ঘরে নস্করের বাস।'

কাকাতুয়া এ কথা যেমনি বলল সঙ্গে সঙ্গে অমনি চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। শালিক-তোতার সঙ্গে হাড়গিলে পর্যন্ত দৌড়ে এলো। শাণিত দুটি ঠোঁট নিয়ে তেড়ে এলো কাঠ-ঠোকরা। পাঁচালিকার নস্কর মশাই ভয়ে কাঠ। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় না পেয়ে, তিনি আটচালার দরজা থেকে দৌড় লাগালেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়,—'অম্বল চাকা ভোম্বলদাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে উঠে ছুটে প্রস্থান করিলেন।'—পাখির দল দেখা বেচারি গঙ্গারামের ভাগ্যে আর ঘটল না। পাখি রইল মাথায়। কোনো রকমে জীবন বাঁচান।

এ পাখিরা পুরনো কলকাতায় কতদিন রাজত্ব করেছিল তা ঠিক জানা যায় না। আটচালাগুলি কবে ভেঙে পড়ল, সে খবর কলকাতার গবেষকরাই হয়ত দিতে পারেন। শোনা যায়, ঝকমারির দলও নাকি পুরনো কলকাতায় আসর জাকিয়ে তুলেছিল। তবে এদের জীবন সংক্ষিপ্ত ও বৈচিত্র্যহীন। হুতোম এ সবের ভাঙা আসরের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—'এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আদমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙা ও টাকার থাকতিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন।' পক্ষীরাজ রূপচাঁদ কিন্তু দীর্ঘজীবী ছিলেন। যতদূর জানা যায় প্রায় শেষের দিন পর্যন্ত সক্ষমও ছিলেন। হুতোম মারা যাবার প্রায় দু' যুগ পরেও কলকাতার হুজুগে গান বেঁধেছিলেন তিনি। খাঁচার শেকল কেটে কবে ইনি মহাকাশে উড়ে যান, তার দিনক্ষণ অবশ্য গুণেগেঁথে বলা যায় না। তবে যাবার সময় ইনি যে পাখির দলের আসর গুটিয়ে নিয়ে যান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একালের কলকাতায় অনেক ঐশ্বর্য আছে। অনেক। কিন্তু পাখির ঐশ্বর্যে সে যে একবারে বঞ্চিত, একথা কে না জানে? তাই যাঁরা পাখির দলের সঙ্গপিয়াসী, পক্ষীরাজ মানুষ দেখতে চান, খাঁচায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া একালে তাঁদের আর উপায় কোথায়?



বাবুদের বিনোদনে বুলবুলি

শীত আসে। পুরনো কলকাতায় যেমন আসত আজো তেমনি আসে। তবে একটু তফাৎ। সেকালের শীত আরো পাঁচ রকম জিনিসের সঙ্গে জোব্বা ভরে নিয়ে আসত বুলবুলি। একালে এ-হেন কথায় একটু অবাক লাগবে। লাগাই স্বাভাবিক। ছাতুবাবুর সে মাঠ নেই। নেই পোস্তার রাজা নরসিংহ চন্দ্র। হরনাথ মল্লিক পাখির দল নিয়ে কোনো দিনই আর কলকাতার মাঠে দেখা দেবেন না। সুতরাং একালের কলকাতা বুলবুলিকে বুঝবে কেমন করে।

একালে ক্রিকেট আছে। আছে ঘোড়দৌড়। হাওড়ার মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ে। একজিবিশনের আড়ম্বরও লেগেই আছে। সাদা ভালুক বা রেওয়া বাঘের আবির্ভাব দেখতে সারা কলকাতা মুক্তকচ্ছ হয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু বুলবুলি পাখির লড়াই দেখার

সৌভাগ্য আর কোনোদিনই সে ফিরে পাবে না। আর সে উত্তেজনায় মেতে ওঠা?—নৈব নৈব চ।

নামে বিদেশী। আরবী বা ফারসী। বাংলাদেশের ঐ ছোট্ট পাখিটি কি করে বিলকুল বিদেশী নাম পেল কে জানে? হয়ত নামটি ধন্যাত্মক অভিব্যক্তি। পণ্ডিতেরা বিবাহ করে একে পরদেশী বানিয়েছেন। ছোট্ট পা। ঘাড়ের কাছে কয়েকটি উদ্ধত পালক। জোড়ায় জোড়ায় ঘোরাফেরা করে। কিচির-মিচির করে। আর টুলটুলে তাজাফলে ঠোঁট ফুটিয়ে উড়ে পালায়। সে মনোহারী দৃশ্য দেখে কবিরা পর্যন্ত আহা—আহা করে ওঠেন:

আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি।

এক আধটা নয়, তিন তিন জাতের বুলবুলি হামেশাই আমাদের চোখের সামনে নেচে বেড়ায়। এক জাতের বুলবুলি আছে যাদের মাথা, ঘাড়, গলা, এমন কি বুকের সমুখটাও কুচকুচে কালো। পেট আর লেজটি ঘোর লাল। এটি বাংলা দেশের একবারে নিজস্ব জিনিস। বেচারি রাজনীতিতে অ আ ক খ না জানলেও নামে বামপন্থী। লাল লাল বুলবুলি। আরেক জাতের বুলবুলি আছে বাচ্চা বেলায় তারা খয়েরী। শীতকালে হিমালয় থেকে উড়ে আসা চুটকী পাখিদের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্তু একটু বড় হতে যা দেরী। বুলবুলির স্বাতন্ত্র্য সহজেই ফুটে বেরোয়। ইনি দক্ষিণ পন্থী। সাদা। মাথায় টুপি। ঠোঁট বড়ো। পোকা খেতে ওস্তাদ। সাহান-শা। তাই এরা হল শা বুলবুলি।

তবে তৃতীয় তরফের সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। জগদানন্দ রায়ের ভাষায় এই মহা কীর্তিমানদের পরিচয় দেওয়া যাক—ইহাদের পেটের তলার রঙ সাদা। মাথায় ঝুঁটি মিশমিশে কালো। ডানার পালকের রঙ খয়েরি। তাহার পরে আবার মাথার দুই পাশের পালকের রঙ সুন্দর লাল। সিপাহীদের মাথায় যেমন লাল পাগড়ি থাকে, ইহাদের মাথায় সেই রকম লাল পালক থাকে বলিয়াই এই পাখীদের সিপাহী বুলবুল নাম দেওয়া হইয়াছে।'

ব্যাপারটি সত্যিই তাজ্জব। পাখির বংশে সেপাইদের কৌলীন্য একমাত্র

বুলবুলি ছাড়া আর কে পেয়েছে ?—তাই লড়াই করার মত হক যদি কারো থেকে থাকে, তবে তার ছাড়া আর কার আছে? ধান খাওয়ার অপরাধে ছেলে ভুলানো ছড়াতে লোক-কবি যতখুশি তাঁকে লাঞ্ছিত করুক না, কেন, যুযুধান বর্গীদের সঙ্গে তাদের নাম চিরকাল এক সঙ্গে উচ্চারিত হবে। তাই মোরগ বা বাজপাখির লড়াই নয়, পুরনো কলকাতার আসর মাত করল এই বুলবুলিরাই। বাবুদের অঢেল ঐশ্চর্য বর্ষিত হল বুলবুলিদের শৌর্য প্রতিযোগিতায়। তা দেখে কবিরা কবিতা লিখল। আর লোকেদের মুখে মুখে নতুন নতুন ছড়া ঘুরে বেড়াতে থাকল।

শহর কলকাতার বুলবুলির লড়াই কবে থেকে আরম্ভ হয় এবং কবেই বা এর সমাপ্তি ঘটে, তা সুনিশ্চয় করে বোধহয় বলা যায় না। নবাবী আমল থেকেই নাকি এ খেলার চল ছিল। পশুর লড়াই দেখতে বাদশাহেরা বড় ভাল বাসতেন। পরে হয়ত পশু ছেড়ে পাখিতে মন দেন। আর সেদিন থেকেই সম্ভবত বুলবুলিদের কপাল খোলে।

*   *   *

কলকাতা হল বাংলা দেশের শেষ এবং ষষ্ঠ রাজধানী। গৌড়-রাজমহল-নবদ্বীপ-ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের গৌরব পেরিয়ে তবেই একালের নতুন রাজধানী কলকাতায় আসা যায়। আর কলকাতায় এলে সেকালের প্রধান দ্রষ্টব্য বাবুদের দিকে একবার তাকাতেই হয়। মুঘল-পাঠান দ্বন্দ্ব হওয়ার পর বাবুদের অভ্যুদয়। নবাবী আমল অস্ত গেল। হুতোমের ভাষায় বলা যেতে পারে—বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল। সুতরাং কঞ্চিতে বংশলোচনের জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক। শীতকালের সূর্যের মত ইংরেজদের প্রতাপ যত বাড়তে থাকল, দিনে দিনে নতুন নতুন বাবুরাও তত দেখা দিতে থাকলেন।

নতুন বাবুরা অঢেল অর্থ রোজগার করলেন। এঁরা প্রত্যেকেই এক একজন করে ছোটখাট নবাব বনে গেলেন। সাহেবদের আনুকুল্যে এদের ঘরে লক্ষ্মী উপচে পড়তে থাকল। পেশায় এরা ছিলেন দেওয়ান, গোমস্তা, দালাল, মুৎসুদ্দি, জমিদার অথবা তালুকদার। প্রচুর অর্থ কামালেন বটে, নানা খেয়ালখুশিতে এরা কিন্তু খোলামকুচির মত টাকা ওড়াতেও লেগে গেলেন। বাঈনাচ, টপ্পা, খেউর, সখের যাত্রা, অথবা দুর্গা পুজোর আড়ম্বর তো ছিলই। আরও নানান বদখেয়াল ছিল। আজ যদি দুনিয়ার গানে পাঁচশ

খরচ করেন, কাল হাজার খরচ করেন মোরগ খেলায়। বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা উড়ে যায়, ঘুড়ি ওড়ান বা বনভোজন এ সব তো ছিলই। সুতরাং এই বাবুরাই সেকালে বুলবুলি পাখির লড়ায়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? সেদিন বাবুদের নিয়ে একটি ছড়াও প্রচলিত ছিল, বুলবুল বিচারে যেমন ন-টি গুণের কথা বলা হত—এখানেও সেই নবধা বাবুর লক্ষণ—

> ঘুড়ি ঘুড়ি জম দান
> আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান।
> অষ্টাহে বনভোজন
> এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

মুঘল যুগের যেমন গৌরব-অগৌরবের কাল ছিল, বাবু-যুগেরও সে রকম ভালোমন্দেব সময় ছিল। অক্ষম বংশধরদের কল্যাণে দিল্লীর মসনদ যেমন মুঘলদের হাত থেকে চলে যায়, অক্ষম বাবুদের হাতে পড়ে বাবুগিরিও তেমনি মাটি হয়ে যায়। আর বুলবুলির বোলবোলা যায় নষ্ট হয়ে।

সেকালের কলকাতার বাবুগিরির কথা উঠলে সকলে আটবাবুর কথা বলত। এ আটজন—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। কে কত বেহিসাবী খরচ করতে পারেন, তারই প্রতিযোগিতা চলতো এদের ভেতর। হাটখোলার দত্ত-বংশের ছেলে রামতনু ছিলেন বাবুকুলের আকবর বাদশা। পাড়ের কর্কশতায় এর সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হত। আতর আর গোলাপ-জল দিয়ে উনি সারা বাড়ি প্রত্যহ ধোয়ামোছা করতেন। সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতে পেতল-কাঁসার থালা যেভাবে ব্যবহৃত হয়, এ'র বাড়িতে সোনারুপোর থালা তার থেকে অনেক অনাদরে ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঠাকুর্দা গল্পে যে নয়ন জোড়ের কথা লিখেছেন, তা সম্ভবত দত্তদের ঐ হাটখোলা। পুরনো কলকাতার লোকেরা সগৌরবে বলতেন—বাবু তো বাবু তনুবাবু।—এছাড়া বাবু হিসাবে নীলমণি হালদার, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব-পুরুষ ছাতু সিংহ, বাগবাজারের গোকুল মিত্র, ঠাকুর বাড়ির দর্পনারায়ণ ঠাকুর বা চোরবাগানের মিত্তিররা কেউ কম ছিলেন-না। আর বাবু থেকে যারা রাজা হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন সুখময় রায় এবং রাজকৃষ্ণ দেব।

জবচার্ণকের সঙ্গে হুগলী থেকে সুতানটিতে আসেন পোস্তা রাজবংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধর। সংক্ষেপে নকু ধর। সপ্তগ্রাম ছিল এঁর আদি

নিবাস। প্রচুর পয়সা ছিল এই নকু ধরের। অর্থে ইনি জগৎশ্রেষ্ঠ বা হুজুরিমলের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। মথুর সেন বা বনমালি সরকার যদি পুরনো কলকাতায় তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার জন্য খ্যাত হন, গোবিন্দরাম মিত্র বা নন্দরাম সেন যদি তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছড়ির জন্য সেকালের প্রবাদে পরিণত হয়ে থাকে, আর উমিচাঁদ দাড়ির মাহাত্ম্যে যদি অমরত্ব পান, তবে অর্থের খাতিরে নকুধর স্মরণীয় হবেন না কেন? সেকালের ছড়ায় নকুধরের নাম উঠেছিল।

গোবিন্দ মিত্তিরের ছড়ি
নকুধরের কড়ি।
বনমালি সরকারের বাড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি॥

পলাশির যুদ্ধের আগে রবার্ট ক্লাইবকে অঢেল অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন নকুধর। আর প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কোম্পানিকে ইনি নয় লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন। শোভাবাজার রাজবংশে প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেব এঁরই কাছে কেরানীগিরির কাজ করতেন। পরে তিনি ক্লাইবের মুৎসুদ্দি হন। এবং ভাগ্যও খোলে। কোম্পানী এদের কাজে খুশি হয়ে দিল্লী থেকে রাজা উপাধি আনিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ নবকৃষ্ণের ছেলে হলেন রাজকৃষ্ণ। আর অপুত্রক নকুধরের দৌহিত্র হলেন সুখময়। এর বংশধরেরা বুলবুলির লড়াইয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন। বিশেষত কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহচন্দ্র। বুলবুলির ইতিহাসে ইনি একটি অক্ষয় নাম।

বাবুর ইতিহাসে কেবল আট নয়, আরো অনেকের নাম-করা যায়, যাঁরা বাবু হিসাবে এদের সঙ্গে সমান। ভোলা ময়রা গান বেঁধেছিল—'বাবু তো লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ি।' এ লালাবাবুর কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু ছাতুবাবু লাটুবাবুর কথা বাদ দেওয়া যায় কেমন করে? আর যাতেই হোক বুলবুলির লড়াইয়ে ছাতুবাবুর নাম কোনক্রমেই পাশে রাখা যায় না।

ছাতুবাবুর আসল নাম হল আশুতোষ দেব। এর বাবা রামদুলাল ছিলেন একজন অতি সাধারণ লোক। হাটখোলার দত্ত বাড়িতে ভন্থুবাবুর বাবা মদন মোহন দত্তের কাছে বিল সরকার হয়ে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করতেন। পরে ওঁরই কাছে জাহাজ সরকার হয়ে দশ টাকা করে মাইনে পেতেন। একদিন হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল। নীলামওয়ালা টুলে কোম্পানীর অফিসে

গিয়েছিলেন। যেখানে দত্ত মশায়ের পক্ষ থেকে চোদ্দ হাজার টাকায় তিনি একটি জলে ডোবা জাহাজ কিনে ফেললেন। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার আগেই এক সাহেব সরকার মশায়ের কাছ থেকে এক লাখ টাকায় সেটি কিনে নিল। মফৎসে এক লাখ টাকা লাভ হয়ে গেল। এরপর হাটখোলায় এসে মদনমোহনবাবুকে সরকার মশাই যখন ঐ লাখ টাকা দিতে গেলেন, তিনি তা নিলেন না। রামদুলাল সরকারের সততায় মুগ্ধ হয়ে সে টাকা তিনি তাঁকেই ফিরিয়ে দিলেন। রামদুলাল পরে ঐ টাকার জোরে সততার সঙ্গে কাজ করে প্রভূত টাকা রোজগার করেন। বাড়িও করেন অজস্র। পাঁচ টাকার যিনি জীবন আরম্ভ করেন, জীবনান্তে তাঁর শ্রাদ্ধে ছেলেরা খরচ করেছিল পাঁচ লাখ টাকা। আর ছেলেরা বাবার কাছে সর্বমোট পেয়েছিল এক কোটি বাইশ লাখ।

বুলবুলির লড়াই হত শীতকালে। ছাতুবাবুর মাঠে। আজ যেখানে মিনার্ভা থিয়েটারটি দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওখানে বিরাট এলাকা জুড়ে একটি সুবিশাল ময়দান ছিল। সে ময়দানের মালিক ছিলেন ছাতু-বাবু স্বয়ং। মালিকের নামেই ছিল মাঠের নাম। লড়াই উপলক্ষে এখানে সারি সারি তাঁবু পড়ত। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে পঞ্চম দশক পর্যন্ত অন্তত দুই যুগ ধরে এই মাঠে বুলবুলির লড়াই হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ খেলার ছাতুবাবুই ছিলেন উদ্যোক্তা।

সাধারণত বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত খেলা হত। এ উপলক্ষে সারা কলকাতায় ধুম পড়ে যেত। হাজারে হাজারে বাবুরা আসতেন এ খেলা দেখতে। যুযুধান বুলবুলিরা দাঁড়িয়ে থাকত মুখোমুখি। মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়া হত খাবার। তারপর সেই খাবার নিয়ে সংগ্রাম বেঁধে উঠত। এ দলের বুলবুলিরা যদি হেরে গিয়ে উড়ে পালিয়ে আসত, তখন ওপক্ষ থেকে 'ধ্যো মারা' বলে সোল্লাস চিৎকার উঠত। জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্ত একজন মান্ত ব্যক্তিকে-রেফারী করা হত। সেকালের ভাষায় একে বলা হত—সালিসী। যাঁরা পাখিদের শিক্ষা দিতেন, তাঁদের নাম ছিল 'খলিফা'। আর যাঁরা উৎকৃষ্ট দর্শক তাঁরা 'সোয়াকীন' নামে খ্যাত হতেন।

আঠারোশ' চৌত্রিশ সালে 'সমাচার পত্রিকা' এই খেলা সম্পর্কে লিখেছেন—বহুকালাবধি এতন্নগরে একটি মহামোদের ব্যাপার আছে। বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধে ইদানীং অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন। এ জন্ত

ধনবান এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সথ বিচক্ষণাস্বাদন কারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালন করণে বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন।'

আঠারোশ' চৌত্রিশে মল্লিক বাড়ির ছেলে হরনাথের সঙ্গে ছাতুবাবুর লড়াই হয়। ছাতুবাবুর পাখির থেকে হরনাথের পাখিরা ভাল লড়াই করেছিল। সালিসী ছিলেন রাজা সুখময়ের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ রায়। প্রথমে হরনাথ মল্লিকের পাখিরা উত্তম লড়াই করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। দু' প্রহর দু' ঘণ্টার পর ঐ পক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। তারপর সভা ভেঙে যায়।

খেলাধুলার এ সব ব্যাপারে রাজা সুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহের উৎসুক্য ছিল খুব বেশি। ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীবাবুরাও যেদিন আলাদা রেসকোর্স তৈরি করে বসল, সেদিন নরসিংহ ছিলেন এ উত্তেজনার পথিকৃৎ। পোস্তার রাজবাগানে প্রথম ঘোড়া ছুটল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র আর হাটখোলার দত্তরা এ মাঠে ঘোড়ার খেলায় মেতে উঠলেন। সুতরাং বুলবুলির দল নিয়ে রাজা নরসিংহ ছাতুবাবুর মাঠে দেখা দেবেন না, এ কি কখনো হয়?—শ' দেড়েক শিক্ষিত পাখি নিয়ে তিনি প্রায় প্রতি বছরই আসতেন। ছাতুবাবুরও বুলবুলি শ' দেড়েক। এ লড়াই সব থেকে ভাল জমত।

তবে আঠারোশ' তিপান্নতে বুলবুলি পাখির যে যুদ্ধ হয় তার বোধহয় কোন তুলনা নেই। এ প্রতিযোগিতা হয়েছিল সিমুলিয়ার বাবু দয়ালচাঁদ মিত্রের সঙ্গে জোড়াসাঁকো নিবাসী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের। যে আড়ম্বরের সঙ্গে এ লড়াই হয়েছিল তার থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে বুলবুলির লড়াই সে সময় সাংঘাতিক প্রচলন ছিল। কলকাতার তাবৎ ধনী সমাজ পাগলের মত এ খেলা দেখতে আসতেন। না, একা আসতেন না। পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-অমাত্যবর্গ সবাইকে আনতেন সঙ্গে করে।

রাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায়। এঁর দত্তক পৌত্র হলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। ছাতুবাবুর বোনের বিয়ে হয়েছিল সিমুলিয়ার মিত্তির বাড়িতে। সম্ভবত সেই বাড়ির ছেলে হলেন দয়াল চন্দ্র মিত্র। ছেলেবেলা থেকেই বুলবুলিতে তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ছিল। আঠারশ' তিপান্নর খেলাতে তাঁরই জয়-জয়কার। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত তার হয়ে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন।

যে রূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর॥
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল।
হুনুচির হাতে পড়ে রণে ভঙ্গ দিল॥

বেলা দশটা থেকে আরম্ভ হয়েছিল খেলা। আড়াইটের ভেতর তা চুকে যায়। সাঁইত্রিশ জোড়া পাখির খেলা সেদিন মোটমাট হয়েছিল। এর ভেতর সাতাশবারই জেতেন সিমুলিয়ার দয়ালচাঁদ মিত্র। আর রাজা জেতেন মোট দশবার। তিন বছর ধরে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে নানান জায়গা থেকে ভাল ভাল পাখি জোগাড় করে ভাল 'খলিফা' রেখেও জিততে পারলেন না রাজা। নিতান্ত বিমর্ষ হয়েই রাজা অকালে মাঠ ত্যাগ করে পালিয়ে যান। হরিনারায়ণ গোস্বামী ছিলেন সালিশী। সালিশীর শেষ কথা তিনি আর শুনতে চাননি। কেননা পাখিরা যে তার সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন নি।

একে একে রাজাজীর ভালো পাখী সব।
বাবুর পক্ষীর কাছে হলো পরাভব॥
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর।
সমর করিল যেন অমর কুমার॥
হায় হায় কি লিখিব দেখে হয় দয়া।
সপ্তমী না হতে হইল বিজয়া॥

* * *

এইভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বাবুদের বিনোদনে বুলবুলি আত্মনিয়োগ করে এসেছিল। বাবুরাও বুলবুলির সেবায় ভারি খুশী। পরবর্তীকালে বাবুরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছেন। কিন্তু মজা এই যে বুলবুলির নেশা ছাড়তে পারেননি। দুর্গাপুজোর আড়ম্বর কমিয়ে দিয়েছেন। খোকার অন্নপ্রাশনে তেমন ধুম করতে পারেননি। বিষয়কর্ম গোল্লায় গিয়েছিল। তবু বুলবুলিকে ছাড়তে পারেননি সেকালের বাবুসমাজ। পাড়ায় পাড়ায় এ খেলা বেড়েই চলেছিল। আর ছড়া বেরিয়েছিল বাবুদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে—

দুর্গাপুজার ঘণ্টা নাড়ো,
খোকা হলে বাজাও ঢাক।

কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে
খাঁচায় পুরলে নাকি কাক ॥
বিষয়কর্ম গোল্লায় গেল
লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হায় হায়!
মারা গেল লোকগুলি ॥

মুখে, ভুরুর পাশে ও চোখের কোলে কালি জমে উঠেছে। তরঙ্গায়িত বাউড়িচুল বিস্রস্ত, দাঁতে হয়তো মিশি লাগানো হয়নি, ফিনফিনে কালা পেড়ে ধুতি মলিন হয়ে গেছে। চুনট করা উড়ানী উড়ছে হাওয়ায়—বাবু এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর পথে। কিন্তু তার থেকেও মরণতুল্য নেশা, বুলবুলি। বুলবুলির সঙ্গে জড়াজড়ি করেই বাবুরা একদিন চোখ বুজলেন। শহর কলকাতার ইতিহাস থেকে বাবু ও বুলবুলি দুই জনেই হারিয়ে গেল।—না, সে গৌরব আর কোনোদিন ফিরবে না। নৈব নৈব চ।



বাবুদের বিনোদনে রঙীন পানীয়

সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব কোনো এক আকস্মিক মুহূর্তে হয়ত আমরা চাক্ষুষ করলেও করতে পারি, কিন্তু পানাসক্তি নেই অথচ তিনি বাবু ছিলেন—এমন অভিনব সংবাদ পুরানো কলকাতার ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যাবে না। বাক্ ও অর্থের মতই বাবু ও তাঁর পানাসক্তি বাঁধা ছিল নিত্যসম্বন্ধে। একেকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শুধু কলকাতার বাবুদের কথাই বা বলি কেন। পৃথিবীর তাবৎ বাবু-কুলের সঙ্গে সুরা দেবীর সম্পর্ক বড়ই মধুর। এই ধরাধামে এমন কবি দুর্লভ যিনি ঐ তরল পানীয়টি সম্পর্কে দু'চার লাইন না লিখেছেন। প্রজ্ঞাবান এমন কোনো দার্শনিকের দেখা পাওয়া যাবে না যিনি পানচর্চার ওপর চোখা চোখা দু'একটি আপ্তবাক্য ব্যবহার না করে থাকতে পেরেছেন।

অলিভার হারফোর্ড নামে এক কবি লিখেছিলেন 'ঈশ্বর তৈরী করলেন মানুষ, ঐ মানুষ বুদবুদের মতই ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা,

কিন্তু এ ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যন্ত্রণা। ঈশ্বর নির্মাণ করলেন দ্রাক্ষালতা। আর মানুষ?—মানুষ তা থেকে বানিয়েছে মদ। সে কি অপরাধ করেছে? আর কে না জানে মানুষের সৃষ্ট মদ সকল যন্ত্রণার উপশম ঘটায়।'

সুতরাং এ মদকে যে না ভালোবাসে, সে আবার মানুষ কিসের! যোহান হাইনরিখ ডস নামে এক জার্মান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন—'যে মানুষ মদ, মেয়েছেলে আর গান ভালোবাসে না, সারা জীবনটা সে বুদ্ধুই রয়ে গেল—রিমেন্স্ এ ফুল হিজ হোল লাইফ লং।'

পুরনো কলকাতার বাবুরা আর যাই হোন, ঐ অর্থে কদাপি বুদ্ধু ছিলেন না। মদ, মেয়েমানুষ আর গানের ওপর তাঁদের আকর্ষণ ছিল দুর্বার। তাই যথার্থই যাঁরা রসিক ছিলেন, ছিলেন বুদ্ধিমান, পানপাত্র তাঁরা কখনো হাতছাড়া করতেন না। ফলে যে সব অঘটন ঘটত, তা যেমন ছিল রোমহর্ষক, তেমনি রোমাঞ্চকর।

বাবু কলকাতার বিখ্যাত লেখক টেকচাঁদ একবার লিখেছিলেন—'কলিকাতার যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড়ো মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়। গাঁজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেপি পিসি - যাঁহার বয়স ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারই খারিজ আছেন।—কলিকাতা এক্ষণে তদ্রূপ।'

কথাটি শুনে মনে হতে পারে, হয়ত এর ভেতর অতিশয়োক্তি আছে। হয়ত আছে। তবে একটি নিবিড় সত্যও আছে এর ভেতরে। সে সত্যটি হল, সেকালের বাবু সমাজে পানদোষ ছিল না কার?

যাঁরা প্রভূত ধনশালী, যাঁদের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দেউড়ীতে দারোয়ান, সিন্দুকে টাকা,—তাঁরা যে বিলাস ও আরামের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! এঁরা বাইজীর পেছনে, বাগানবাড়ীতে এবং পানচর্চায় যে দু হাতে খরচ করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

আর ব্যাপারটি উল্টো হওয়া উচিত ছিল ইংরেজী শেখা অল্পবিত্ত নব্য-

বাংলার ছেলেদের বেলায়। কিন্তু ডিরোজিও সাহেবের কল্যাণে নব্যবাংলার নায়কদের কাছে মদ্যচর্চা হয়ে দাঁড়াল একটি প্রতীকী ব্যাপার। অর্থাৎ সংস্কৃতির লক্ষণ। মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, একগ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর একধাপ জয়লাভ করা।'

বলা বাহুল্য, ঐ কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নব্যবাংলার নবীন নায়করা একে একে এই পথে নেমে পড়লেন। বড়ো লোকের বখা ছোকরারাতো ছিলই, এখন তাদের সঙ্গে বুদ্ধিমান সংস্কারকামী নায়কেরাও যোগ দিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও এই সামাজিক পটভূমির ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'সে সময় সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সমাজ সংস্কারক দলের অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।'

এই অগ্রগণ্যের দলে রামমোহন-দ্বারকানাথ, রামগোপাল-দক্ষিণারঞ্জন-হরিশ মুখোপাধ্যায় থেকে মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু সকলেই ছিলেন।

রামমোহন ডিরোজিয়ানদের থেকে অগ্রজ ছিলেন। তাঁদের বিপ্লবমন্ত্রে তাঁর দীক্ষা ছিল না। আর পথটাও ঠিক এক ছিল এমন বলা যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, মদ খাওয়ার ব্যাপারে রামমোহন আর পাঁচজন ডিরোজিয়ানদের মতই ছিলেন উদার। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে নয়। তার লক্ষ্য ছিল, মদ খাবে কিন্তু মাতাল হবে না।

রাত্রিবেলা বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে রাজা রামমোহন চেয়ার-টেবিলে ইংরেজি রীতিতে খানাপিনা করতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলকে তিনি সুরাপান করাতেন এবং নিজেও করতেন। তবে এ ছিল পরিমিত। রোজ একই রকম খেতেন, পরিমিত সীমাকে কখনও তিনি লঙ্ঘন করেন নি। শোনা যায় তাঁর এক অনুরাগী কৌতুক দেখবার জন্য তাঁকে ঠকিয়ে একগ্লাস বেশি মদ খাইয়ে দিয়েছিল। পরে রাজা যখন টের পেলেন, তখন তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। এবং ছয়মাস ধরে তার মুখদর্শন করেন নি।

সেকালের অভিভাবকরাও তাঁদের ছেলেদের মদ্যপান সমর্থন করতেন—শোনা যায়, মাইকেল তাঁর বাবার সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতেন। নন্দকিশোর

বসু মহাশয়ও এইরকম এক সচেতন অভিভাবক। তিনি ছিলেন আবার রামমোহনের শিষ্য। হঠাৎ একদিন তিনি শুনলেন যে তাঁর ছেলে রাজনারায়ণ মদ ধরেছে। এই রাজনারায়ণ ছিলেন মধুসূদনের সহপাঠি। বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই মদ খেতেন। সুতরাং রাজনারায়ণও মদে অনুরক্ত হবে, তাতে আর বিস্ময়ের কী!

না, বাবা নন্দকিশোর বিস্মিত হলেন না।

তিনি একদিন গোপনে ডেকে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি মদ খাও?'

রাজনারায়ণ অকপটে বললেন, 'হ্যাঁ।'

বাবা তখন তাঁকে আলমারির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, দাঁড়াও। তারপর আলমারি খুলে একটি বোতল আর একটি মদের গ্লাস বের করলেন। একটু মদ ঢেলে দিলেন গ্লাসে এবং গ্লাসটি এগিয়ে দিলেন ছেলের হাতে। নন্দকিশোর নিজেও একটু পান করলেন, পরে বললেন, 'যখনই মদ খাবে, আমার সঙ্গে পান করবে। অন্য কোথাও খাবে না।'

ছেলের প্রতি বাবার এই উদারতার সংরক্ষণশীল একটি উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হল, ছেলে যাতে মাত্রাতিরিক্ত মদ না খায়।

সেকালে মদ খাওয়াটাই ছিল কালচার; তাকে যখন বাদ দেওয়া যাবে না, তখন এই মাত্রার দিকে নজর-দেওয়া ছাড়া আর উপায় কোথায়?

রামতনু লাহিড়ীর মতন আদর্শ চরিত্রের মানুষ সেকালে খুব কম ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, সেই রামতনু বাবুকেও সভ্যতার খাতিরে মদ ধরতে হয়েছিল। সে মদ খাওয়ার ঘটনাটি বড়োই মজার। সেকালে ডিরোজিয়ানরা আলাপ আলোচনার জন্য কেবল যে তাদের গুরুর বাড়িতেই সমবেত হতেন, তা নয়। অপরাপর ইউরোপীয়দের বাড়িতেও তাঁরা মিলিত হতেন। সে সময় হাওড়াতে রেভারেণ্ড হাউ নামে একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন অ্যাডাম সাহেব। সেই অ্যাডাম সাহেবের উদ্যোগে হাউ সাহেবের বাড়িতে একদিন ডিরোজিয়ানদের সভা বসল। তার মেয়ে মিস্ হাউ দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনায় রামতনুকে একগ্লাস শেরি অফার করলেন। রামতনু ভারি ভালোমানুষ ছেলে। মদকে তার তখন ভারি ভয়। এ অবস্থায় বেচারি যে কী করবেন তা ভেবে পেলেন না।

এদিকে দক্ষিণারঞ্জন কানে কানে এসে বলল: ইংরেজ সমাজের এই

নিয়ম যে ভদ্রমহিলারা কিছু অফার করলে তা 'না' বলতে নেই, আর 'না' বলাটা ভীষণ অসভ্যতা। তাই চট্‌পট গ্লাসটা হাতে তুলে নাও, এক ঢোক খেয়ে নাও। ঠেকিয়ে নাও ঠোঁটে।'

বেচারি রামতনু কী আর করেন। সেই প্রথম চরিত্র কলুষিত করে মদ পান করলেন—এইভাবে নাটকীয় পরিস্থিতিতে তিনি যেমন মদ ধরেছিলেন, অনুরূপ নাটক করে আবার মদ খাওয়া ছেড়েও দিয়েছিলেন।—সে কথা পরে।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের কথা আমাদের অনেকেরই জানা। তিনি অসাধারণ তেজী ও জেদী পুরুষ ছিলেন। এক কথায় তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং পরে কখনো আর দারপরিগ্রহ করেন নি; এই অসাধারণ পুরুষও মদের আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেন নি। একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

ছাড়িয়া ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে।
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে॥

অর্থাৎ মদ খাও, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু খবরদার! মাতাল হয়ো না।

আরো পাঁচজন মনীষীর মত কবি ঈশ্বর গুপ্তও বিশ্বাস করতেন যে সংযম না থাকলে মদ খাওয়া উচিত নয়। মদ খেতে হলে, তার যোগ্য পাত্র হতে হবে।

তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও॥

মদ যে কী ভয়ংকর হতে পারে রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র হরিশ মুখোপাধ্যায় তার প্রমাণ। কালী-প্রসন্ন সিংহের কথাও উল্লেখ করা যায়। এঁদের সকলের অকাল মৃত্যুর জন্য মদই একমাত্র দায়ী।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক কালীপ্রসন্ন এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র রচয়িতা মধুসূদনকে বাঙালী পাঠকদের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই। হরিশ ও রামগোপাল ইদানীং বিস্মৃত হলেও উনিশ শতকের মানুষরা একে একডাকে চিনতে পারত। নীল অত্যাচারের করুণ কাহিনী 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র পাতায় দিনের পর দিন তুলে ধরেছেন যিনি সাহেবদের রোষবহ্নিকে যিনি এক কাণাকড়িও মূল্য দেন নি—তিনিই হলেন হরিশ মুখোপাধ্যায়। হরিশ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন

মানুষ ছিলেন, কিন্তু সব জিনিসই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মদের খপ্পরে পড়ে। অতিরিক্ত ও অপরিমিত মদ্যপান হরিশের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল এবং পরে অকাল মৃত্যু ঘটে।

বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের আয়ুষ্কাল ছিল তিপ্পান্ন বৎসর। এই তিপ্পান্ন বছরের সীমানাতেই তিনি অসাধারণ বাগ্মী বলে বিখ্যাত হন। বক্তৃতা দিয়ে তিনি 'না'-কে 'হ্যাঁ' এবং 'হ্যাঁ'-কে 'না' করে দিতে পারতেন। বড়ো বড়ো ইউরোপীয় ব্যারিস্টার এবং হোমরা চোমরা সাহেবরা পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতার তোড়ে ভেসে যেতেন। ফৌজদারী বালাখানায় তিনি যে সব স্বদেশী বক্তৃতা করতেন, তার প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' একবার লিখেছিলেন,—'এখন দুই দিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হইতেছে। পশ্চিমে বানাহিসারে ও পূর্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।'—আঠারোশ সাতচল্লিশ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যে সভা হয়, টাউন হলের সে সভায় বক্তৃতা করে রামগোপাল 'ভারতের ডিমস্থিনিস' আখ্যা পান। ইংরেজদের মুখপাত্র স্বরূপ একটি প্রধান সংবাদপত্র তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—'ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস দেখা দিয়াছে, এক জন বাঙ্গালী যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংরাজ ব্যারিস্টারকে ধারাশায়ী করিয়াছে।'

যাইহোক, এই অসাধারণ তেজস্বী মনীষী রামগোপালও সুরাদেবীর বিষময় সংসর্গে পড়ে জীবন ছারখার করে ফেলেন। তিনি শুধু নিজেই মদ খেতেন না অপরকে খেতে প্ররোচিত করতেন। শোনা যায়, তাঁর এক ভাগ্নে বি, এ, পাশ করেছিল কিন্তু মদ খেত না। রামগোপাল তাকে প্রায়শই ধমক দিয়ে বলতেন, 'এখনও তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে ভদ্রসমাজে বের করি কী করে! তুই কলেজের নাম ডোবালি।'

রামগোপালের বাড়ি সেকালে মদ্যচর্চার একটি আখড়া ছিল। ঘোষ মশাই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রচুর মদ খেতেন। এবং মাঝে মাঝে বে-এক্তিয়ার হয়ে যেতেন। কম বয়সী আত্মীয় যুবকরাও বেহোস হয়ে নানান রকম মাতলামি করত। আঠারোশ উনষাট সালে রামতনু লাহিড়ী কৃষ্ণনগর থেকে শিক্ষাকতার একটি চাকরি নিয়ে আসেন কলকাতায়। ঠিক কলকাতায় নয়, কলকাতার রসপাগলায়।

এই রসপাগলায় থাকবার সময় প্রায়ই তিনি রামগোপালের বাড়ি আসতেন। দু' একপাত্র খেতেন। হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন, রাম-

গোপালের এক আত্মীয় যুবক মদ খেয়ে ভীষণ বেলেল্লাপনা করছে। মরালিস্ট রামতনুর কাছে ব্যাপারটি ভীষণ খারাপ লাগল। ঐ অশোভন অভদ্র আচরণ সমর্থন করা উচিত নয় বলে তিনি ঠিক করলেন। রামগোপালকে পরের দিন তিনি বললেন, দেখ রামগোপাল, আমাদের এই মদ খাওয়া দেখে বাড়ির ছেলেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মদ খেয়ে বিশ্রী ভাবে মাতলাম করছে। এসো আমরা মদ খাওয়া ছেড়ে দিই।'

না, রামগোপাল মদ ছাড়তে পারলেন না। রামতনু সেদিন থেকে কিন্তু মদ আর স্পর্শ করলেন না। যেমন নাটকীয় ভাবে তিনি মদ ধরেছিলেন, তেমনি নাটকীয় ভাবে তিনি ছেড়ে দিলেন মদ।

এইসব দেখে শুনে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, সেকালে মদ খেতেন না কে? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ শিকদার, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি সকলেই এক সময় না এক সময় মদের শিকার হয়েছিলেন। শোনা যায়, দীনবন্ধু মদ খেতে শিখিয়েছিলেন বঙ্কিমকে। যৌবনে দুজনে প্রচুর মদ খেতেন। পরে মদ খাওয়ার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে দুজনেই সচেতন হয়েছিলেন। দীনবন্ধু মদ খাওয়াকে নিন্দিত করে লিখেছিলেন, 'সধবার একাদশী।' আর মদ খাওয়া ছাড়তে পারছে না বলে বঙ্কিমের সারা জীবন ভীষণ ক্ষোভ ছিল।

মদ খাওয়ার পর অনেক শিক্ষিত ইংরেজি জানা ইয়ং বেঙ্গল এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন যা শুনলে গালগল্প বলে মনে হবে। কেননা, এ সব তাঁদের মানায় না। এ কাণ্ড গুলিতে যেমন কৌতুক অনুভব করা যায়, তেমনি পরোক্ষভাবে একটি অন্তর্নিহিত বিষাদও আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

শিক্ষিত মাতালদের কয়েকটি কৌতুককর ঘটনা বর্তমান প্রসঙ্গে বিবৃত করা যেতে পারে।

শ্যামবাজারের এক বাবুর বাড়িতে সেবার বিদ্যাসুন্দরের পালা গান হচ্ছে। বাড়ির মেজো বাবু ইয়ারদের নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেছেন। আসর জমজমাট। মজলিসে রূপোর গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি চলছে। বাড়ির টিকটিকি থেকে শালগ্রাম শিলাটি পর্যন্ত নেশায় ভোঁ হয়ে আছে। মালিনী ও বিদ্যা গান ধরেছে— 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ করে কি গুণ ঐ বিদেশী'—। গান শুনতে শুনতে ইয়ং বাবু বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

হুঁশ যখন হল তখন নাটক অনেকখানি এগিয়ে গেছে। যাত্রার কোটাল

তখন মালিনীকে বেঁধে মারছে। আর মালিনী নিরুপায় হয়ে বাবুদের দোহাই পেড়ে আসর সরগরম করে তুলেছে।

বাবু চোখ কচলাতে কচলাতে এ দৃশ্য দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। মালিনী বাবুদের দোহাই দিচ্ছে তবু কোটালের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কোটালের এত বড়ো স্পর্ধা! সামনেই ছিল মদ ঢালা রূপোর গেলাস। হ্যাঁ, বেশ ভারি। সেই ভারি গেলাসটি হাতে তুলে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারলেন কোটালকে লক্ষ্য করে।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদ। গেলাসটি সোজা গিয়ে লাগল কোটালের রগে। 'বাপ!' বলে কোটাল ধরাশায়ী হল। আসর থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চোখে মুখে জল দেওয়া হল। দৌড়ে ডেকে আনা হল ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, বেচারি কোটাল সেই যে 'বাপ!' বলে চোখ বুজেছিল, সে চোখ আর খুলল না।

হায়! তুচ্ছ মদের গেলাস থেকে কী অঘটনই না ঘটল!

খাজাঞ্চী রামকালীর ঘটনাটি অবশ্য ট্রাজিক নয়, কিন্তু ট্রাজিক হলে তাকে ঠেকান যেত না।

রামবাবু ইংরেজি জানা ব্যক্তি। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও পড়া। আপিস ফেরতা দু-এক পাত্র না খেলে তাঁর চলে না। আর দু-এক পাত্র খেতে খেতেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন চলার পথে পা আটকিয়ে যায়। সেদিনও তাই হল। আপিস ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসছেন। পাগড়িটা এলিয়ে পড়েছে, ধুতি কুণ্ডুলি পাকিয়ে গেছে, পা টলমল করছে। জোড়াসাঁকোয় এসে পা আর চলে না।

ঠাকুর পরিবারের একটি চাকর এদিকে মদ খেয়ে টলমল করতে করতে আসছিল।

রামবাবু তাকে দেখে হাকার দিলেন—'আরে ব্যাটা মাতাল'—

'মাতাল!' চাকরটা থমকে দাঁড়াল, তারপর চেঁচিয়ে বলল: 'তুই শালা কীরে!—আমায় মাতাল বলছিস যে!'

রামবাবু হুঙ্কার দিলেন, 'আমি রাম।'

চাকরও সঙ্গে সঙ্গে বলল: 'আমি তবে রাবণ।'

'তবে যুদ্ধং দেহি'—এই বলে রামবাবু যুদ্ধ করবার জন্ত উদ্যত হলেন। আর যুদ্ধ করতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নেশার ঝোঁকে পড়ে গেলেন ধুপুস করে।

চাকর মাতাল সঙ্গে সঙ্গে বুকে চড়ে বসল।

এদিকে ঠিক সেই সময় থানার সুপার সাহেব বেরিয়েছেন রোঁদ দিতে। চাকর মাতাল ওরই ভেতর শক্ত ছিল, পুলিশ দেখে সে উঠে পালাবার উদ্যোগ করল।

রামবাবু কিন্তু তখনো শয়ান। রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'ছি বাবা! এখন রামের হনুমানকে দেখে পালালে! ছি!'

পুরনো কলকাতায় শিক্ষিত মাতালদের এ জাতীয় কাহিনী অনেক। সব কাহিনী সংগ্রহ করলে মহাভারত হয়ে যায়। তাই অলমতি বিস্তরেণ। তবে দনুবাবুর ও প্যারীবাবুর কথা না বললে মূল বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই এ কাহিনী বলতেই হল।

দনুবাবু সেদিন সন্ধ্যার পর দু' চারজন স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন। এমন সময় কলেজের প্যারীবাবু চাদরের ভেতর লুকিয়ে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আর একটি শেরী নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলেন। প্যারীকে দেখামাত্রই চারদিকের জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যাতে জানতে না পারে, কেউ যেন গন্ধ না পায় এইভাবে গোপনে ঘরের ভেতর বোতল সেবা চলল।

এদিকে নেশাও চেপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে দরজা জানালা খোলা হল। হাসি-মস্করা আরম্ভ হল। পরে যখন শেরীর বোতলটি চলল, তখন সকলে বে-এক্তিয়ার। মাতাল হয়ে সবাই আরম্ভ করেছিলেন চেঁচামেচি। হৈ হট্টগোল।

দনুবাবুর বাবা অর্থাৎ বাড়ির কর্তা সে সময় চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন। হৈচৈ শুনে তিনি উঠে গিয়ে ছেলেদের বকাঝকা আরম্ভ করলেন।

তখন কে কার কথা শোনে? বরং বিপরীত ফল হল। দনুর ফ্রেণ্ডরা ভীষণ রেগে গেল এবং দনুও। কর্তাকে ধরে কষে কয়েকটা ঘুষি লাগাল। ইয়ংবেঙ্গলের ঘুষি—বেজায় জোর। বাড়ির কর্তা তাতে ধরাশায়ী হলেন।

কর্তা ধরাশায়ী হওয়াতে পরিবারের আর সকলে হাঁ-হাঁ করে এলেন। মা এলো কাঁদতে কাঁদতে। হঠাৎ হাঙ্গামা বাধতে পারে এবং পুলিশ আসতে পারে দেখে ফ্রেণ্ডরা চটপট কেটে পড়লেন। এদিকে মায়ের কান্না দেখে দনুবাবুর করুণা হল। এদিকে বাপের ওপর রাগও প্রবল। মাকে সান্ত্বনা

দিয়ে বাবু বললেন, মা! বিদ্যেসাগর বেঁচে থাক। তোমার ভয় কী! ও ওল্ডফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাই না। এবারে মা এমন বাবা এনে দেব না—তুমি বাবা আর আমি একত্রে তিনজনে বসে হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করব, ও ওল্ডফুল মরে যাক। আমি হোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই।'

না, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাবু-কলকাতার এই শিক্ষিত মাতালদের কথা লিখতে গেলে সত্যি সত্যিই এক মহাভারত রচনা করতে হয়।

মোদ্দা কথা গোটা কলকাতা একদিন মদের স্রোতে ডুবে যাচ্ছিল। শুঁড়ির জামাই হয়ে দিন কাটাবার স্বপ্ন দেখেছিল আমাদের ইয়ং বেঙ্গল। তবে শেষ পর্যন্ত তা হল না। ব্রাহ্মরুচিবোধ এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত হিন্দুসংস্কার আমাদের বাঁচিয়ে গেল। নইলে সত্যি সত্যিই কী হত তা বলা কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর ও অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার হাত থেকে ঈশ্বর আমাদের খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যে দেশের শিক্ষিত সমাজ মদ খাবার জন্য মায়ের পুনর্বিবাহ দেবার চিন্তা করেন, সে দেশের সর্বনাশ হতে আর বাকি কী ছিল?

অলিভার হারফোর্ড হাইনরিখ ভস যতই মদের মাহাত্ম্য প্রচার করুন না কেন, তা কাব্য হিসাবে মন্দ লাগে না। ব্যবহারিক জীবনে সে আদর্শ সর্বদা পরিত্যাজ্য। মধুসূদন থেকে দীনবন্ধু সকলে রীতিমত খেয়েও, মাতালদের নিন্দাই করে গেছেন।



পালার নাম হুঁকো-বিলাস

'হে হুঁকে! হে আলবোলে! হে কুণ্ডলাকৃত ধূম্ররাশি সমুদ্গারিণি! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনের শ্রমহারিণী, অলসজন প্রতিপালিনী, মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? হে বরদে! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘ-গর্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।'

বন্দেমাতরম্ যিনি রচনা করেছিলেন, এই উৎকৃষ্ট হুঁকো-প্রশস্তিও তাঁর রচনা। এটি সম্পূর্ণ নয়, অংশবিশেষ। গবেষক বা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করবেন কি না জানি না—এ হেন হুঁকো-স্তোত্র যে কোনো ভাষা বা সাহিত্যে দুর্লভ। যথার্থ অনুরাগ না থাকলে এ ভাষা কারো কলম থেকে কি সহজে বেরোয়?—তবে হুঁকো-রসিকেরা হয়ত এর বিপরীত সত্যটিকেও দেখাতে পারেন। তাঁরা হয়ত দাবি করতে পারেন—হুঁকোর মত দেব-দুর্লভ বস্তু নিয়ে যা কিছু রচনা করা হোক না কেন, তা আপন মহিমাতে আপনিই উজ্জল হয়ে উঠবে। নইলে এর নাম হুঁকো কেন?

হুঁকো শব্দটি আরবী। ইতিহাসের কোন উষালগ্নে উটের পিঠে কোন্ অজ্ঞাত আরব বণিকের হাত ধরে সে পূর্বদেশ জয় করতে বেরিয়েছিল কে জানে? অনেকে হয়ত অনুমান করেন—পর্তুগীজদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আকুল সাগরে পাড়ি দিয়ে সে হয়ত কালিকটেই এসে নেমেছিল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে দিল্লী। সেদিন তাকে কে কেমন আদরে ঘরে তুলে নিয়েছিল অনুমানকারী গবেষকরা সে তথ্য দিতে পারেন না। এখানে তাঁরা নীরব। তবে যাঁরা হুঁকোর গৌরব সম্পর্কে যথার্থই কৌতূহলী হালাল-ই-আসাদ-এর পাতা ওল্টালে তাঁরা খুশি হবেন। মুঘল সম্রাট দেখামাত্রই হুঁকো বিলাসে যে মজেছিলেন তার বিবরণ আসাদ খাঁ দিয়ে গেছেন। সুতরাং এ বস্তুর কি অনাদর হয়?—আর এর দীন বাহক হিসাবে কোনো গৌরব যদি কেউ দাবি করতে পারেন, তবে সে দাবিদার হিসাবে ফিরিঙ্গি বণিক বা জেস্‌ইট পাদ্রীরা নয়—আসাদ খাঁ-ই একমাত্র ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে পারেন।

সে ষোলোশ চার কি পাঁচ সালের কথা। দিল্লির তখ্‌তে সেদিন স্বয়ং আকবর বাদশাহ। আগের দিন সন্ধ্যায় দীর্ঘ অশ্বারোহণে দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসেছেন আসাদ। সকাল হতে-না-হতেই নবাব এত্তেলা পাঠালেন। কুর্নিশ করতে করতে বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়ালেন আসাদ। বিজাপুরের সুলতান আদিল খাঁ ভারত সম্রাটের প্রীতির জন্য অঢেল উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। অঢেল। সেই দুর্লভ উপঢৌকনগুলি আসাদ খাঁ একে একে সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন! অজস্র মূল্যবান সামগ্রী। সে সব জিনিষের জেল্লা দেখে অনেক মিঞা সাহেব মায় আমীর-ওমারহের লোভ পর্যন্ত সক্‌সকিয়ে উঠল। আসাদ এক এক করে সেগুলির মনোহারী বর্ণনা দিয়ে গেলেন। কত দাম আর কী-ই বা তাদের বৈশিষ্ট্য—কোন কথাও উহ্য রাখলেন না। সম্রাট শুনে গেলেন কোনো ইশারাই তাঁর চোখে ধরা পড়ল না।

একবারে শেষ। একটি রূপোর রেকাবে সাজানো কতকগুলি আশ্চর্য জিনিস এবার মেলে ধরলেন আসাদ। এমন জিনিস কেউ কোনদিন দেখেনি। একটি দণ্ড—মণিমুক্তো গাঁথা। হাত তিনেক লম্বা সাপের মতন একটি সরু নল। আরেকটি মুখনল। ডিম্বাকৃতি। সোনার তৈরী।—একটি পান-সুপারির থলি না বলে একে একটি পেটিকা বলাই ভালো। কেন না, তার গায়ে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য। তার ভেতর থেকে পানের বদলে বেরিয়ে এলো কিসের যেন কালো কালো পাতা।

শান্ত সমুদ্রের মত সাহান-শার চোখ দুটি অনুদ্বিগ্ন ছিল। হঠাৎ সমুদ্রের বুকে ঝিলিক দিয়ে উঠল সূর্যালোক! শীর্ণ ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হল। সমুদ্রের বুকে যেমন আলো কাঁপে তৈমুরের বংশধরের চোখে তেমনি কেঁপে উঠল জিজ্ঞাসা।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আজিজ কোকা মির্জা ওরফে নবাব আজম খান। তিনি লম্বা কুর্নিশ করে বললেন, 'সাহান-শা, অধীনের গস্তাখী যদি মাপ করেন, তবে নিবেদন করি।—এর নাম হুঁকো। মক্কা, মদিনায় এ জিনিসের খুব চলন। এতে ধূমপান করা খুব আরামের! অনেক সময় এ-ধূম ওষুধের কাজ করে। সম্রাট যাতে সুস্থ থাকতে পারেন এই ভেবে আসাদ খাঁ অনেক যত্নে এটি আপনার জন্য নিয়ে এসেছে।'

বাদশাহ কৌতূহলী হলেন। আসাদ আজম এ ফাঁকে এক ছিলিম তামাক সেজে ফেললেন। সম্রাট টান দিলেন ফরসিতে। মৃদু মৃদু। ওদিকে খুশি খুশি আওয়াজ উঠল—ভুড়ুক ভুড়ুক। হিতৈষীরা সাহান-শা'র কাছে দৌড়ে এলো। হাঁ-হাঁ করে উঠল। উদ্যত হল নিষেধ। না, ভারতেশ্বর আকবর বাদশাহ সে সব তুচ্ছ কথা কানেই তুললেন না। বরং আজমের দিকে ফরসি এগিয়ে প্রসাদ বিতরণ করলেন। আসাদ খাঁকে প্রশংসা করলেন অনেক।

আসাদ এই রকম একটি সুযোগের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। বিজাপুর থেকে আরো কতকগুলি নল নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এবার একে একে সেগুলি তিনি খাঁ সাহেব আর অমীর-ওমরাদের হাতে তুলে দিলেন। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল—ভুড়ুক ভুড়ুক। মুঘল-দিল্লী তামাকের গন্ধে এলো ভারি হয়ে।—সকলেই নেমে পড়লেন হুঁকো-বিহারে।

পালার এই হল আরম্ভ। যে দিল্লী একদা তামাক শূন্য ছিল, সেখানে ঘন ঘন তামাক বেচা-কেনা আরম্ভ হয়ে গেল। মুঘল সম্রাটরা এই তামাক বিক্রয়ের ওপর কর চাপালেন। কেবল ঐ বিক্রয়-কর বাবদ মুঘল তোষাখানায় নগদ পাঁচ হাজার তঙ্কা করে জমা পড়তে থাকল। এ হিসাব দৈনিক। সুতরাং দৈনিক তামাক বিক্রয় কত ছিল এ থেকে একটা হিসাব এলেও আসতে পারে।

হুঁকো-বিলাসে কেবল আমীর-ওমরাহ বা নবাব-বাদশাহেরাই যে এগিয়ে

এলেন তা নয়, বেগম মহলেও রীতিমত চাঞ্চল্য পড়ে গেল। তামাকের গন্ধে হারেমও উঠল মৌ মৌ করে। বাপের আসনে বসে জাহাঙ্গীর অবশ্য হুঁকো চর্চা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কি কখনো টেঁকে? ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষীরা তরল পানিয়ে চুমুক দিতে অভ্যস্ত ছিলেন; ডান হাতের পানপাত্র তাঁরা নামলেন না, বাঁ হাত বাড়িয়ে এবার তুলে নিলেন সটকা। রত্নখচিত পালঙ্কে মুক্ত প্রবালের ঝালর ঝোলানো শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে জরির কামদার বালিশে ঈষৎ হেলে সোনার আলবোলায় - হীরে বসানো নলে শাহজাদীরাও মৃদু মৃদু টান দিলেন। একেবারে মেঘগর্জনের মত না হলেও বাদশাজাদীর অধরোষ্ঠের ছোঁয়ায় আলবোলাও সাড়া দিল—ভুড়ুক ভুড়ুক।

দিল্লীর মুঘল দরবারে পৌঁছনোর আগে এ হুঁকো-বিলাস বাঙলা দেশে ছিল কি না এ জিজ্ঞাসায় কোনো উৎসাহী গবেষক সচেষ্ট হতে পারেন। তবে যতদূর জানা যায় আকবর বাদশাহের কালকে আমাদের হরিপদ কেরানীরা হারাতে পারেননি। আর হুঁকোর মহিমাই এমনি যে রাজ-রাজড়াদের হাত ছাড়া তা মানায় না। আর যদি কোনো সামান্য লোকের হাতে এটি কখনো থেকে, তবে তার বরাত খুলতে দেরী নেই বুঝতে হবে। সহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা চার্নক তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তাই হুঁকোর ইতিহাস খুঁজতে হলে বিলাসী নায়কদের পিছনে না ঘুরে উপায় কোথায়?

সে ষোলশ নব্বই সালের কথা। মুঘল গৌরব তখন অস্তমিত। দিল্লীর তখ্‌তে সেদিন ঔরঙ্গজেব। যে দক্ষিণ ভারত থেকে আসাদ খাঁ হুঁকো নিয়ে এসেছিলেন, সেই দক্ষিণে ভারতসম্রাটের চরম বিপর্যয়। পালা বদলের দিন আসন্ন। কোথায় যে নতুন যুগ আসবে কেউই জানেন না। সাম্রাজ্যলক্ষ্মী মুঘল অন্তঃপুর ছেড়ে যে বাঙলা দেশে একটি অখ্যাত গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছেন, স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও সে খবর জানতেন না। সেদিন কুঠিয়াল ইংরাজ বণিকদের বড় দুঃসময়। কুকুরের মতন তারা মার খাচ্ছে। আর তাড়া খাচ্ছে প্রতি দরজায় দরজায়।

নব্বই সালের আগষ্ট মাস। চব্বিশে আগষ্ট। সেদিন কী বৃষ্টি—কী বৃষ্টি! গঙ্গায় দুকূল হানছে। হুগলীর পাট তুলে চার্নক সেদিন কলকাতায় গঙ্গাতীরে এসে নৌকো ভেড়ালেন। আজ যেখানে বৌবাজার আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়, শোনা যায় সেখানে নাকি একটি বিরাট গাছ ছিল। কেউ

বলেন বট, কেউ বলেন পিপুল। সে গাছের তলায় হাটুরে লোকেদের বিশ্রামের আস্তানা ছিল, বৈঠকখানা। সেখানে সেই, বটগাছের তলায় বৃষ্টিঝরা দিনে একটু মেজাজ আনার জন্য হুঁকোতে কলকে চড়ালেন সাহেব। তারপর ভুড়ুক ভুড়ুক করে টান দিয়ে চললেন। চার্নক জানলেন না—আড়ালে ভাগ্যলক্ষ্মী হাসলেন। লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য প্রসারিত হতে দেরি হল না। সাহেব এদিকে মৌজ করে টান দিচ্ছেন। নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ওদিকে সে মুহূর্তে স্বপ্নও দেখলেন সাহেব। সুন্দর স্বপ্ন। কোম্পানীর সুদিন আসবে।

সাহেব যদি হুঁকে-বিলাসে না নামতেন তবে হলফ করে বলা যায়, অত দ্রুত তিনি লক্ষ্মীর কৃপালাভ করতে পারতেন না। নৈব নৈব চ। কেননা, কোম্পানীর নির্দেশ ছিল চার্নক যেন চট্টগ্রামে পাড়ি দেন। আর সাহেব যদি চট্টগ্রামে পাড়ি দিতেন, তবে কলকাতা কখনই কলকাতা হত না। আর জব চার্নকের নাম তখন কে মনে রাখত? বুদ্ধির ঘরে হুঁকোর ধোঁয়া যেমন গিয়ে ঢুকল, সাহেবের মতি গেল বদলে সাহেব কলকাতাকেই বেছে নিলেন। ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। মুঘল-লক্ষ্মী ফিরিঙ্গি বণিকের নৌকায় চেপে ডগমগ হয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন।

সেই জলজঙ্গল আর খালবিল ভরা ভিজে কলকাতায় সুদিন এলো। পালতোলা নৌকোয় সাহেবরা এসে ঝাঁকে ঝাঁকে নামলেন। জলজঙ্গল পরিষ্কার হল। গঙ্গার ধার ঘেঁষে উঠল কেল্লা। উঠল পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি। লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজে আর পালকি-বেহারাদের পদভরে কলকাতার মাটি কাঁপতে থাকল।—তবে সাহেবদের সেবায় সব থেকে যাদের নাম হল, তাঁরা 'হুঁকো বরদার।' কেন না সাহেবদের মুখে মুখে হুঁকো ধরার এলেম এদেরই একমাত্র ছিল। মাইনে নগদ চার টাকা। কিন্তু তুচ্ছ মাইনের দিকে কে তাকায়? তামাম কলকাতাকে এরা স্বপ্ন দেখতে শেখালো, এ কৃতিত্ব কি কম? লাটসাহেবের প্রাসাদ থেকে টম্-ডিক-হ্যারির কুটির পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা গেল হুঁকো চর্চা। মুঘল-দিল্লীর হুঁকো বিলাস নতুন সহর কলকাতা রাতারাতি রপ্ত করে ফেলল। আর গড়গড়ার নলচে মুখে দিয়ে এঁরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকলেন।

সাহেবরা যখন বে-পরোয়া হয়ে হুঁকো-বিহারে নামলেন, তাঁদের ঘরণীরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন? হুঁকো-বরদারেরা লম্বা সেলাম

করে তাঁদের দিকে এগিয়ে দিত ধূমান্বিত আলবোলা। সে ধূমান্বিত হুঁকোতে টান দিয়ে মেম সাহেবদের অবস্থা শাহজাদীদের মতই হল। এ বিলাসে তাঁরা এমনই মগ্ন হয়ে গেলেন যে, মুহূর্তের বিরহ তাঁদের সহ্য হয় না।

সাহেব-মেমেরা যেখানে যান, সঙ্গে সঙ্গে একটি বাহিনী তাঁদের আগে আগে যায়। সাহেবরা চললেন থিয়েটারে। সেই থিয়েটারে চলল হুঁকো-বরদারের দল! আলবোলা বাহিনী। —থিয়েটার ঘর তামাকের গন্ধে মৌ মৌ করতে থাকে। বলনাচ থেকে আরম্ভ করে লাটপ্রাসাদের কনসার্ট পর্যন্ত সর্বত্রই এই কাণ্ড। হুঁকো না-গেলে সাহেবরা যেতে পারেন না। আগে হুঁকো, পরে সাহেব। —সে সতেরোশ উনআশির কথা। সেদিন কোম্পানীর কলকাতায় লাটসাহেব ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিস। মাননীয় গভর্নর দম্পতির কাছ থেকে কনসার্ট শোনা এবং সাপার খাওয়ার নিমন্ত্রণ এলো অনেক তা-বড় তা-বড় সাহেবের কাছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে অনুষ্ঠান। দু' একদিন আগে থাকতেই চিঠি আসা আরম্ভ হয়ে গেল। টম্ সাহেবও একটি চিঠি পেলেন। হেস্টিংস দম্পতি তাঁকে পেলে যে খুবই খুশি হবেন তা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করা আছে। আর তাঁর যাতে অসুবিধা না হয়, সে সে জন্য লেখা আছে—'দি কন্‌সর্ট টু বিগিন অ্যাট এইট্ ও ক্লক। মিঃ টম্ ইজ্ রিকোয়েসটেড্ টু ব্রিং নো সারভেনটস্ এক্‌সেপ্ট হিজ হুঁকো-বরদার।'—হুঁকোর সেবক ছাড়া লাট প্রাসাদে প্রবেশাধিকার মেলা ভার। কালা নেটিভরা হুঁকোর কল্যাণেই বরদার সেজে লাট প্রাসাদে ঢোকার প্রথম সুযোগ পেল।

সেকালের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত হুঁকো-তামাকের নায়কতা। সতেরোশ চুরানব্বই সালের চৌদ্দই আগস্ট ক্যালকাটা গেজেটের পাতায় যে তামাকের ফলাও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তা অম্বুরি বা বালাখানার নয়। এটি খাস ভাগলপুরী। বলা হয়েছিল—এহেন উঁচুদরের তামাক সহজ লভ্য নয়। কোয়ালিটি—একেবারে সুপিরিয়র। হাই ফ্লেভারড, টাটকা-তাজা। প্রতি মণের দাম কুড়ি সিক্কা টাকা। নমুনা নিয়ে হুঁকো বিলাসীরা দেখতে পারেন। শুধু তামাকে নয়, নানা সুগন্ধি মশলাও সেকালে পাওয়া যেত কল্কেতে সাজবার জন্য। মৃগনাভি, গোলাপ জল, কিশমিস—এগুলি সাহেব-দের তামাকে হামেশাই ব্যবহৃত হত। এইচ ম্যাক্‌কে আরেক তামাক-গন্ধ আবিষ্কার করলেন, নাম দিলেন—'এসেনস ফর্ হুঁকা'। আঠারোশ আট

সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা গেজেটে এর বিজ্ঞাপন বেরোল। হুঁকোয় রপ্ত কলকাতাবাসীর সঙ্গে এই সুগন্ধি দ্রব্যটির পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য। হুঁকো-বিহারে এটি যে চূড়ান্ত সুখ দেবে সাহেব সে নিশ্চয়তাও দিয়েছিলেন।

হুঁকো ছাড়া এ যুগটিকে ভাবাই যায় না। এ হুঁকো কেবল নেশার রাজাই নয়, আভিজাত্যের মাপকাঠিও ছিল এ যন্ত্রটি। এর চর্চা না থাকলে আভিজাত্ত সমাজে কল্কে পাওয়া যেত না। হুঁকো ও হুঁকোবরদার না থাকলে সে সাহেব আবার সাহেব না কি? সেকালে যে সাহেব বেচারির আয় মাসিক আঠারো কুড়ি পাউণ্ড ছিল, তারা সকলেই সামাজিক প্রতিষ্ঠার নমুনা হিসাবে একটি করে হুঁকো-বরদার-বাহিনী রাখতেন। কল্কেতে ফুঁ দিয়ে আগুন তাজা রাখাই ছিল এ বাহিনীর কাজ। কোম্পানীর তোপখানার বারুদ সব সময় শুকনো থাকত কি না কে জানে? কিন্তু সাহেবদের তামাক-ঘরে হুঁকো নিরুত্তাপ থাকার কেনো উপায় ছিল না। এখানে তামাক কেবল শুকনো নয়, সর্বদা জ্বলতে থাকত। হুঁকো-বরদার-বাহিনী সে জ্বলন্ত তামাক দিয়ে সাহেবদের মুখ-শুদ্ধি করাত। পোশাকে-আশাকে চলনে-চালনে এ বাহিনী সাত্যিসত্যিই সৈনিকদের মত ছিল। কেবল বন্দুকের বদলে এদের হাতে থাকত হুঁকো। হুঁকোর সেবা করে এরা ভালোই রোজগার করত। ইতিহাসে পর্যন্ত তারা নাম রেখে গেল। এ কি কম বাহাদুরি?

নামে ও বৈচিত্র্যে হুঁকোও ছিল নানান ধরনের। আলবোলা সব থেকে ছিল জনপ্রিয় এবং বহু ব্যবহৃত। আলবোলার নলকে সাহেবরা বলতেন— 'স্নেক'। সাপের মতন এ নলের নানান বর্ণ। নানা অলঙ্করণ। কারো মুখ থাকত সোনা দিয়ে বাঁধানো। কারো গায়ে থাকত মণি মুক্তোর আভরণ। ধূম-পিয়াসী সাহেব যে-চেয়ারে বসে তামাক খেতেন তার পিছনে একটি কার্পেট পাতা থাকত। সৌখীন নলটি তার ওপর থাকত বিছানো। ঘষাঘষিতে যাতে বস্তুটি নষ্ট না হয়, তারই জন্য এ সতর্কতা। খাওয়া-দাওয়ার পর আবশ্যিক হুঁকো-চর্চা ত সাহেবদের ছিলই, কেউ কেউ আবার চোপ্পর দিন হুঁকোয় ডুবে থাকতেন। কেবল সাহেবেরা নয়, তরুণী মেমসাহেবরা পর্যন্ত এ অভ্যাসে রপ্ত ছিলেন। সুন্দরী মেয়েদের এ আচরণ ভালো দেখাত না—বিসদৃশ মনে হত। এক সিভিলিয়ান সাহেব তো লজ্জার মাথা খেয়ে

ঠোঁট-কাটার মত বলেই ফেলেছিলেন—ইট ইজ ট্রু ম্যাস্কুলাইন অর্থাৎ ব্যাপারটি বড়োই পুরুষালি।—কেমন যেন মদ্দাটে মদ্দাটে।

এহ বাহ্য। বিলাসে মেয়েরা উপযুক্ত কিনা এ নিয়ে আজো হয়ত মতদ্বৈধতার সুযোগ আছে। কিন্তু হুঁকোর নিজেরই যে অসাধারণ আকর্ষণ ক্ষমতা আছে এ সত্য কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন?

সাহেবরাও পারল না। হুঁকোর প্রশস্তিতে তাঁরা আমাদের সাহিত্য-সম্রাটকেও ছাড়িয়ে গেলেন। মদের জন্য যে প্রশংসাবাণী ওরা খরচ করতে পারেন নি, শেষে হুঁকোতে তাই করলেন। লিখলেন: 'হাউ কুল অ্যাণ্ড রি ফ্রেশিং ইজ এ টোব্যাকো পাইপ টু দি নোজ অ্যাণ্ড ব্রেন! হাউ ওয়ানটন অ্যাণ্ড লাক-জুরিয়াস দি স্পোরটিভ কলাম্স অব ইট্স্ স্মোক্! হাউ লাভিংলি দে টোয়াইন ট্যোগদার হোয়েন পাফ্ড ফ্রম দি রোজি টিপ অব দি ফেয়ার অ্যাণ্ড টেপার টিউব! হাউ ইকোনমিক্যাল দি ইউজ।'—মোটকথা হুঁকো কী মনোরম! অহো, কি ক্লান্তি-হরা!

তবে ঐ মনোরম বস্তুটি কেবল পালাগানের মত বরণীয় নয় নাটকের মাতা সংঘাতময়ও। যে-সে নাটক নয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। এখানে পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অঙ্ক বদলও হয়ে থাকে। আঠারো শতকের শেষ থেকেই সহর কলকাতায় এক নতুন সমাজের উদয় হয়। সে সমাজের নাম বাবু সমাজ। এঁরা বিত্তশালী। অভিজাতও। আভিজাত্যের প্রকাশ থাকা চাই। হুঁকো নইলে প্রকাশ করবে কে?—তাই হুঁকো-বিলাস নেটিব পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। হুঁকোর তারা সাদরে গ্রহণ করলেন।—দেখতে দেখতে সহর কলকাতায় হুঁকোর তুফান এলো। ধলো-সাহেব ও কালা নেটিবদের এমন হুঁকো-বিহার কেউ কখনো দেখেনি।

তবে চাকা ঘোরে। ইতিহাসের বদল হয়। নৌকা-বিলাসের পরে মাথুর আসে। যথাসময়ে তার ছায়া দেখা গেল। মুঘল যুগের অবসানে এলো কোম্পানীর কাল। কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী ভিকটোরিয়া রাজত্ব বুঝে নিলেন। ক্লাইভ-হেস্টিংসের পর ক্যানিং-এলগিনও কলকাতায় এলেন। চাঁদপাল ঘাটে অনেক তোপ পড়ল। পুরনো কেল্লা ভেঙে নতুন কেল্লা উঠল। পাগলা হিকির কাগজ লোকে ভুলে গেল—হিন্দু পেট্রিয়ট লাটপ্রাসাদে গিয়ে ঢুকল।—হুঁকো কিন্তু তখনো চলছে। তবে দিন বদল যে আসন্ন তার ঘণ্টা সকলেই শুনতে পাচ্ছেন।

সেবার আঠারোশ ছেষট্টি। চার্লস নেফিউ অ্যাণ্ড কোম্পানীর সেদিন খুব নামডাক। হিজ একসেলেনসি ভাইসরয় এবং লেডি লরেনসের জুয়েলার হলেন এই চার্লস নেফিউ। বিখ্যাত রত্ন-ব্যবসায়ী। শুধু লাটসাহেবদের জন্য বা নেটিব রাজা-রাজড়াদের জন্যই এ কোম্পানী নানান মনোহারী সামগ্রী তৈরী করে। আর কারো জন্যেনয়। পাগড়ির গহনা বা পানদানী এ সবতো খানদানী মহলে হামেশাই বিক্রি হয়।—কোম্পানী সেবার কয়েকটি হুঁকো তৈরী করল। আকারে-অবয়বে সেগুলি রীতিমত বাদশাহী। এগারো নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে হিন্দু পেট্রিয়টের পাতায় ফলাও করে তার বিজ্ঞাপন ছাপা হল। নেটিব রাজন্যকুল ও অভিজাত বাবুসমাজ হলেন এ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য। নেটিব অ্যারিসটোক্রেসী অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা চাইল কোম্পানী। চার্লাস নেফিউ অ্যাণ্ড কোং।

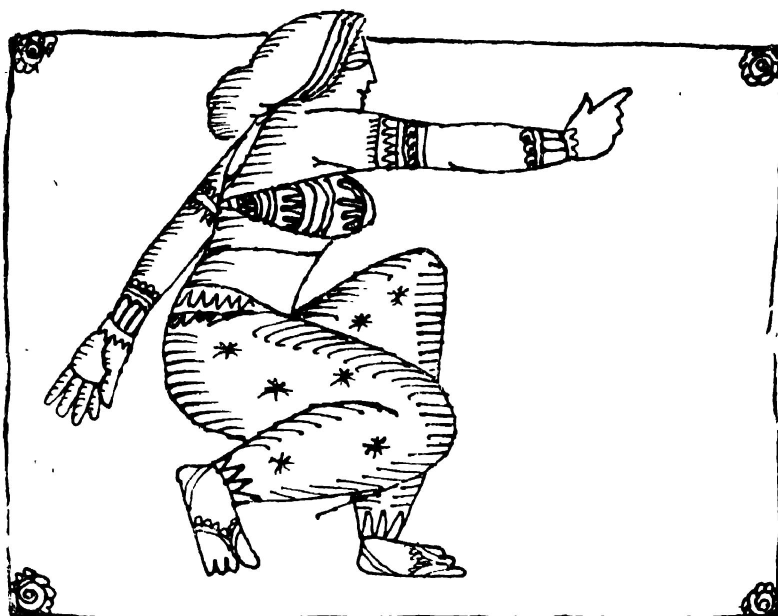
যে কালে পাঁচ টাকায় হেসে-খেলে সংসার চালানো যেত, সেকালে রুবি গ্লাস আর রুপো বাঁধানো একশ পঁয়ত্রিশ টাকা দামের হুঁকোই সব থেকে কম দামের বলে বিবেচনা করা হল। আরেকটু যা ভালো, তার দাম সাড়ে তিনশ। আর যেটি মনোহারী হালকা পোরসিলেন এবং মরকত দিয়ে মোড়া—তার দাম পাঁচশ। তবে সবটা যদি রুপো ও মরকত মণ্ডিত হয়—তার দাম তিন হাজার।—এ সবও তুচ্ছ হয়ে গেল যখন চারলস নেফিউ অ্যাণ্ড কোম্পানি তাঁদের বিজ্ঞাপনে সেই বাদশাহী হুঁকোটির কথা লিখল—

—'A magnificent solid gold Hookah set with Diamonds, Rubies and large Emaralds inlaid with flowers in small Diamonds and Rubies. This is one of the most elegant ever manufactured and the only one of the kind in India.'

—মূল্য?—মূল্য কত?—মাত্র সাড়ে পনেরো হাজার টাকা। নেকলেস, ব্রেসলেট, পেনডেনট্ এবং কর্ণাভরণ যে দাম দাবী করতে পারে না—এই বাদশাহী হুঁকো সে দাম চেয়ে বসল।

পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপনটি, নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকল। দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। নেটিব পাড়া কৌতূহলে উদ্গ্রীব।—না, এ

হুঁকো বিক্রি হয় না। দিন যে বদলাতে আরম্ভ করেছে তখনই টের পাওয়া গেল—রোম সাম্রাজ্য চিরন্তন হয়নি। মুঘল-পাঠানও কি মৌরসী পাট্টা অর্জন করতে পেরেছিল?—তাই বেচারা হুঁকো কি করে? তার জেল্লা ধীরে ধীরে নিভে গেল। চুরুট আর সিগারেট শেষপর্যন্ত এ অঘটন ঘটাল।—যাদুঘর ছাড়া হুঁকোর আর আশ্রয় রইল না।—ব্রজধামে এখন নতুন নতুন তরুণীরা এসেছে, শ্রীরাধার কথা কে মনে রাখে?



মালিনী-গোপাল কথা

সে আঠারোশ ছত্রিশ সালের কথা। নিরালা একটি দুপুর। নিঃস্তব্ধ। খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের বৈঠকখানা কিন্তু সরগরম। সেখানে যাত্রা দলের কয়েকজন লোক বসে বসে শলাপরামর্শ করছেন সেকালের বাবুদের নানান রকম খেয়াল ছিল। নানান ধরনের সখ। সেই সখ থেকে সখের যাত্রা।

পুরনো কলকাতার আরো পাঁচটা বাবুর মত বিশ্বনাথ মতিলাল ছিলেন অগাধ অর্থের অধিকারী, অঢেল ছিল তাঁর ধন ভাণ্ডার। অবশ্য সবই স্বোপার্জিত। অতি সাধারণভাবে জীবিকা অর্জনে নামেন। প্রথমে কোম্পানির নুনের গোলায় কাজ করতেন। আট টাকা মাইনে। একটু একটু করে চাকরিতে উন্নতি। ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা। তারপর দেখতে দেখতে দেওয়ানী লাভ। অল্প সময়ে প্রভূত টাকা কামালেন। নিজের পাড়াতে বিরাট একটি বাজার বসালেন। ওঁর এক ছেলের বউ সেই বাজার পেয়েছিলেন

উত্তরাধিকার সূত্রে। আর ঐ বউ-ঠাকুরানীর সঙ্গে জড়িয়ে বাজারের নাম হয় বউ বাজার। একালের কলকাতার বউ বাজারের বাসিন্দা হলেও এ কিংবদন্তী অনেকেরই হয়ত অজানা।

এহ্ বাহ্য। বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাজারের মালিক হলেও বাবু কিন্তু মোটেই ব্যাপারে মানুষ ছিলেন না। বরং ছিলেন আমুদে। সৌখীন। সেকালের রাজা-রাজড়াদের মতন গান-পাগল। সঙ্গীত প্রিয়। সখের যাত্রার তিনি ছিলেন উৎসহদাতা। তাঁর বাজারে আরেক বাবু থাকতেন। সখের যাত্রার খেয়াল ছিল তাঁর। বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল সেই বাবুকে খুব তারিফ করতেন। পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাজারের সেই বাবুর নাম হল রাধামোহন সরকার।

রাধামোহন যুবক। তাঁর উৎসাহের কোনো অভাব নেই। শোনা যায়, পুরনো দিনের কলকাতার তিনিই নাকি সখের যাত্রার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এ সখের প্রথম শিল্পী; তাই পরিশ্রমও প্রচুর। একটি একটি করে জোগাড় করছেন অভিনেতা। যাচাই করছেন এবং বাছাই করছেন। পছন্দ না হলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।—এ সবের জন্য দিনের বেলা বৈঠক বসত। চলত সলা-পরামর্শ। আর রাত্তিরে হত আখড অর্থাৎ মহড়া।

সেদিনও চলছিল সলা-পরামর্শ। বাইরে টা টা রোদ্দুর। দূর আকাশ থেকে কখনো কখনো শোনা যায় তীক্ষ্ণ চিলের ডাক। বাবুদের ছায়াঘেরা বাগান থেকে, থেকে-থেকে ভেসে আসে ক্লান্ত ঘুঘুর স্বর। মোট কথা সে এক উদাস করা দুপুর। সে দুপুরে সরগরম বৈঠকখানার বসে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। বাইরে ফেরিওলার ডাক। এক কলা-অলা সুর করে ডেকে চলেছে—চাই—চাঁপাকলা—।

বিশ্বনাথ কান পেতে ডাকটা শুনলেন। একবার নয় বারবার। রাধা-মোহনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন ব্রাদার, শুনেছো? গলায় গন্ধার আছে বলে মনে হচ্ছে!

রাধামোহন কান পাতলেন। হ্যাঁ সত্যিই তো গান্ধার খেলছে গলায়। কলা-অলার গলায় এ রাগ কে দিল!—বিশ্বনাথ ততক্ষণ ডাক দিয়েছেন দারোয়ানকে। দারোয়ান সেলাম দিল বাবুকে। বাবু আদেশ দিলেন,—যা কলা-অলাকে ধরে নিয়ে আয়।

এলো। ধরা পড়ল কলাঅলা। কাঁচুমাচু হয়ে এসে সে দাঁড়াল বাবুদের

কাছে। ঝাঁকা নামিয়ে।—পরিচয়ে জানা গেল ছেলেটি ওড়িশাবাসী। বছর কুড়ি বয়স। নাম গোপাল। ওড়িশার কটক যাজপুরে বাড়ি। বাপের নাম মুকুন্দ। জাতিতে কায়স্থ না করণ। বড়োই অভাব অনটন। কলকাতায় এসেছে রোজগারের ধান্ধায়। কিন্তু কে জানত রাখাল ছেলে রাজা হবে। চাঁপা কলার ফিরিঅলা হবে বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনী! সখের যাত্রার প্রথম সখ।

সেকালের কলকাতায় বিদ্যা ছিল। ছিল সুন্দরও। খেয়ালি বাবুদের মন ভরাতে এদের ঘটল অবৈধ সংসর্গ। ফলে, জন্ম হল বিদ্যাসুন্দর পালার। সখের যাত্রার। কেষ্ট যাত্রা বা রামযাত্রা নয়! এ হল বাবুদের বিলাস। রতি সুখ সার। রতি বিলাস। কলকাতার বাবুরা এর স্বাদ নিতেন রসিয়ে রসিয়ে। নাচে গানে আসরে আসত বসন্ত।

রঙ করা টিনের বাক্স থেকে নামত সাজগোজ। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের বাড়ির উঠোনটি সাদা চাদরে মোড়া হয়ে যেত। ঝাড় লণ্ঠনের সাদা আলোর ধারায় ধাঁধাঁ লাগত চোখে। ইংরেজি কপিবুকের ভাষায় অবশ্য এ যাত্রার পালা লেখা হত না। খাঁটি বাঙলা ভাষায় রচিত হত এর সংলাপ। এর গান। খাগড়া কলমের ডগা থেকে বেরিয়ে আসত এ ভাষা।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর একদিন এমনি করে যাত্রার আসরে এসে হাজিরা দিল। গোপাল এলো মালিনী হয়ে। রাধামোহন অবশ্য দুটি বছর গোপালকে নিয়ে মাজাঘষা করলেন। পুরো দুটি বছর। সখের যাত্রা যে সত্যিকারের শিল্প হতে পারে তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্র ভার নিলেন গোপালকে গান শেখাবার। একরাশ টাকা বাবু রাধামোহন খরচ করলেন এ বাবদে। আর তার পরিমাণ দু' চার হাজার নয়, এক লাখ। বড়ো ঘরের ছেলেরাও এলো তাঁর দলে। বিদ্যাসাগরের প্রীতিধন্য রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছেলেবেলায় তাঁর দলে নাচতেন, এ কথা কে না জানে?

গোপাল প্রথমে মাইনে পেত দশ। আর খাওয়া-পরা। তবে যেদিন থেকে সে আসরে নামল, সেদিন থেকে তার মাইনেও বেড়ে গেল।

শোভাবাজারের রাজবাড়ি ছিল সেকালের যাত্রা ও কবি গানের উৎকর্ষ বিচারের ঠাঁই—গান-বাজনায় রাজবাড়ি সদাই ভরে থাকত। রাধামোহন সেখানেই প্রথম নিয়ে গেলেন গোপালকে। গান ধরল গোপাল। এবং সে. প্রথম অভিনয়েই মাত করে দিল। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গোপালের নাম। আর তার গান।

দ্বিতীয় বার অভিনয়ের জন্য গোপালকে রাধামোহন নিয়ে গেলেন হাটখোলার দত্ত বাড়িতে। সখের ব্যাপারে এ বাড়ীর বাবুরা সেকালে ছিলেন তুলনা রহিত। পাড়ের কর্কশতায় তাঁদের বাবুআনি ব্যথিত হত বলে পাড ছিঁড়ে তাঁরা কাপড় পরতেন। সোনার থালায় ভাত খেতেন তাঁরা দু'বেলা। আর বালতি বালতি আতর ঢেলে এঁদের বাড়ি-ঘর-দোর মোছা হত। ঝি-চাকর থেকে বাড়ির টিকটিকিটি পর্যন্ত এ বাড়িতে সকলেই ছিল দু'পয়সার মানুষ। কেউ-কেউ আবার হয়ে গিয়েছিলেন টাকার কুমীর। সুতরাং সে বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দরের' আসর বসবে না তো, বসবে কোথায়?

বসল। এবং এখানেও আসর মাত হল। তৃতীয়বার রাধামোহন তাঁর সখের যাত্রাকে নিয়ে গেলেন সিমুলিয়ায়। ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ী। আর সেখানেও গোপালের জয় জয়কার।

গোপালের অভিনয় দেখে রাধামোহন ভারি খুশি, যেখানেই যান সেখানেই তাঁর দলের নাম। এক ঝটকায় গোপালের মাইনে তিনি দশ থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করে দিলেন। যেখানে যত লড়াই হয়, জিতে আসে রাধামোহনের দল। তাঁর দলের সঙ্গে টক্কর দেয় কার সাধ্য!—এইভাবে দারুণ উত্তেজনায় কাটছিল দিনগুলি। কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর।—কিন্তু হঠাৎ একটি অঘটন ঘটে গেল। অকস্মাৎ রাধামোহন মারা গেলেন। অকস্মাৎ। রাধামোহনের বয়স তখন মাত্র চল্লিশ।

ঐ অভাবিত দুর্ঘটনায় গোপাল প্রথমে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কিন্তু তার সুনাম তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল। গোপালের নাম সেদিন কলকাতা ছাড়িয়ে বাঙলার গ্রামেগঞ্জে প্রবেশ করল। সুতরাং তাকে আটকায় কে?

রাধামোহনের সখের যাত্রা মারা গেল। বিনি সুতোর মালা গাঁথা গোপালের পক্ষে তাই আর সম্ভব হল না। গোপাল দক্ষিণা নিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করল। সে নিজেই অধিকারী, আবার নিজেই অভিনেতা। বিদ্যাসুন্দরকে সে অভাবিত ভাবে জনপ্রিয় করে তুলল। আর তার জনপ্রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে আরো অনেকে এগিয়ে এলো বিদ্যাসুন্দরের পালা নিয়ে। আর বাবুরা এ গান নিয়ে কত যে মজার মজার ঘটনা ঘটালেন, তা রীতিমত রোমাঞ্চকর! "মালিনী" "গোপাল" বাবুদের বাড়ি বাড়ি সুড়ঙ্গ তৈরী করলেন। আর সে পথে গিয়ে কোনো কোনো বাবুর আসল অথচ রসাল চরিত্রটি সে বার করে নিয়ে এলো।

একবার শ্যামবাজারের এক বনেদী বাবুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা। বাড়ির মেজোবাবু পাঁচ ইয়ার নিয়ে বসেছেন যাত্রা শুনতে। আসর জমজমাট। বাবুরাও মদে চুরচুরে। বিদ্যা ও মালিনী তখন সবে আসরে উত্তেজনা সঞ্চার করেছেন। বিদ্যা গান ধরেছে —মদন আগুন জলছে দ্বিগুণ করলে কি গুণ ঐ বিদেশী —

মুঠো মুঠো প্যালা পড়তে থাকল। বছর ষোলো বয়সের দুটি ছোকরা (সেকালের অভিধায় স্টড্‌ব্রেড) সখী সেজে নাচতে থাকল ঘুরে ঘুরে। খ্যামটা নাচ। বাবুদের মজলিশে রুপোর গ্লাসে টলটল করতে থাকল লাল পানীয়। বাবুরা নেশায় ভোঁ। এদিকে পালাগান এগিয়ে চলল। মালিনীর মন্ত্রণায় সুন্দর পৌঁছল বিদার কাছে, জমল দুজনের প্রেম। তারপর ?—তারপর বিদ্যার গর্ভ চোর ধরা এবং শেষ পর্যন্ত মালিনীর ওপর আরম্ভ হয়ে গেল নিগ্রহ। মালিনীকে বেঁধে কোটাল আরম্ভ করল প্রহার। প্রহারে জর্জরিত মালিনী কাতর অনুনয় আরম্ভ করল। শেষবেশ বাবুদের দোহাই পাড়তে থাকল।—এইভাবে আসর যখন সর-গরম, বাবুর চমক ভেঙ্গে গেল। আর তারপরই চোখের ওপর দেখলেন—বাবুর দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও কোটালের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না মালিনী। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ হয়ে গেল বাবুর। কোন্ বেটার সাধ্যি আছে যে আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়, এই বলে হাঁকার ছাড়লেন। হাতের কাছেই ছিল পানপাত্র, তাগ করে ছুঁড়লেন কোটালের মাথা লক্ষ্য করে। সোজা গিয়ে গেলাস লাগল রগে। 'বাপ !' বলে কোটাল ধরশায়ী হল। না, সে বেচারি আর উঠতে পারেনি। বাবুদের আসরে কোটালের কাল হল।

ঠনঠনেতে ঘোষেদের বাড়ীতে ঠিক এরকম ঘটনা না-ঘটলেও সেখানে এক মজা হল। ঠনঠনের 'র' ঘোষ মশাই ঐ রকম মদে বেহুঁশ হয়ে যাত্রা শুনছিলেন। মদ খেয়ে প্যেঁকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিলেন এবং ঐ নাক ডাকাতে ডাকাতেই যাত্রা শুনছিলেন। গোটা রাতটা বেহোঁশ হয়েই কাটল। ভোরের দিকে ঐ দক্ষিণ মশানে কোটালের কোলাহলে বাবুর ঘুম ভাঙল। বাবুর সামনে আসর। আসরেতে কেষ্টকে না দেখে বাবু রেগে লাল। এবং কেবল হাঁকার ছাড়তে লাগলেন, 'কেষ্ট লাও, কেষ্ট লাও।' একজন অত্যন্ত বিনীতভাবে এসে বোঝাল, 'প্রভু, ধর্মাবতার ! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নেই।'—বাবু কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চান না। তাঁর রাগটা তখন ক্ষোভে

পরিণত হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে ছলনা করছেন। নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না তিনি; তাই নিরুপায় হয়ে বাবু শেষ বেশ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন।

কেবল বড়ো বড়ো বাবুরা নন, সাধারণ মানুষদেরও উপায় ছিল না বিদ্যা-মালিনীর ঐ কুহক থেকে মুক্তি পাবার। 'মদন আগুন জলছে দ্বিগুণ' —ঐ গানটি সেকালে সকল লোকের মুখে মুখে ঘুরত। সেকালের সেই আরমানি ঘাটের কথা অনেকেরই হয়ত মনে পড়ে যেতে পারে। থার্ড ক্লাস রেলওয়ে কাউণ্টার। প্যাসেনজারদের টিকিট কাটার জন্য সে কি ভিড়! রেলওয়ে চাপরাসীরা সে ভিড় ঠেকা দেবার জন্য বেত মারছে সপাসপ্। আর এদিকে কাউণ্টারের কাটা-কপাটের ওপারে বুকিং ক্লার্ক গান ধরেছে— 'মদন আগুন জলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী। খুচরো পয়সা কিছুতেই ফেরত দিচ্ছেন না বুকিং বাবু। বদলে শুনিয়ে দিচ্ছেন পরের লাইনটা— ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন—

*　　　*　　　*　　　*

বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা গোপালের আগে হয়ত ছিল। পরেও। অঠারোশ উনষাটে গোপাল মারা যায়। রাধামোহনের মত মাত্র চল্লিশে এ অঘটন ঘটে। গোপালের মৃত্যুর পরেই সে কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি। তার নাম ও গান বাঙলা দেশে সুদীর্ঘকাল বেঁচে ছিল। ছিল ব্যাপ্ত করে। আচ্ছন্ন করে। আঠারোশ আটাত্তরে তার গানের একটি সংকলন বেরোয়। বাংলা সাহিত্যে 'গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আর তার সুর নিয়ে কত লোক যে কত গান বেঁধেছিল তার ইয়ত্তা নেই। অন্যে পরে কা কথা, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এড়িয়ে যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও গোপালের সুরের মায়া লাগছে।

গোপাল হল মালিনী। সে বিনি সুতোর মালাকার। উন্নত শিল্পরুচির সঙ্গে সে লোকায়ত যাত্রাকে গেঁথে দিয়েছিল একসঙ্গে। তাই বাঙলা দেশের মানুষ তাকে কি কখনো ভুলতে পারে? গোপাল তাই চিরকাল বেঁচে থাকবে।

———

ডেপুটি রাজকতন্ত্র

হে ইংরাজ!...তুমি হর্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্তা—আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির।...হে বরদ, আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

নৈটিভ কুলের হয়ে ডেপুটিত্বের প্রার্থনায় যিনি এই ইংরাজ স্তোত্র রচনা করেছিলেন, তিনি হেঁজিপেঁজি কেউ নন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। যদিও লোকরহস্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রতিটি শব্দে সঞ্চারিত, তবু সেকালের তরুণ যুবকদের মনের কথাই যেন ইংরাজস্তুতির মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে গেছে। সাম্‌লা মাথায় দিয়ে সাহেবদের পিছনে পিছনে দৌড়ানো কি কম গৌরবের কথা! কম এলেমের পরিচয়? অন্যে পরে কা কথা, অরণ্যবাসী ঋষিরাও যদি সংসারী হতেন, তাঁরাও নির্ঘাৎ ডেপুটিগিরির প্রার্থনায় সকাল-সন্ধ্যা ইংরাজদের স্তব করতেন।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কয়েকটি বছর কেটেছিল 'ভৃত্য রাজকতন্ত্রের ছত্র ছায়ায়। ইতিহাসে দাসবংশের সময়টা যেমন দেশের পক্ষে ভালো ছিল না, মহাকবির শৈশবও তেমনি ওদের আওতায় ভালো কাটেনি। তাই তিনি ভৃত্যরাজকতন্ত্রের নিন্দাই করেছিলেন। কিন্তু শিশু রবীন্দ্রনাথ জানতেন না যে তাঁর জন্মের অনেক আগে আরেক রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁরাও দাসবংশীয়। এবং যেহেতু ইতিহাসে দাসেরাই সুলতানী। তাই মেজাজে ও কেচ্ছায় এঁরা আবার সুলতানীও ছিলেন। তবে প্রভুভক্তিতে এঁরা ছিলেন একবারে পৌরাণিক। রামচন্দ্রের অনুগত ভৃত্যের সমতুল্য।

ইতিহাসে একেকটি বংশধারার গবেষণায় পণ্ডিতদের অপার কৌতূহল। অনেক নিদ্রাহীন রাত এঁরা কাটান ঐসব রহস্য উদ্ধারে। অনেক তামাক পোড়ে। নস্য ওড়ে পিপে পিপে। ব্যয়িত হয় অনেক অবকাশ। অনেক শ্রম। কিন্তু কিমাশ্চর্যম্‌। ডেপুটি রাজকতন্ত্রের ইতিহাস উদ্ধারে অদ্যাপি একটি কাগজও খরচ হয়নি। ব্যয়িত হয়নি এক বিন্দু কালি।—গবেষকদের ঔদাসীন্য সত্যই ক্ষমাহীন।

অথচ এ রাজকতন্ত্রের মহিমা পৌরাণিক। খাঁটি প্রভুভক্তি থেকেই এ ডেপুটিবংশের উদ্ভব। স্বয়ং রামচন্দ্র এ বংশধারার প্রতিষ্ঠাতা। এবং এর পিছনের পৌরাণিক কাহিনীটি এই রকম: যুবরাজ অঙ্গদ যেদিন রক্ষোরাজের দরবারে গিয়ে ল্যাজ পাকানো আসনে বসে রাবণকে নাস্তানাবুদ করে ফিরে এলেন সে অভাবনীয় চাতুর্যে বানরমহলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। দূতের এ হেন কূটবুদ্ধি রামচন্দ্রও আশা করেননি। তাই এ সাফল্যে তাঁরও আনন্দের সীমা রইল না। অঙ্গদকে ডেকে তিনি বললেন, "যুবরাজ, বর নাও। অঙ্গদ বললেন, প্রভু এই বর দিন যেন আমার ল্যাজ পাকানো আসনটি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে। অঙ্গদের আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণ হয় রঘুরাজ তৎক্ষণাৎ সে বর দিলেন। মুখ, পেট ও ল্যাজ এই তিনটি অঙ্গে অঙ্গদ রইলেন অমর হয়ে। মুখে অমরত্ব পেলেন মূর্খ জমিদার। গোয়ালচুরির সদরআলা যাঁর উদর অজস্র উৎকোচেও সদা অপূর্ণ, তিনি অমর হলেন পেটে। আর স্বকতলার ডেপুটি-বাবুদের মহিমা বিকশিত হল লাঙ্গুলে। স্বকতলার মানে—অনুরোধ মিশ্রিত খোসামোদ। মুখে খোসামোদ এবং পিছনে একটি গোপন ল্যাজ নিয়ে কর্মস্থল কিস্কিন্ধ্যাবাদে এঁদের বংশধারার প্রতিষ্ঠা হল। সেরেস্তাদার হলেন এঁদের পরামর্শ-দাতা। এজলাসে যদি কোন আসামীকে ইনি ছ' মাসের মেয়াদ দেন, পরে সেরেস্তাদার যখন দেখিয়ে দেন যে ও অপরাধে দু মাসের বেশি মেয়াদ হয় না, তখন ছয় কেটে তিনি দুই করেন। সুতরাং এ ডেপুটিবাবুদের ব্ল্যাক স্টোন যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি হলেন সেরেস্তাদার। তাই এঁদের কলমের জোর প্রকাশিত হয় বকলমে। রিপোর্ট লিখতে হলে শরণ নেন বন্ধুদের। আর ডেপুটিবাবুর রসিকতা?—হ্যাঁ, রসিকতাতেও এঁরা অদ্বিতীয়। তবে সে রসে যদি কেউ অন্য কিছুর আভাস পান তবে নারাজ। রেপ কেসগুলি বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দী নেন বাসায় বসে।—এই হল ডেপুটি-বাবুদের চরিত্র এবং পৌরাণিক পটভূমি।

তবে গত শতকের কোন্ মাহেন্দ্র-মুহূর্তে এঁদের আবির্ভাব এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। গত শতকেই এঁদের উত্থান এবং স্বর্ণ যুগও গত শতকেই কেটে গেছে। এ শতকে সে ধারা প্রায় লুপ্ত। তাই রীতিমত গবেষণা ছাড়া সেই লুপ্ত ধারা অন্বেষণ করা কঠিন। তবু যতদূর জানা যায় রাইটাররাই ছিলেন এদের পূর্বপুরুষ। তাঁরা ছিলেন টকটকে লালমুখো। খাস বিলিতি জিনিস। চাঁদপাল ঘাটে নেমে সোজা তাঁরা উঠে আসতেন

কেল্লায়। কেল্লাতেই ছিল তাঁদের আস্তানা। টানা পাখার তলায় বসে পাখার কলমে কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাব লিখতেন। দুপুর ভোর ঘুমাতেন। সকালবেলায় লালদীঘির জলে রোদ্দুর যখন ঝলসে উঠত তখন এঁরা কাজ আরম্ভ করতেন। আর বিকেলবেলা ছিল এঁদের অখণ্ড অবকাশ। কেউ বেরোতেন শিকারে। কেউ কেউ হয়ত আরাম করে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হুঁকো খেতেন। মাঝে মাঝে হুকাবরদার এসে কলকে পালটে দিয়ে যেত। বদলে দিয়ে যেত জল। তামাকের গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠত।

এ হল আদ্যিকালের খবর। পরের যুগে ইংরেজদের রাজ্য যখন একটু একটু করে করে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, এঁরা বেরোলেন রেভিন্যু সংগ্রহে। সাহেবদের কাঁধে তুলে চারদিক কাঁপিয়ে পালকি বেহারারা চলল দেশ-দেশান্তর। ছুটল ঘোড়ার গাড়ি। ছুটল নৌকো। থ্যাকারের আঁকা জোসেফ সেডলিও কালেকটার হয়ে একদিন রওনা দিলেন জঙ্গলাকীর্ণ বগলি-ওয়ালার দেশে। ভ্যানিটি ফেয়ারে সে দেশের ঠিকানা আছে। সে দেশটি নাকি ছিল 'ফেমাস ফর স্নাইপ শুটিং'। কাদাখোঁচা পাখিশিকারে অত্যুত্তম স্থান। শুধু পাখি নয়, আকস্মিক বাঘ দেখার প্রবল উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হওয়াও সেখানে ছিল কঠিন। কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে ছিলেন জোসেফ। কর্মস্থান বাঙলা পরগণার বগলিওয়ালা. [illegible] খাজনা আদায়। বাঙলাদেশের ভূগোলে হয়ত উক্ত নামে কোনো দেশ বা জেলা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে কালেকটার জোসেফ-এর মত নির্বোধ অথচ দাম্ভিক চরিত্র সেকালে সাহেব মহলে দুর্লভ ছিল না। এঁদের অনেক গুণই অনুজ ডেপুটিবাবুরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

লর্ড করনওয়ালিস থেকে ওয়েলেসলি পর্যন্ত সকলেই দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাদা চামড়া নিয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন। পরের যুগে দেখা গেল শ্বেতহস্তী পোষার খরচ আছে। অথচ কালা নেটিভদের দিয়ে একই কাজ পাওয়া যায় অনেক কম খরচ করে। নেটিভ্স আর কোয়াইট ইকুয়াল টু ইয়োরোপিয়ান্স ইন্ ইনটেলেক্ট'। মেধায় ও কর্মপটুতায় কোনো তফাৎ নেই। তফাৎ কেবল চামড়ায় ও মাইনের। —সুতরাং প্রশ্ন উঠল, বড়ো বড়ো পদে সাদা লোকদের না হয় পাঠানো গেল, ছোট পদগুলিতে কালো নেটিভদের পাঠাতে ক্ষতি কি? এদেশে সেদিন ইংরেজি ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংরেজি পাঠশালা

থেকে যে সব নেটিভ ছাত্র বেরিয়ে এলো সাহেবী কেতায় তাঁরা কেঁউই কম যায় না। অশিক্ষিত হলেও ডেপুটির চাকরি জোটে। আর সামান্য দু' এক কলম লিখতে পড়তে জানলে, তার চাকরি রোখে কে? লর্ড হার্ডিঞ্জ এসে যেদিন শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে সরকারি কাজে নেটিভ্‌দের নিয়োগ প্রথা প্রশস্ত করে দিলেন, সেদিন বাঙালীদের দেখে কে? উদ্বাহু হয়ে তারা নৃত্য আরম্ভ করে দিল। বিরাট সভা বসল কলকাতায়। রামগোপাল বক্তৃতা করলেন। সেকালের শাসক সমাজকে এ উদারতার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানানো হল। জোসেফের মত সাহেবরা যখন জেলায় জেলায় কালেকটর বা ম্যাজিসট্রেট হয়ে দৌড়লেন, বঙ্গসন্তানেরা এঁদের পিছনে পিছনে তখন বুক ফুলিয়ে দৌড়লেন ডেপুটি হয়ে। আমরা তখন এঁদের কখনো বললাম, ডেপুটি। কখনো—হাকিম।

কে বা কারা ঐ পদ প্রথম অলঙ্কৃত করেন, যারা গবেষক তাঁরাই হয়ত এ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সমর্থ। তবে চার ডেপুটির পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওদের একজন হলেও হতে পারেন। উইলিয়াম কেরী যে কালে এদেশে আসেন, সেইরকম সময়ে জন্ম হয়েছিল যাদবচন্দ্রের। নিতান্ত তরুণ বয়সে বাড়িতে ঝগড়াঝাটি করে একদা তিনি রওনা হয়েছিলেন ওড়িশার যাজপুরে। সেখানে গিয়ে তিনি একটি চাকরিও পেয়ে যান। আর সে চাকরিটি হল নিমকির দারোগাগিরি। জর্জ উইলিয়াম রিকেটসের পুত্র স্যার হেন্‌রী রিকেট্‌স সেই সময় বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে আসেন। আঠারো শ' সাতাশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত—এই একটি যুগ তিনি ওড়িশায় ছিলেন। সাহেব খুবই গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। যাদবচন্দ্রের গুণপনায় তিনি মুগ্ধ হন। তাই নিমকির দারোগার পদ থেকে তিনি যাদবকে উন্নীত করেন ডেপুটি কালেকটারের পদে। তেতাল্লিশ সালের ৬ই নভেম্বর এই পদোন্নতি ঘটে।

তবে যোগ্য লোক এ কর্মে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হবুচন্দ্র রাজার গোবুচন্দ্র মন্ত্রী হওয়া দরকার। নতুবা বিবাদ এবং ঐ বিবাদ থেকে অশান্তি অনিবার্য। যাই হোক গোবুচন্দ্রের মহিমা যখন ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, তখন তার বেতন থেকে আকৃতি সব কথাই বলা ভালো। —সেকালে ডেপুটিদের বেতন আড়াইশ টাকায় আরম্ভ ছিল। অর্থাৎ আজকের দিনে প্রায় আড়াই হাজার টাকার সমতুল্য। সুতরাং টাকার গরম ত ছিলই। তবে সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তির গরম ছিল আরো বেশি। অযোগ্য লোকের পক্ষে ঐ বিপুল

অর্থের বেতন এবং তদনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, একেকটি ডেপুটি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিজেদের আত্মম্ভরিতায় তাঁরা সর্বদাই ছিলেন অগ্নিগর্ভ। এ বিষয়ে দেশলাই কাঠির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারো কারো চেহারা ছিল কয়লাকালো নাদুস-নুদুস। চাপকানধারী, কিন্তু বোতামশূন্য। আটচালা নিবাসী। কারো আবার ছিল একহারা চেহারা। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। একবারে সত্যি সত্যি দেশলাই কাঠির মতন দেখতে। পরে এদেশে যখন দেশলাই এলো বিলাত থেকে, তখন তার বন্দনায় কবি হেমচন্দ্র যাদের স্মরণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন ডেপুটিকুল—

নমামি বিলাতি অগ্নি দেশলাইরূপী,
দেহখানি চাঁছাছোলা, শিরে বাঁধা টুপী।

যেমন ডেপুটি বাবু একহারা চেহারা, মাথায় শালের বেড়—রাগে দেহ ভরা।

নাঃ, ঐ রাগ না থাকলে ডেপুটি হিসাবে সাহেবদের নেক্‌নজরে পড়া ছিল অসম্ভব। রাগও থাকবে এবং সেই সঙ্গে সাহেবদের প্রতি খোসামোদও থাকবে, তবেই ডেপুটি বাবুর নাম হবে। রাগের বদলে রসিকতা, এবং অন্ধ খোসামোদের পরিবর্তে একটু স্পষ্টবাদিতা থাকলেই চাকরি টুটে যাবে। অন্ততঃ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে এ রকম চাকরি যাওয়ার খবর আমরা পেয়ে থাকি।

সে বোধহয় আঠারোশ চুরাশি সালের কথা। সঞ্জীবচন্দ্র তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তবে চাকরিতে তখনো পাকা হননি। কয়েকটি পরীক্ষা বাকি। এবং সে পরীক্ষায় পাস করলেই চাকরি পাকা হয়। কিন্তু সঞ্জীবের কপালে স্বর্গীয় চাকরি নেই তাই একটি অঘটন ঘটতে দেরী হল না। —ডিস্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট সেবার পাশ হয়েছে। ফলে, টাউনের চেয়ারম্যান হয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর স্বয়ং। আর কমিশনার হিসেবে যারা যোগ্যতা পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন জজ সাহেব, এবং অন্যান্য দেশী ও সাহেব হাকিমেরা। এ সূত্রে সঞ্জীবচন্দ্রও একজন কমিশনার হলেন।

একদিন ঐ নগরসভার অধিবেশন বসল। সে অধিবেশনে আলোচ্য ছিল, রাস্তার নামকরণ। টিনের টুকরোয় রাস্তার নাম লিখে মোড়ে সেঁটে দেওয়া হবে এটাই ঠিক হল। শ' তিনেক টাকা মঞ্জুরও হল এ প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য। জজ সাহেব হঠাৎ বলে বসলেন, আরো পঁচাত্তর টাকা চাই। কেন?

কেন? সবাইকার চোখেমুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল এ জিজ্ঞাসা। জজ সাহেব তখন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। এবং সে বক্তব্যের মূলকথা হল, বাঙলা নামগুলি যেহেতু সাহেবদের বোধগম্য নয়, তাই সেগুলির ইংরেজী তর্জমা আবশ্যক। 'বৌমার গলি' বললেই চলবে না। তাকে অনুবাদ করে বলে দিতে হইবে—'ডটার-ইন-লজ লেন'।—নাঃ, জজ সাহেবের এ হেন প্রস্তাবে কেউই বিশেষ সাড়া দিলেন না। অথচ সাহেব বার বার এ কথাটাই আবৃত্তি করে চললেন।—এতক্ষণ সঞ্জীবচন্দ্র চুপচাপ বসেছিলেন। সাহেবের ঐ প্রস্তাবে' হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি উঠে গম্ভীরভাবে বললেন, পঁচাত্তরে হবে না। আমি প্রস্তাব করি, আরো তিনশো টাকা দেওয়া হোক'—জজ সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুশি হয়ে তিনি বললেন, কেন, তিনশো কেন? সঞ্জীবচন্দ্র খুব গম্ভীরভাবেই বললেন—শুধু রাস্তার নামে নয়, যাঁরা আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের নামের তর্জমাও দরকার। ধরা যাক, কালীপদ মিত্র নামে এক হাকিম আছে। এ বাঙলা নামে সে হাকিমকে সাহেবরা কি বুঝবে? একে 'ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেণ্ড' বলে তর্জমা করা দরকার।' —ডেপুটি সঞ্জীবের এ রসিকতায় সভায় হাসির রোল পড়ে গেল। জজ সাহেবের মুখ রাগে ক্ষোভে উঠল রাঙা হয়ে। টেবিল থেকে টুপিটি টেনে নিয়ে নিঃশব্দে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেসে বললেন, রসিকতা করে ভালো কাজ করলেন না সঞ্জীববাবু।—বাড়ি গিয়ে বিচারক মহাশয়কে ঠাণ্ডা করে আসুন।

সঞ্জীবচন্দ্রও দেখলেন যা তিনি করে বসেছেন তা মেরামত করা খুবই কঠিন। তবু তিনি বার তিনেক গিয়েছিলেন সাহেবের বাড়ি। দারোয়ানের হাত দিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সাহেব কোনো বারই দেখা করেননি। সপ্তাহ খানেক বাদে যখন তিনি চতুর্থবার দেখা করতে গেলেন, গিয়ে শুনলেন—সাহেব বাঙলা সরকারের সেকরেটারী হয়ে কলকাতা চলে গেছেন। আগেই বলেছি সঞ্জীবচন্দ্র তখনো চাকরিতে পাকা হননি; আর পাকা করার মালিক ছিলেন সেক্রেটারী স্বয়ং। সুতরাং তাঁর কপালে ডেপুটিগিরি টিকল না। তিনি যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও রসিকতায় একটু কমা হতেন, তবে চাকরি যাওয়া ত দূরের কথা দ্রুত পদোন্নতি তাঁর আটকাত কে? আর তিনি যদি অসৎ হতে পারতেন, তবে ত কথাই ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্র এ কর্মে ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম গুড় কি কখনো বিফল

হয়?—পেটে বোমা মারলেও তার মুখ দিয়ে 'ক'-অক্ষর বেরোত না। ঐ বিছেতেই সে পেশকারির চাকরি করে দু' হাতে টাকা রোজগার করত। কিন্তু যেহেতু সে অসৎ, তাই চরিত্র সংশোধনের জন্য ডেপুটি পদে উন্নীত করা হয়েছিল তাকে। চারিদিকে রটে গিয়েছিল যে মুচিরামের উচ্চপদ হয়েছে। আর ঐ উচ্চপদ কথাটি শুনে একজন বুড়ো মুহুরি বলে উঠেছিল, 'কি ঠ্যাং উচু করেছেন না কি? ভাগাড়ে দিয়া আইবা।' যদিও আড়াইশো টাকার বাঁধা বেতন মুচিরামের পক্ষে ভাগাড়ই হয়েছিল। তবু রক্ষা এই যে, মুহুরির ঐ রসিকতা মুচিরামের কানে যায়নি। গেলে সঞ্জীবচন্দ্রের মত সে বেচারির চাকরিটিও নির্ঘাৎ ছুটে যেত। কেননা, ডেপুটিবাবুদের রাগ এদের ওপর দিয়েই বেশিরভাগ প্রকাশ পেত। আত্মম্ভরিতা প্রকাশের এমন নরম ঠাঁই আর কোথায় পাওয়া যাবে?

তবে ডেপুটিবাবুদের বিছাবুদ্ধির দৌড় যে কি রকম ছিল সে সব কথা না তোলাই ভালো। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের চিহ্নিত করেছেন কুষ্মাণ্ড বলে। এবং ঐ উপমার সমর্থনে তিনি লিখেছেন—'যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবে ইহারা উচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।' সেকালের বেশির ভাগ ডেপুটি সত্যি সত্যিই রূপে ও গুণে উভয় দিকেই কুষ্মাণ্ড ছিলেন। এবং এদের সম্পর্কে নানা রসাল গল্প সেকালে প্রচলিত ছিল। একটি এই রকম:

একদা এক তৃতীয় শ্রেণীর মুনসেফবাবুর কাছে ছোটলাটের দপ্তর থেকে একটি চিঠি এসে হাজির। সে চিঠিতে লেখা ছিল—'দি লেফটেনাণ্ট গভরনর হ্যাজ বিন প্লিজ্‌ড টু অ্যালাউ ইউ টু ডিসচার্জ দি ফাংশন্‌স অব এ মুনসিফ অব দি সেকেণ্ড গ্রেড।' মুনসেফবাবুর পেটে এমন বিছে ছিল না যে এর অর্থ উদ্ধার করতে পারেন। হাকিমবাবু তাই অগত্যা সেরেস্তাদারের শরণ নিলেন। সেরেস্তাদারের ইংরাজী জ্ঞানও হাকিমবাবুর থেকে খুব একটা বেশি ছিল না। তবু দু একটি শব্দের সঙ্গে তার দৈনন্দিন পরিচয় ছিল। এবং সে শব্দ দুটি হল— ডিক্রি ও ডিসচারজ। এখানে ঐ ডিসচারজ শব্দটিকে সে কোর্টের অভিধায় ব্যাখা করল। মুনসেফকে ডেকে বলল: 'হাকিমবাবু, আপনার চাকরি খারিজ হয়ে গেছে।' হাকিমবাবু আশা করছিলেন যে তার পদোন্নতি ঘটবে। কিন্তু কোথায় পদোন্নতি! পরিবর্তে পদচ্যুতি? নাঃ, হাকিমবাবুর ঐ ব্যাখা পছন্দ হল না। পত্রটির অর্থ উদ্ধারে এবার তিনি

একজন ডেপুটিবাবুর শরণ নিলেন। ডেপুটিবাবু খোসামুদিতে খুবই ছিলেন পটু, তাই 'প্লিজ' শব্দটির অর্থ তিনি বেশ ভালো ভাবেই বুঝতেন। সাহেবদের প্লিজ করার জন্য তাঁর তৎপরতা ছিল অপরিসীম। সেরেস্তাদারের দেওয়া অর্থটিকেই তিনি বহাল রাখলেন। তবে সম্প্রসারিত করে বললেন, ছোটলাট তোমার চাকরিটা খেয়েছেন বটে, কিন্তু খুব খুশি হয়ে খেয়েছেন।'

এ আবার কি কথা! খুশি হয়ে কখনো কেউ চাকরি খায় নাকি? মুনসেফ বেচারি তখন নিরুপায় হয়ে ওপর থেকে ঐ চিঠির ব্যাখা চেয়ে পাঠালেন। এবং ভাগ্যিস তিনি ওপর থেকে ঐ ব্যাখা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাই সেযাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন! নতুবা চাকরির শোকে তাঁর মৃত্যু ছিল অবধারিত।

হাকিমবাবু ও ডেপুটিবাবু ছিলেন একই শ্রেণীর। ডেপুটিকে হাকিম বলার রীতিও সেকালে চলন ছিল। 'সধবার একাদশী'তে ঘটিরাম ডেপুটিকে সবাই হাকিম বলেই জানত। এঁরা ইংরাজীতে তেমন দড় হোন বা না-হোন, ইংরেজদের প্রতি এঁরা অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সর্বদাই এঁরা সাহেবদের অনুকরণ করতেন। প্রভুভক্তির এমন চরম পরাকাষ্ঠা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাদা চামড়ার প্রভুরা এই ডেপুটিকুলকে কি তেমন চোখে দেখতেন? প্রয়োজনমত এক আধটা প্রমোশন অথবা এক টুকরো খেতাব-খিলাত তাঁরা ছুঁড়ে দিতেন এদের দিকে। সাহেবদের দেওয়া সে অনুগ্রহকে মহাকলরবে মাথায় তুলে নিয়ে নাচানাচি করতেন এঁরা। এমন স্বল্পতুষ্ট প্রাণী সত্যই কম দেখা যেত।

গত শতকের শেষের দিকে স্বয়ং যুবরাজ এসেছিলেন কলকাতায়। যাঁরা অনুগত ছিলেন, রাজভক্তি দেখানোর এমন সুযোগ পেয়ে বর্তে গেলেন। ডেপুটিদের চিত্তও নেচে উঠল। ডেপুটিগৃহিণীরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ঘুঁটের ঢিবি দেখে যিনি পর্বত বলে ভ্রম করেন, পয়সা নয়, টাকা নয় মফঃস্বলে যিনি খাঁটি গিনি সোনা, মাস গেলে যিনি সাতশ টাকা রোজগার করেন এবং রাজার চাকরিতে যিনি বদলি হয়ে হয়ে শরীর কালি করেছেন সেই ডেপুটি বাবুরা সেদিন আশা করেছিলেন যে তাঁদের রাজানুগত্যের পুরস্কার যুবরাজ নিশ্চয় দিয়ে যাবেন। কিন্তু কে জানত কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। ভবানীপুরের বকুলতলা নিবাসী এক মুখুজ্যের পো এবং পেশায় যিনি উকিল, যুবরাজকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে সি-এস-আই খেতাবটি যখন

বাগিয়ে নিল, তখন অনুগত ডেপুটিদের চোখ ফেটে জল এলো। এ হেন উপেক্ষায় এবং মুখুজ্যে সন্তানের ঐ বাজিমাৎ দেখে ডেপুটি গৃহিণীরাও অনুযোগে ফেটে পড়লেন। সখীদের কাছে সেদিন তারা দুঃখ করে বলেছিলেন যে এর চেয়ে উকিলের স্ত্রী হওয়া অনেক ভালো ছিল।

ডেপুটির ভার্য্যা কন আমাদের 'তিনি'।
চোকিদারী কাজে পটু মফস্বলে 'গিনি'॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বলবো কিলো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি।
সাতশ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি॥
মন্দ বড় তবু এতে চোখ রাঙানি কত!
ঘুঁটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্বত॥
হতাম যদ্যপি কোন উকিলের মাগ।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ॥

এখানেই ডেপুটিদের ট্রাজেডি। সাদা চামড়া দেখলেই যারা রাজসম্মানে খাতির করেন, স্বয়ং রাজপুত্র কিন্তু এদের একটুকুও তত্ত্ব নিলেন না। এক-টুকরো খেতাবও খয়রাতি করলেন না এদের জন্য।

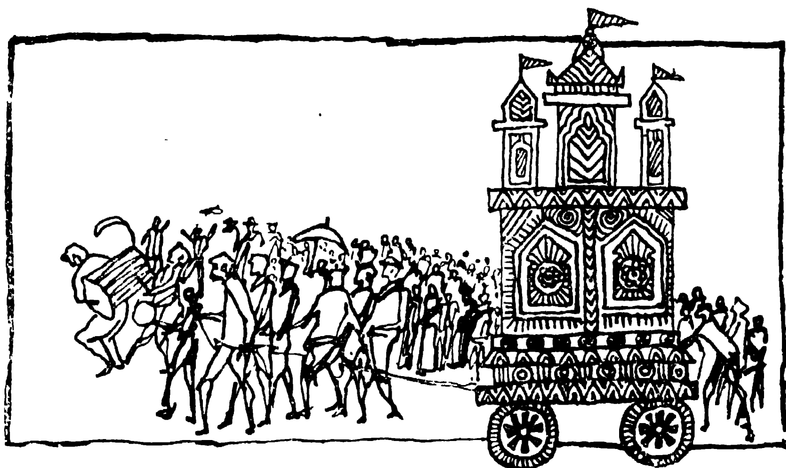
যাইহোক, সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ হলেও ডেপুটিদের চরিত্রগৌরব ও রাজানুরক্তি এতে একটুও চিড় খায়নি। তাঁরা সেইরকমই রয়ে গেলেন। সেইরকমই নির্বোধ এবং সে রকম আত্মতৃপ্ত। প্রয়োজনবোধে এঁরা ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি হন, কিন্তু হিন্দুদের মান রক্ষার জন্য ঝনাৎ করে টাকা ফেলে কালী ঠাকুরকেও আবার প্রণাম করেন। যদিও মদ খান না, কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে মদের পাত্রে আঙ্গুল ডুবিয়ে মুখে দেন। শামলা মাথায় দিয়ে আরদালিকে সঙ্গে নিয়ে বারবণিতার গৃহে যান এঁরা। বাবুর সম্বর্ধনায় সেখানকার দাসী-চাকরাণী শামলার ওপর হুকোর জল ঢেলে দেয়। —এই হল ডেপুটি চরিত্র। ইতিহাসে এঁরা অতুলনীয়, অনন্য—আবার অবহেলিতও।

ঐ অতুলনীয় এবং অনন্য চরিত্রদের দেখে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ একেবারে হতবাক। এবং ডেপুটিদের যাতে সকলে দেখতে পায়, সেজন্য সে একটি প্রস্তাবও রেখেছে। ডেপুটি সমাজকে জনপ্রিয় করা ও জনতার সঙ্গে পরিচিত করার এমন উৎকট পন্থা আজকের দিনেও অভাবনীয়। নিমচাঁদের

সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটির উল্লেখে ডেপুটি রাজক তন্ত্রের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যেতে পারে।

নিমচাঁদের দেওয়া প্রস্তাবটি এই রকম :

'নিম। গড়ের মাঠে মনুমেন্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়ার করি। তার ভেতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তারপর ছাপিয়ে দিই মফঃস্বল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য জানোয়ার এসেছে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি, বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা ওমনি।' মেয়েদের ওমনি দেখানোর কারণ হল সেকালের পথেঘাটে মেয়েরা ক্বচিৎ বেরোতেন। তার ওপর ঐ পোড়া মুখ দেখার জন্য বঙ্গললনারা কি আর পয়সা খরচ করবেন?—সুতরাং নিমচাঁদ এঁদের জন্য বিনি পয়সার অবারিত ব্যবস্থাই করে দিয়ে ছিলেন।—নাঃ, এ হেন প্রস্তাবে 'সধবার একাদশী'র ঘটিরাম ডেপুটি কিন্তু এতটুকুও আপত্তি করেনি। মেয়েদের ভিড় হবে জেনে বরং সে খুশিই হয়েছিল হয়ত!



সেকালের রথযাত্রা

রথযাত্রার কথা উঠলে সেই দৃশ্যটির কথা নিশ্চয়ই চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই অজস্র লোকের সমাবেশ। সেই বাদুলে দিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায় দেশ ভেসে যাবার মতন অবস্থা। হাজার লোকের কোলাহলের উপর সেই ছোট্ট মেয়েটির তালপাতার বাঁশি বেজে চলেছে সহর্ষে। আর এক পয়সার একটি রাঙা লাঠি কিনতে না-পারার জন্য একটি ছেলের করুণ মুখচ্ছবি বর্ষাসজল এই মেলার দৃশ্য সহজেই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেননা এ বাঙলা দেশের নিজস্ব ছবি।

সারা বাঙলা দেশ জুড়েই এই রথের মেলা! আর পিছনের দিকে ফিরে গেলে ত কথাই নেই। যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং যেখানেই একটু অধিক সচ্ছলতা, সেখানেই রথযাত্রা। বাঙলা দেশে মাহেশের রথ নামকরা। এক ডাকে সবাই চেনে। সুতরাং তার কথা না-তোলাই ভালো। গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন ঠাকুরের রথ সেকালে খুবই জমকালো ছিল। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রাম এবং ময়মনসিংহ জেলার কালিগঞ্জের খ্যাতি রথের জন্যই। লালগোলার রাজবাড়িতে আজো মেলা বসে। দশ পনর দিন নয়। পাকা একটি মাস। মহিষাদলের রাজারও এ খ্যাতিতে কম যায় না।

এ প্রসঙ্গে কাঁঠাল পাড়ার রথের মেলাকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রদের রথ। বহুকাল আগে থেকেই এ রথযাত্রা চলে আসছিল। আগে ছিল কাঠের। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই সেটা পেতলের রথে রূপায়িত হয়। তমলুকের কারিগরেরা এসে ঐ নতুন সজ্জায় সাজিয়ে গেল। সেবার আঠারোশ' বাবট্টি সাল। আজ থেকে একশ বছর আগেকার কথা।

সেই পুরনো দিনে রথ উপলক্ষে যে জাঁকজমক হত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সুন্দরভাবে ধরে রেখে দিয়েছেন। এবং তাঁর বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেকালের রথযাত্রার চিত্রটি জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রী মহাশয়ের দেওয়া বর্ণনাটি এই রকম: 'রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের। বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষেমেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়। প্রচুর পাকা কাঁঠাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা, পাঁপর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটর ভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে ভাজা যথেষ্ট থাকে।'

শুধু তেলেভাজার দোকান নয়, মণিহারী দোকানেরও মণিহারী বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। একালের মত সেকালে অবশ্য প্লাস্টিক জাতীয় খেলনা ছিল না। তবে খেলনার ধরন প্রায় একই। নানারকম বাঁশি, কাগজের পুতুল, কাঠির ওপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ প্রচুর পাওয়া যেত। ছেলেদের জন্য ছিল এই খেলনা, আর বুড়োদের জন্য ছিল নানারকম গাছের চারা এবং কলম। গোলাপজাম, পিচ, সবেদা, ফলসার চারা গাছের সঙ্গে আম-লিচুর কলম অথবা লকেট ফলের গাছ হামেশাই মিলত। শৌখিন ক্রেতাদের জন্য গোলাপ, জুঁই, জাতি, বেল, নবমল্লিকা, কামিনী, মুচুকুন্দ, বক, কুরচি, কাঞ্চন, টগর, শিউলি প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুলের চারা ও কলম থাকত সাজানো। আটদিন ধরে মেলা চলত।

মেলার সঙ্গে সঙ্গে চলত পুতুল নাচ। পুতুলের নাটক। প্রকাণ্ড একটি দোচালার ভেতর চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুতুল নাচ চারদিকে লোক জমিয়ে ফেলত। সীতার বিয়ে, লবকুশের লড়াই এবং কালীয়দমন ছিল ভক্ত শ্রোতাদের জন্য। তরুণ রসিক সমাজ যুগোপযোগী পালা দেখতেই ভাল বাসতেন। মোকদ্দমার সং সব থেকে জমত। জজ সাহেব এসে বসলেন।

পেশকার এসে কাগজ পেস করল। কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়াল আসামী। সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর জবানবন্দী হল। উকিলের বক্তৃতায় গরম হয়ে উঠল আসর। গম্ভীর মুখে জজসাহেব সব শুনলেন, ততোধিক গম্ভীর হয়ে রায় দিলেন। রায়ে আসামীর ফাঁসীর আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি এসে গেল ফাঁসীর মঞ্চ। আসামীকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর নাটক সমাপ্ত।

এ কেবল কাঁঠালপাড়ার রথযাত্রা নয়, সারা বাঙলা দেশেই রথের নাটক এভাবেই অভিনীত হত।

শহর কলকাতাতেও রথযাত্রা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত। তবে তার ঐতিহ্য যে কতদিনের তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। শহর কলকাতার আদি বাসিন্দা ছিল বসাক ও শেঠেরা। শোনা যায় তাঁরা নাকি পূর্বে বাস করতেন সপ্তগ্রামে। সেখানে যখন ব্যবসার অবস্থা মন্দা হয়ে এলো, তখন সুতানুটি-গোবিন্দপুরে এসে নতুন হাট বসালেন। এদিকে সাবর্ণ চৌধুরীদেরও বাড়-বাড়ন্ত হল। শেঠেদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর খুব নাম ডাক ছিল। ঘটা করে পূজো হত। চৌধুরীদেরও ছিল শ্যাম রায়। দোলের সময় শ্যাম রায়ের পূজায় এত আবির খেলা হত যে পুকুরের জল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠত। লাল হয়ে উঠত পথ। লালদীঘি বা লালবাজারের নামকরণের পিছনে সে ইতিহাস নাকি লুকিয়ে আছে।

যাইহোক এহেন গোবিন্দজী বা শ্যাম রায়ের রথযাত্রা ছিল না, তাও কি কখনো সম্ভব? শ্যাম রায়ের কথা বলিতে পারি না, তবে গোবিন্দজীর রথ ছিল। বৈঠকখানা বাজারে এসে জব চার্নক কোন্ গাছের তলায় বসে হুঁকো খেয়েছিলেন, ঐতিহাসিকেরা হয়ত সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন। তবে আজ যেখানে শিয়ালদা স্টেশন, ওখানে নাকি বিরাট একটি বট গাছ ছিল। ঐতিহাসিক বৃক্ষ। ১৬৯০ সালের চব্বিশে আগস্ট চার্নক সাহেব যখন এখানে এসেছিলেন, তখন রথযাত্রা শেষ হয়ে গেছে। সেই বটতলাতেই সম্ভবত শেঠেদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর রথ বাঁধা ছিল। বিরাট রথ। সাততলা সমান উঁচু। লালদীঘি থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত সোজা রাস্তায় এ রথ টানা হত। আর তদুপলক্ষে রাস্তার দু'ধারে যে বিরাট মেলা বসত, এ অনুমান আমরা নিশ্চয় করতে পারি। সে বছর নয়, পরের বছর চার্নকও সে দৃশ্য দেখে থাকতে পারেন।

পরের যুগের কলকাতায় আরো অনেক রথের ঠিকানা মেলে। পোস্তায়

যে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর তিন-তিনখানি রথ ছিল। গরাণহাটায় লালাবাবুর বাড়ির উঠোনে সারা বছর সে রথগুলি রেখে দেওয়া হত। রানী রাসমণির শ্বশুর ছিলেন প্রীতিরাম মাড়। কাঠ নয়, পেতল নয়—এই মাড়দের ছিল রূপোর রথ। সেই রূপোর রথের শোভাযাত্রা দেখার জন্ত সেকালে পথে কম ভিড় হত না। জন কোম্পানির বাঙালী কর্মচারী নন্দরাম সেন পুরনো কলকাতার এক বিখ্যাত মানুষ। 'নন্দরামের ছড়ি' আজো প্রবাদের মত প্রচলিত। সেই নন্দরাম একদা নাকি স্থতানুটির গঙ্গাতীরে একটি ঘাট বানিয়ে দিয়েছিলেন; সেই ঘাট পরবর্তীকালে রথতলার ঘাট বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। সম্ভবত রথের মেলাই এহেন নামকরণের পিছনে বর্তমান। এইভাবে সামান্ত একটু অন্বেষণ করলেই দেখা যাবে শহর কলকাতার রথের ঐতিহ্যও কম নয়।

যেখান দিয়ে সেদিন রথ যেত, সেই পথের দুধারে লোক জমে যেত কাতারে কাতারে। ছোট ছোট ছেলেরা এ উৎসব উপলক্ষে পরত সেপাই-পেড়ে ঢাকাই ধুতি। বার্নিস করা চকচকে জুতো। হয়ত বিলিতি সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াত। কোমরে বাঁধত রুমাল। তারপর চাকরাণীদের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত। রাস্তার ধারে দোকানীরা বসে থাকত পসরা সাজিয়ে। কেনাবেচাও মন্দ হত না। ফলের ভেতর কাঁঠাল এবং খেলনার ভেতর মাটির জগন্নাথ, তালপাতার ভেঁপু এবং সোলার পাখি বিক্রি হত বেধড়ক। তালপাতার পাখাও বিক্রি হত কম নয়। ভেঁপুর শব্দে মুখর হয়ে উঠত মেলাতলা। বয়স্ক লোকেরা পর্যন্ত ঐ ভেঁপু কেনার লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। ফলত হুতোমের ভাষায় বলা চলে—'ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিনসেরাও তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছেন।'

এইভাবে যখন মেলাতলা সরগরম, এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসত ঘণ্টাধ্বনি। হরিবোল এবং খোল-কত্তালের সঙ্গে জনতার সহর্ষ কোলাহল। এরপরই হত রথের আবির্ভাব।

'রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ীর কবি; তারপর বৈরাগীদের দু'তিনজন নিমখাসা কেত্তন তার পেছনে সকের সংকীর্তন গাওনা; দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আটচালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে আশেপাশে কর্মকর্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদঘর্ম—কেউ নিশান রেশ্যালার মিলে ব্যতিব্যস্ত কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্তন-

ওয়ালারা গোছসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথার ও চকের সামনে থেমে থেমে গান করে যাচ্ছেন—

নাঃ, এই অপূর্ব দৃশ্য না-দেখে কেউ ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। গম্ভীর মানুষও সম্ভবত এ-হেন দৃশ্যে একটু হাল্‌কা হয়ে পড়তেন। আর যাঁরা উৎসব পালন উপলক্ষে দু' এক পাত্র চড়িয়েছেন তাঁদের কথা না বলাই ভালো। তাঁরা সম্পূর্ণই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তেন। সর্বাঙ্গ পেরেকখচিত কাঠের ঘোড়া লাগানো দারুময় রথটিকে তখন একটি মাতৃপ্রতিমার মত মনে হত। অতঃপর তার মুখ দিয়ে মাতৃবন্দনার যে পদটি বেরিয়ে আসত, তা একেবারে মৌলিক।

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা,চাকা ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর মুকপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চলচে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।

শুধু রথ নয়, দেখতে দেখতে নেমে আসত সন্ধ্যা। গ্যাস জ্বালা মুটেরা দেখা দিত মই কাঁধে করে। ভিড় কমে আসত ধীরে ধীরে। দোকানীরা দোকান গুটিয়ে ফেলতেন! দর্শকেরা ফিরে যেতেন যে যার ঘরে। আগামী দিনের কোন উৎসবের জন্য তৈরী হত শহর কলকাতা।

তবে একটি কথা বলে রাখা দরকার। শহর কলকাতায় রথযাত্রার থেকে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান বেশি জমত। তার কারণ রথ উপলক্ষে বেলেল্লাপনা করার সুযোগ ছিল খুবই সামান্য। অথচ স্নানযাত্রায় এ সুযোগ অবারিত। বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে যেতেন মাহেশ। গঙ্গায় বাচ খেলা হত। স্নানযাত্রার পর রাতভোর লেগে যেত খ্যামটা ও বাইনাচ।—সেরুভ কোম্পানির মেট মিস্তিরি গুরুদাস গুঁয়ের পর্যন্ত ডানা চঞ্চল হয়ে উঠত। ইয়ার-বকসি নিয়ে সেও নেমে পড়ত ফুর্তিতে।—সুতরাং পুরনো দিনের কলকাতায় স্নানযাত্রার তুলনায় এই রথযাত্রা ছিল

নিতান্তই পানসে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্নানযাত্রার কবিতাই রচনা করেছেন, রথ উপলক্ষে তাঁরা প্রায় নীরব। এর থেকে অন্তত এ অনুমান করা যেতে পারে যে হয়ত এ রথ উপলক্ষে আপিস-কাছারিতে আদৌ ছুটী মিলত না। সওদাগরি অপিসে ত নয়ই। ফলে কামাই করলে জবাবদিহি করতে হত। আর সে জবাবদিহি যদি সাহেবের কাছে করতে হত, তাহলে ইংরেজি না-জানা নেটিবের পক্ষে বোধ করি তা জরিমানার থেকেও বিপদজনক হয়ে উঠত। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর একটি খোস গল্প উদ্ধার করে আমাদের রথের কথা শেষ করা যেতে পারে। এতে রথ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা রীতিমত কৌতুকপ্রদ।—

একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল কেন আইস নাই?' সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, চার্চ'। রথের আকার গির্জার মত তাই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চার্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণে বলা হইল, 'উ:ডন চার্চ' অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—'থ্রি স্টারিস, হাই'। (Three stories high). 'গাড অলমাইটি সিট অপন' (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথদেব বসিয়া আছেন, 'লাং লাং রোপ' (Long long rope). 'থৌজেণ্ড মেন ক্যাচ' (Thousand men catch) 'পূল পূল পূল' (Pull, Pull, Pull) 'রনাওয়ে রনাওয়ে' (Run away, run away), 'হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।'

রথের এহেন ছবি সত্যিই দুর্লভ। তবে এ সদুঃসাধ্য সাধন করে সরকার মশাই সাহেবের কাছ থেকে ছুটি আদায় করত পেরেছিলেন কিনা' রাজনারায়ণ বসু সে খবরটি আমাদের জানাননি।



প্যালানাথবাবু ও পুজোর আমোদ

ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে যেমন কল্পনা করা যায় না 'হ্যামলেট' অভিনয়ের কথা, ঠিক সেরকম হল সেকালের পুজোর আমোদ, যা প্যালানাথ-বাবুকে বাদ দিয়ে ভাবাই কঠিন। সেকালের বারো-ইয়ারের পয়লা নম্বর ইয়ার হলেন প্যালানাথবাবু।

প্যালানাথের কলকাতায় পুজো মানেই আমোদ। বেহদ্দ ফুর্তি। ঢাকের বাজনায় আর কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজে উদ্দাম হয়ে উঠত শহর। ঢুলীরা কাঠির ডগায় বোল তুলত, 'গীজা গীজা গীজা—গীজা'—সঙ্গে সঙ্গে ট্যামটেমিতে সঙ্গত বাজত—'নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্—নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্'—। এ জাতীয় নানা ধরনের বিচিত্র বাদ্য ও ঢক্কা-নিনাদে পুজোর সকাল হয়ে উঠত সরগরম। পথে বেরোলে ও পুজোর দালান পর্যন্ত যেতে পারলে কত যে রকমারী মজার জিনিস চোখে পড়ত, তা দু'চার কথায় বিবৃত করা কঠিন। কোথাও দেখা যেত রেজিমেনটকে-রেজিমেনট পাঁঠা চলেছে প্যারেড করতে করতে। দেখা

যেত ন্যায়লঙ্কারমশাই বাবুদের পুজামণ্ডপে বসে বসে অনবরত নস্য নিচ্ছেন এবং নাক থেকে গড়িয়ে পড়া রঙ্গিন কফজলে জাজিম করে তুলছেন রঞ্জিত। কলা বউয়ের স্নান করতে যাওয়ার দৃশ্যটি বোধহয় সব থেকে ছিল মনোরম। কেন না, এমন অভিনব দৃশ্য কচিৎ দৃষ্ট হত। আগে চলত কাড়া-নাকাড়া এবং ঢোল ও সানাইদারদের বাজনা। তার পিছনে নতুন কাপড়-পরা এবং আশা সোঁটাধারী বাড়ির দারোয়ানের দল। এর পরে কলাবউ কোলে পুরোহিত, হাতেপুঁথি তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য বামুন ইত্যাদি। আর একেবারে শেষে চলেছেন যিনি, তিনি হলেন স-পারিষদ বাবু। বাবুর মাথায় রূপোর রামছাতা। আর এ ছাতায় যে কাপড় লাগানো থাকত, তা হল সাটিন। এবং তার রঙ যেমন-তেমন নয়, ঘোর লাল।

বলিদানের বৈচিত্র্য ছিল। কোথাও বলিদান দেওয়া হত জোড়া-মোষ, আবার কোথাও বা নব্বুইটা পাঁঠা। সেকালে মাগুড় মাছ বলি দেওয়ারও চল ছিল। এ ছাড়া যা বলি দেওয়া হত, তার ভেতর আখ-কুমড়ো ত ছিলই, কখনো বা' সুপুরি বা মরিচ বলিও দেওয়া হত।

এহ বাহ্য। আমোদ এখানে নয়। আমোদ ছিল সেকালের নানা ধরনের সঙে এবং হাফ আখড়াই পাঁচালি-যাত্রা এবং চোহেল ফররায়। আর এ সঙ্গে বাই খ্যামটা ও কীর্ত্তন-কবিগান যদি যুক্ত হত, তবে আমোদ ভরে উঠত কানায় কানায়। বাবুরা অনেকদিন আগে থাকতেই এ আনন্দ-উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য উদ্যোগ আয়োজনে বৃত হতেন। প্রতিমা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হত সঙ্‌ও। ইয়ারবাবুরা নানানরকমের নমুনা যোগাড় করতেন। কুমোরদের কাছে পেশ করা হত সে সব নমুনা এবং তদনুসারেই সে বছরের সঙ্‌ হত। এবং হত রঙ তামাসাও।

পুজোর কাছে মজলিশের জন্য সব থেকে মনোরম করে যা তৈরী করা হত, তা হল পুজোর আসর। এ আসর তৈরীর জন্য মাল-মশলা সব আসত সেকালের ফৌজদারী বালাখানা থেকে। ঐ ফৌজদারী বালাখানায়, নাম দেখেই বোঝা যায়, এক সময় থাকতেন মুঘল ফৌজদার। সুতরাং বাদশাহী ঐশ্বর্যের কিছু অবশেষ ছিল ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেই-ছড়ানো ছিটানো ঐশ্বর্য থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে সাজানো হত মজলিশের আসর। ওখান থেকে ভাড়া করে আনা হত গোটা কুড়ি বেল-লণ্ঠন বা ঝাড় লণ্ঠন। ওগুলিকে সাজানো হত একটি একটি করে। মজলিশের জায়গাটি একটু উঁচুতে হত,

বসবার পক্ষে আরামদায়ক করার জন্ত প্রথমে বিছিয়ে দেওয়া হত। খড়। ঐ খড়ের ওপর থাকত দরমা। আর দরমার ওপর ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকত মাদ্রাজী খেরোর জাজিম। এ জাজিমে বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বাবুরা কখনো বাই-খ্যামটার নাচ দেখতেন, আবার কখনো বা পুজো।

প্যালানাথবাবু এরকম এক বারোইয়ারি পুজোর মাথা ছিলেন। তাই ইয়ারমহলে তাঁকে গণ্য করা হত 'মাতালো' বাবু বলে। এ প্যালানাথের প্রধান ইয়ার বলে আশেপাশে যাঁদের আমরা দেখতে পেতাম, তাঁরাও 'মাতালো' হিসাবে বিবেচিত হতে পারতেন।

বাবু প্যালানাথ ছিলেন একহারা বেঁটে-খাটো মানুষ। সাকিন ছিল তাঁর চকবাজার। যদিও উপবাসে তিনি অনেক সময় হিন্দুয়ানী পালন করতেন কিন্তু মনে-প্রাণে যা অনুকরণ করতে ভালো বাসতেন তা হল, নবাবী জাঁকজমক আর আমিরী মেজাজ। তাই চূড়ান্ত করতেন তিনি শৌখিনতার। লখনৌ ফ্যাশনে তিনি পরতেন চুড়িদার পায়জামা এবং রাম জামা। দোপাটা বাঁধতেন কোমরে। আর মাথায় টুপি আঁটতেন হেলিয়ে। এসব কারণে বাই আর খ্যামটা মহলে বাবুর ছিল ভারি মান। লখনৌ-এর ইরানীকুলে ছিল বেজায় আদর।—বারোশ উনিশ সংবতে তিনি সাবরবন্ সাহেবের পাঠশালায় যদিও মাস তিনেক ইংরেজির পাঠ নিয়েছিলেন, তথাপি ইংরেজি কেতায় ছিল তাঁর অপছন্দ। জীবিকার জন্ত তিনি কেবল দু-চারটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন। ব্যস্, আবার কি!

হাটখোলার গদি, দশ-বারোটা খন্দমালের আড়ত আর বেলঘাটার পাঁচখানি চুনের গোলা নিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে যিনি আরামে জীবন কাটাতেন, সেই বীরকৃষ্ণ, ওসব ইংরেজি কথারও খুব একটা ধার ধারতেন না। নগদ দশ-বারো লাখ টাকা তিনি খাটাতেন দাদনে আর চোটায়। বিষয়কর্ম তিনি কিছুই দেখতেন না। কিস্সু না। কানাইধন দত্ত ছিল তাঁর ম্যানেজার। ঐ লোকটিই দেখাশোনা করত তাঁর সব। আর বীরকৃষ্ণ? তিনি কি করতেন?—টানাপাখার বাতাস খেয়ে, বগী চড়ে আর এস্রাজ বাজিয়েই কাটাতেন তিনি কাল। একটি লাল ওয়েলার টেনে নিয়ে যেত তাঁর গাড়ি, আর তাঁকে খুশি খুশি রাখত ছুটি মো-সাহেব। অনেক মধুর রাত উতরোল হয়ে উঠত তাঁর গঙ্গাপারের বাগানবাড়িতে এবং ছয় দাঁড়ের ভাউল নৌকায়!

দত্তমশাই কিন্তু একটু আলাদা ধরণের ছিলেন। দেড় হাত উঁচু গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালোবাসতেন তিনি আদুর গায়ে। খুশি থাকতেন বেকার-উমেদার-মো-সাহেবে সদা পরিবৃত থাকলে। প্যালানাথবাবুর বারোইয়ারী পুজোয় এক কথায় তিনি দান করতেন হাজার টাকা।—আর মুখুজ্যেদের ছোটবাবু? সেই ডিগডিগে চেহারার লোকটি? আধহাত চ্যাটালো কালাপেড়ে কাপড় অথবা চক্রবেড়ের লালধুতি ছাড়া যিনি অন্ত পরিধেয় অঙ্গে ঠেকাতেন না, গলায় যাঁর থাকত এক গোছা মোটা ও সাদা পইতে, আর দাঁতে থাকত মিশি, সেই ছোট কর্তার সঙ্গে কারো তুলনা হয়? এক জালা তাড়ি লাগত তার সারা দিনে। এইসঙ্গে লাগত দেড়শ ছিলিম গাঁজা আর ভরি দেড়েকের মতন আফিম। পুজোআচ্চা, পাল-পার্বণ আর শনিবারের বারবেলা হলে এ মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে দিত।

তুলো আর পিসগুড্রের দালালি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছিলেন যে পচ্চুবাবু, তিনি ছিলেন নিজের টাকার মতনই বিপুল। একেহারে দশমনী তেলের কুপো। ঐ কুপো সদৃশ দেহটিকে তিনি মুড়ে রাখতেন কিংখাপ ও জরির পোশাকে। শেকলের মত মোটা সোনার চেন ঝুলত গলায়। দু'হাতের আঙুলে থাকত গোটা আঠারো করে ছত্রিশটি আঙটি।—এই সব বাবুদের সঙ্গে আরেকবাবু যিনি ছিলেন তিনি হলেন রাজবাহাদুর। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী আর পায়ে এ রাজামশাই পরতেন জরির লপেটা জুতো।

প্যালানাথবাবু থেকে পচ্চুবাবু পর্যন্ত যে রোমহর্ষক বাবুচিত্রগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম, এঁদের আয়োজিত পুজোও ছিল এঁদের মতনই বিচিত্রতর। সঙ্ এবং বাইয়ের এঁরা যে র‍্যালা দেখাতেন, তাতে সাধারণ দর্শকদের চোখ উটত কপালে। কেউ কেউ অবশ্য আবার সঙ্ আর বাইফেলে অপরূপ কোনো জিনিস দেখছে এরকম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকত ঐ বাবুদের দিকে। রাজা বাহাদুরের দিকে।

প্রথম পুজোর দিন থেকেই দেখা দিত চূড়ান্ত আড়ম্বর। বড়ো বড়ো তিনটি মোষ বলি হয়ে যেত অনায়াসে। ভেড়া পড়ত পুরো একশ। পাঁঠা তিনশ। মূল নৈবেদ্যের মাথায় যে মণ্ডাটি সাজানো হত তার আকার হত বিশাল। ওজনেও বিপুল। প্রায় দেড় মন। শহরের প্রধান প্রধান বাবুরা সকলেই এক ফাঁকে ঘুরে যেতেন। প্রণাম করে যেতেন মাকে। আসতেন

রাজারা। এঁদের বাড়ির ব্রাহ্মণরাও আসতেন। তবে প্রতিমাকে প্রণাম করতে নয়, বিদায় নিতে। ফোঁটা, চেলির জোড়, তিলকধারী এবং টিকি ও তকমাওয়ালাদের ভিড় লেগে যেত।

সন্ধ্যার পর আরম্ভ হত হাফ-আখড়াই। হাফ-আখড়াইয়ে জমত কবির লড়াই। আগেকার দিনের রাজা-রাজড়ারা যেমন সভায় কবি রাখতেন, নতুন কলকাতার নব্য বাবুরা তেমনি পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন আখড়াই ও হাফ-আখড়াই গানের। শ্যামবাজার, চকবাজার মায় জোড়াসাঁকোর নিষ্কর্মা বাবুরা সময় কাটাতেন এই গানের দল খুলে। আমাদের নায়ক প্যালানাথ বাবুরও একাকণে একটি দল দেখা যেত।

প্রথম পুজোর রাত্তির তাই রাখা হত এই কবির লড়াইয়ের জন্য। সে দৃশ্য দেখার জন্য স্কুলের ছেলে থেকে বাহাত্তর বছরের বুড়োরা পর্যন্ত আসত অধীর আগ্রহে। দেখা যেত কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ, ডুরে উড়নির সঙ্গে ক্রেপ্ ও নেটের চাদরের আশ্চর্য সমাবেশ। ধোপা পাড়ার দলের সঙ্গে চক বাজারের লড়াইটি জমত ভালো। তবে শেষ পর্যন্ত ছুটত কাঁচা খেউড়। এবং যখন পালা শেষ হত, ওদিকে ফুরিয়ে আসত রাতও। মুখুজ্যেদের ছোট কর্তা এতই নেশা করতেন সেরাতে যে অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁকে তোলা যেত না।

পরের রাতে হত পাঁচালি আর যাত্রা। রাত দশটার আগে আরম্ভ হত না উৎসব। কেননা, আগের রাতের পরিশ্রম ও জাগরণে সকলেই থাকতেন ক্লান্ত। কারো থাকত মাথা ধরে, আর কোরো যা দেখা দিত চোঁয়া ঢেকুর। যাই হোক, ঘোষণা অনুসারেই আরম্ভ হত অনুষ্ঠান। প্রথমে পাঁচালি ও পরে যাত্রা। যাত্রার অধিকারী আসরে দেখা দিতেন গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে এবং সঙ্গে নিয়ে। কৃষ্ণ আসরে নাচতেন খোলের সঙ্গে। আর মাঝে মাঝে নানা রকমের রঙ্-তামাসাও দেখা যেত। শোনা যেত মজার গান, যথা 'বাবা দে আমার বিয়ে' অথবা 'আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে।'

এই বাহ্য। আমোদ কানায় কানায় ভরে উঠত তৃতীয় দিনে। এদিন শেষ পুজোর আমোদ। চোহেল ও ফর্‌রার শেষ। বাই-খ্যামটার চূড়ান্ত। একেবারে শেষে কীর্তনও থাকত। আগেই বলা হয়েছে, বাই মহলে প্যালানাথ বড়োই মানী। শহরের সব মানিনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেই প্যালানাথ জলসজে

সাজে দেখা দিতেন আসরে। স্বাগত সম্ভাষণে আপ্যায়ন করতেন বাই ও খ্যামটাওয়ালীদের। বড়ো বাজারের পচ্চুবাবু গুটি গুটি দেখা দিতেন আসরে। বাইজীদের সেলাম করে জুড়ে বসতেন দু'খানি আমেরিকান চৌকি। সারঙ্গ বাজত 'কোঁয়া কোঁয়া' সুরে। বাজত তবলা। মন্দিরার ঝুমুঝুমু তালে আরম্ভ হত অনুষ্ঠান। তবল্‌চি আর সারেঙ্গীয়া সেলাম বাজিয়ে মাঝে মাঝে সুর তুলত—'পুজোর সময় পরবস্তি হী যেন—'। সঙ্গে সঙ্গে বাই এসে নাচতে আরম্ভ করত বাবুদের কাছে। এইভাবে যতই রাত বাড়তে থাকত, ততই নাচের মজলিশ রন্‌রন্‌ করে উঠত। —এসব দেখে খুশিতে আপ্লুত হয়ে উঠতেন বীরকৃষ্ণ।

বাইয়ের পর আসত খ্যামটা। মাত্রা আরো চড়া। নেশাও আরো জোরদার হয়ে উঠত। মুখুজ্যেদের ছোট কর্তা নেশায় বুঁদ হয়ে জ্ঞান হারাতেন। যাই হোক, এ রাতও ফুরোত। এবং কীর্তন দিয়েই উপসংহার টানা হত অনুষ্ঠানের। সিমলার শ্যাম কিত্তুনী ও বাগবাজারের নিস্তারিণীই তৃতীয় রাত্রির সমাপ্তি ঘোষণা করতেন।

* * *

শেষ হল বারোইয়ারি পুজো। কিন্তু ইয়ার-বাবুরা এ আমোদ কিছুতেই ছাড়তে চান না। একালের মতন সেকালেও বিসর্জন না দিয়ে প্রতিমা রাখার রেওয়াজ ছিল। বারো-ইয়ারি পুজোর প্রতিমাখানি তাই আটদিন রাখা হল। আর ঐ আটদিন পরে উদ্যোগ আরম্ভ হল বিসর্জনের। আম মোক্তার কানাই ধন পাস আনলেন পুলিশের কাছ থেকে। এলো চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক সোয়ার, নিশান ধরা ফিরিঙ্গি, আশাসোটা, ঘড়ি এবং একবারে পঞ্চাশটি ঢাক। চীৎপুরের রাস্তা দিয়ে মহা আড়ম্বরে এসব নিয়ে মা চলেন বিসর্জনে। এ অপরূপ দৃশ্য দেখবার জন্য লোক জমে গেল পথের ধারে। —যাই হোক, শেষ বেশ বিসর্জিত হলেন দেবী দুর্গা। আমুদে ছোকরারা ঢোলের সঙ্গে সঙ্গত করে নাচতে থাকল নৌকার ওপর। আর প্যালানাথ বাবুরা? তাঁরা খুব বিষণ্ণ মনেই বাড়ি ফিরলেন।

এই ছিল সেকালের পুজো। এবং পুজোর আমোদ। প্রতি বছরই হয়ত এরকম চলত, কিন্তু একবার চলল না। বারো-ইয়ারি প্রধান উদ্যোক্তা বীরকৃষ্ণ ডুবে গেলেন দেনাতে। উঠে গেল গদি ও আড়ত। আমমোক্তার কানাইধন ধরা পড়লেন জাল সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে। জেল হয়ে গেল তাঁর চোদ্দ বছর।

মুখুজ্যেদের ছোট কর্তাকে ধরল যক্ষ্মা। বিবাগী হয়ে একদা তিনি গৃহ ছাড়লেন। দত্ত মশাই বানপ্রস্থ নিলেন কাশীতে।

আর প্যালানাথবাবু? একদা বোটে করে প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন কোম-পানির বাগানে। পথে আচমকা একটি ঝড় উঠল। ভীষণ ঝড়। মাঝিরা অনেক চেষ্টা করলেন নৌকা-খানি বাঁচাতে। কিন্তু বাঁচানো গেল না! একটি চড়ার গায়ে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেল নৌকা। লাভ করল সলিল সমাধি। প্যালানাথ বাবুও নৌকার পরিণতিই লাভ করলেন। হুতোমের ভাষায়—'বাবু বড়ো মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই।'

ভক্ত ইয়ারদের মা যে এমন করে কাছে টেনে নেবেন তা কি কোনোদিন কেউ ভেবেছিলেন?—কেউ না! তবু বারো-ইয়ারি পুজো হত। এবং সারম্বরেই হত। নতুন নতুন ভক্ত আসতেন। নতুনভাবে আরাধনা করা হত মাকে। নতুন উদ্যমে। আর সে উদ্যম কোথাও কোথাও অন্য চেহারায় আজো প্রবহমান।

পুজোর সঙ্‌ ও বাবুদের রঙ্গ

বারো-ইয়ারে পুজো করছে। অথচ সঙ্‌ হবে না। একথা জানলে সেকালের ইয়ার-বাবুরা সত্যি-সত্যিই বিষম খেতেন। দোকানে দোকানে পুজোর সাজ, কাগজে কাগজে ফলাও বিজ্ঞাপন, বোনাসের দাবিতে মিছিল এবং আটখানা উপন্যাস সম্বলিত শারদীয় পত্রিকার আবির্ভাব দেখে আমরা যেমন ভাবতে থাকি—এ ছাড়া পুজো কি সম্ভব! সেকালের বাবুরাও তেমম সঙ্‌হীন বারো-ইয়ারি পুজোর কল্পনা কখনও করিতে পারতেন না।

সহর কলকাতায় সঙ্‌ ছিল কিন্তু সে চড়কের সঙ্‌। সে রঙ্গ কেমন করে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে এসে হাজির হল, তা বলা কঠিন। হয়ত সহর চুঁচূড়াই এর কারণ।

আগে বারো-ইয়ারি পুজো ছিল না। রাজা-রাজড়াদের বাড়িতেই এসব আড়ম্বর চলত। চুঁচূড়া সহরেই নাকি বারো-ইয়ারি পুজোর সূচনা। কেবল পুজো নয়, তাঁরা নানারকম সঙ্‌ বানাতে আরম্ভ করে দিলেন। সঙের পালা। বাঙ্‌লা প্রবাদের নামে নাম। একটি পালার নাম ছিল—'আচাভুয়ার বোম্বাচাক।'

কলকাতা থেকে সেকালের বাবুরা দল বেঁধে মাহেশে আসতেন রথ দেখতে আর পুজো দেখতে চুঁচুড়া আসতে পারবেন না? —এলেন। বোট-বজরা-পিনেস-ভাউলে গঙ্গা ভরে গেল। বাবুরা যথাসময়ে চুঁচড়ো এলেন।—অত ভিড়ে ছোট্ট সহর চুঁচুড়ার শ্বাসকষ্ট উঠল। এক-একখানি কলাপাত একেক টাকায় বিক্রি হতে থাকল। চোরেরা আঙিল হয়ে গেল। আর গরীব দুঃখী গৃহস্থের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না।

উত্তেজনা সংক্রামক। তাই সঙের সংস্কৃতি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি গ্রামে আরম্ভ হয়ে গেল বারো-ইয়ারি পুজো। আর সেই সঙ্গে সঙের বাহার! কলকাতার বাবুরা বছরে বছরে নৌকা ভাসাতে থাকলেন। তাঁরা ঐভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একদিন খোদ কলকাতার বুকেই বারো-ইয়ারি পুজো ও সঙ্‌ দুয়েরই সূত্রপাত করলেন।

পুজোর অনেক আগে থাকতেই বারো-ইয়ারের অধ্যক্ষেরা সঙের ধ্যান আরম্ভ করে দিতেন. কুমোরদের নিয়ে বসে যেতেন। কারিগরদের নির্দেশ দেওয়া হত এবং দেখানো হত সঙের নমুনা। কুমোরেরা প্রতিমার সঙ্গে এই সঙ তৈরী করতেন। —তারপর যথা-সময়ে তাদের সাজানো হত বারোয়ারী তলায়। মজলিসে মজলিসে ঝাড় লণ্ঠন, আর এর মাথায় বেল লণ্ঠনের মিষ্টি আলো ঝলমল ঝলমল করত।

তখন সঙের পালা ছিল নানা ধরনের। এর ভেতর বেশিরভাগই থাকত সামাজিক রঙ্গ। বাবুদের কথা। নতুবা পৌরাণিক পালা। ঐ পৌরাণিক পালাতেও বাবু কালচারের ছায়া পড়ত। আর পৌরাণিক পালাতে যে সব কাহিনী বিবৃত হত, তারা হল—ভীষ্মের শরশয্যা, নবরত্নের সভা, শ্রীমন্তের মশানে স্তব, রাজসূয় যজ্ঞের ঘটনা, বা রামের অভিষেক। এ সব বিচিত্র পালায় পুতুলের বৈচিত্র্য খুব একটা থাকত না। থাকত পোশাক-আশাক ও রঙের বাহার। আর শিল্পীর অক্ষমতার জন্য কখনো কখনো ব্যর্থ পুতুলগুলি সামাজিক কটাক্ষ হয়ে দেখা দিত। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম হতেন দুধের মতন সাদা। অর্জুন কিন্তু কালো। ডেমার্টিনের মত। বেচারী দুর্যোধন কিন্তু গ্রীন।

নবরত্নের সভায় সমাসীন বিক্রমাদিত্যের পোশাক হত আফিমের দালালের মতন। নবরত্নের রত্নগুলি সকলে একরকম পোশাকে সাজতন; এক চাদর, এক ধুতি। এমন কি টিকি পর্যন্ত এক। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হত—একদল অগ্রদানী নিমন্ত্রণ বাড়ি ঢোকার জন্য দারোয়ানের উপাসনায় রত। শ্রীমন্তের পোশাক ছিল হাইকোর্টের প্লিডারের মতন। মাথায় শনের শামলা অঙ্গে হাফ-ইংরেজী চাপকান। পরিধানে পায়জামা। রাজসূয়ে নিমন্ত্রিত রাজারা পোশাকে-আশাকে দারোয়ানের আকৃতি। হুতোমের ভাষায়—'রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ যেন বোধহয় একদল দারোয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে। রামের অভিসেকের চিত্রটিও বড়ো মনোরম। বানরেরা সেখানে বাবুদের চেহেরায়। কলকাতার মুচ্ছুদ্দী বাবু। আর সীতা?—তিনি তখন সীতা নন, 'সীতে দেবী'। তাঁর ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার!

পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে গুপ্ত এ সামাজিক ছবি দেখে তেমন সুখ হত না। তাই সোজাসুজি সামাজিক সঙের দর্শক ছিল বেশী। এককালে

বর্ধমানের মহারাজা মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করে সবিশেষ খ্যাত হন। তবে সে অনূদিত মহাভারত কোন কোন জায়গায় ছিল রীতিমত কঠিন। ব্যাখ্যাতা না থাকলে সাধারণ পাঠক তার মর্ম উদ্ধার করতে পারতেন না। পৌরাণিক সঙ্‌ও মাঝে মাঝে তেমনি কঠিন হয়ে উঠত। অনেকে টিপ্‌পনী কাটতেন—সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত বুঝিয়ে না দিলে মর্ম গ্রহণ করা ভার!'

সামাজিক সঙ্‌গুলি কিন্তু সরল। জলের মত পরিষ্কার। তবে ট্রাডিসনে তারা চূড়ান্ত। বাঙলা প্রবাদের জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাদের নামেই তাদের পরিচয়। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন!' 'অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি,' 'ভালো করতে পারবো না, মন্দ করব কি দিবি তা দে,' 'বুক ফেটে দরজা,' 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,' 'খ্যাদা পুতের নাম পদ্মলোচন,' 'মদ খাওয়ায় বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়,' 'হাড়হাবাতে মিছরির ছুরি' 'বকা ধার্মিক,' 'ক্ষুদ্র নবাব'—এইসব ছিল সেকালের সঙের কাহিনী।—নানারকম সামাজিক ব্যঙ্গ এদের ভেতর আভাসিত হয়ে উঠত। নব্যরঙ্গের নব বাবুরাই ছিলেন এসব ব্যঙ্গের লক্ষ্য

'বাইরে কোঁচার পত্তনে'—চিত্রিত ছিলেন ফেতো বাবু। বাইরে জাঁক ভেতর শূন্য। বাবুর মাথায় টুপি। ট্যাসল দেওয়া। চাপকান পাইনাপেলের। সিল্কের রুমাল। গলায় গার্ডচেন।—এহেন বৈভবশালী বাবু কিন্তু গৃহহীন। 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে' নয়। ইনি ভোজন করেন মাসির বাড়ি। শুয়ে থাকেন ঠাকুরবাড়ি। আড্ডা দিতে যান সেনেদের বৈঠকখানায়। বাবুর পকেটে সর্বদাই ছুঁচোয় ডন টানে। দেশের রিফর্মেশনের চিন্তায় রাত্তিরে এঁর ঘুম হয় না। ঘুম না আসার কারণ হয়ত মশারি না জোটার জন্যও হতে পারে! —এই ফেতো বাবুর উপসংহারটি বড়োই সুন্দর। হুতোমের ভাষায়—'পুলিশ, বড় আদালত, টানার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লাবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটারি করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি, ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু করতে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়। সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাস্টারি কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!'

এইভাবে একেকটি সঙে থাকত সমাজের এক-একটি দিক। অসৈরণ সইতে নারি-তে ইয়ং বেঙ্গলের কথা। তাঁদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টলুন ও

(ভয়ানক গরমেও) বনাতের বিলিতি কোট্, চাপকান পরা। চোখ ভালো থাকা সত্ত্বেও নাকে চশমা এবং রাত্তিরে খাবার সময় ছুঁচো ধরা—এই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল। ইয়ার-বেঙ্গলও বলা যায়।

তবে প্রাচীন সমাজের ওপর কটাক্ষও না-থাকা হত না। বকা ধার্মিক ছিল তার ছবি। এখানে বক মশাই নাদুশনুদুশ। মাথা কামানো। চৈতন ফক্কা। কালো পেড়ে ধুতি, রামজামা এবং জরির বাঁকা তাজে সাজা বক মশাই আশি পেরিয়েছেন। তবু ত্রিভঙ্গ। প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্ছে। মেয়েদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছেন এবং হরিনামের মালায় ঝুলি ঘুরিয়ে চলেছেন।

ক্ষুদে নবাবও নবাব। হঠাৎ দেখলে রাজা-রাজড়া বলে মনে হতে পারে। আসল পরিচয়ে তিনি কিন্তু 'হিদে জোলার নাতি'।

সেকালের কলকাতায় বাবু এবং ইয়ার বকসীদের কল্যাণে অনেক রঙ্গ দেখা যেত। অনেক। নেশার ফোয়ারা খুলে যেত। দেখা দিত হুঁকোর কুরুক্ষেত্র। গাঁজার গরিমা। বাড়ির ভেতর শালগ্রাম শিলা থেকে আরম্ভ করে দেওয়ালের টিকটিকিটি পর্যন্ত মদ টেনে চুরচুরে হয়ে থাকত। সন্ধ্যে হলে হাফ-আখড়ায়ের আসর বসত। ঢাকের আওয়াজে নেচে উঠত কলকাতা। ছকড়ওয়ালা ও বামুন পণ্ডিতদের হত পোয়াবারো। আর পোশাকে-আশাকে, আলাপে-সংলপে বাবুরা যে আড়ম্বর দেখাতেন তার কথা না তোলাই ভালো। মোটকথা কোথাও কোনো ফাঁক ছিল না। সর্বত্র আড়ম্বর।

তবে একটা দেখা বাকি ছিল। তা হল আত্মদর্শন। কলকাতা নিজেকে কোনোদিন দেখেনি। চেষ্টা করেনি দেখার। সঙ সে সুযোগ এনে দিল। সহর কলকাতার হাতে সে ধরা দিল দর্পণ হয়ে। এ দর্পণে বাবুরা একে একে উঁকি মেরে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরাও দিয়ে গেলেন।

তাই দু'রকম সঙ্ দেখলেন নিরপেক্ষ দর্শকেরা। জীবন্ত ও পুতুল সঙ্। পুতুলের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এঁরা। কাঠগড়ার ওপাশে পুতুল, এপাশে জ্যান্ত সঙ্। জ্যান্তরা ঘুরছেন লকাই লাটুর মতন। মুখভরা পান। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানের পিক। তার লালিমায় অঙ্গ আপ্লুত। পাঁজিতে আঁকা রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত দেখাচ্ছে, তাঁদের। হাতে থেলো হুঁকো।—এহেন সঙ্ দেখা অনেক সৌভাগ্য না থাকলে হয় না।

আমরা সৌভাগ্য বর্জিত বলেই একালের এ পাড়ে দাঁড়িয়ে। তবে হলফ করে বলা যায়, সঙ্-এর সংস্কৃতি চালু করলে আমরা উভয় জাতীয় সঙ্ই দেখতে পাবো।

আর একালের বাবুদেরও যে তাতে আত্মদর্শন ঘটবে তাতে সন্দেহ কি তবে বাবুরা কি তা দেখতে রাজি হবেন?

কলেজ স্ট্রীটে প্রথম বিপ্লব

কলেজ স্ট্রীট বললে প্রথমেই মনে পড়ে এক অশান্ত তরুণদের কথা। মনে পড়ে যায় সেকাল-একালের সব রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি। গোলদীঘির পশ্চিম পাড়—এ পাশে হ্যারিসন রোড আর ওপাশে মেডিকেল কলেজ—এই হল ঝড়ের কেন্দ্র। কী সমাজে, কী রাজনীতিতে, যখনই কোনো বেচালপনা দেখা দিয়েছে কোথাও, এখানকার তাপমান যন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েছে তার ইংগিত। চড চড় করে ওপরে উঠেছে পারদ। গোলদীঘির কলেজ পাড়ায় দেখা দিয়েছে ঝড়। ডিরোজিও সাহেবের আমলে নিরীহ পথচারীরা পর্যন্ত এ ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পেত না। তাদের গায়ে পড়ত নিষিদ্ধ মাংসের উচ্ছিষ্ট হাড়। একালেও তা হয়, তবে তার ধাঁচ বদল হয়েছে। এখন ট্রাম-বাস পোড়ে। বোমা ফাটে। হঠাৎ কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় কলেজ স্ট্রীট। বয়স্ক লোকেরা প্রমাদ গণনা করেন। আর রক্ষণশীলেরা আতঙ্কিত হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেন, কবে এ পাড়া শান্ত হবে? কবে?

কবে যে এ পাড়া শান্ত হবে তা বলা শক্ত। তবে কবে যে এর সূচনা তা গবেষকরা ইতিহাসের পাতা খুলে চটপট বলে দিতে পারেন। আর তাঁদের স্বীকার করতেই হয়—হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক এক ফিরিঙ্গী যুবক তরুণ কলকাতার কাঁচা মাথা প্রথম চিবিয়ে খেয়েছিলেন। প্রথম। তিনি তৈরী করেছিলেন আগুনের ঘর। পরে সে ঘরে আগুন লাগে। সে আগুন আজো জ্বলছে।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যৌবনেই মারা যান। মাত্র তেইশ বছর বয়সে। চার বছরের মতন তিনি পড়িয়েছিলেন হিন্দু কলেজে। কিন্তু ঐ ক'বছরের ভেতরেই তিনি যেসব কাণ্ডকারখানা বাধিয়েছিলেন তাতে ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সাহেব অল্প-বয়সে মারা গেলেন বটে, কিন্তু নতুন যুগের আলোর মশাল তাঁর শিষ্যদের হাতে যা দিয়ে গেলেন তা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল। কলেজ স্ট্রীট পাড়াতে বেধে গেল ভীষণ হট্টগোল। একেকটি ডিরোজিয়ান একেকটি বিপ্লব। একেকটি আগুনের গোলা। পাশেই সংস্কৃত কলেজ। সেখানকার সংস্কৃত

পণ্ডিত ঐ দিকভ্রষ্ট যুবকদের নিয়ে দেবভাষায় কয়েকটি শ্লোক লি‌খে ফেললেন। ঐ শ্লোকগুলিতে গেঁথে ফেললেন তাদের নাম। আর একেবারে শেষে লিখলেন—

ফিরিঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ ডিরোজিও কুশেশয়ে।
মধুপান রতাঃ সম্যগ বিদিগ জ্ঞানবর্জিতাঃ॥

ফিরিঙ্গী গুরুর নানা রঙের শিষ্য। এঁরা একে একে নামলেন সমাজ সংস্কারে। কেউ কেউ মদ খাওয়াটাকেই কালচার বলে ঘোষণা করলেন। কেউ জানালেন গোমাংস না-খেলে জাতির উন্নতি কদাপি সম্ভব নয়। ফলে কেউ হলেন খ্রীষ্টান। কেউ ব্রাহ্ম। আবার কেউ বা নিজের জাত না-খুইয়েও ইংরেজিতে খাওয়া-দাওয়া—মায় স্বপ্ন দেখা পর্যন্ত আরম্ভ করে দিলেন। এ ছাড়া আর সবাই দল বেঁধে যা করতে আরম্ভ করলেন তা হল—'সভা' বা 'সমাজ'। সেকালের সাহেবেরা করতেন 'অ্যাসোসিয়েশন'। বাঙালীরা ঐ ধাঁচে করলেন 'সভা'। আর 'সোসাইটি' থেকে এলো 'সমাজ'। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' ও 'গৌড়ীয় সমাজ' থেকেই এ সবের সূত্রপাত।

ঐসব সভা ও সমাজকে কেন্দ্র করেই একদিন মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটল কলকাতা শহরে। এই কলেজ স্ট্রীটে। দরজা যখন খুলে গেছে, দেশ ও জাতির কথা যখন ভাবা হচ্ছে তখন সে ভাবনায় রাজনীতি আসতে বাধ্য। ফলে, একেবারে অতর্কিতভাবেই পলিটিক্যাল চিন্তার জন্ম হল। সেকালের হিন্দু কলেজই হল এ ভাবনার মাতৃসদন। বিপ্লবের বারুদ গন্ধ ওখানেই পাওয়া গেল।

নায়ক কে? এ বিপ্লবের নায়ক? নায়ক হলেন একজন নীরব কর্মী—তারাচাঁদ চক্রবর্তী। এই কলকাতার ছেলে। ডিরোজিওর ছাত্র। ছাত্র হলে কি হয় বয়সে গুরুর থেকে বড়ো। প্রায় পাঁচ বছরের বড়ো আর শিষ্যদের ভেতর সব থেকে যে বড়ো তাতে আর সন্দেহ কি? কেবল বয়সে নয় কাজেও। অতি অল্প সময়ের ভেতর তিনি রামমোহনের ডান হাতে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সেবার প্রথম তৈরী হল।—তার সম্পাদক হবে কে? ডাক পড়ল তারাচাঁদের। হলেন প্রথম সম্পাদক।

গুরু ডিরোজিওর হাতে এ শিষ্যটি ভালোভাবেই মানুষ হয়েছিলেন। শুধু কলেজের সময়টুকুতে নয়, ছুটির পরেও কলেজের ঘরে বসে ছেলেদের নিয়ে নানান বিষয় আলোচনা করতেন ডিরোজিও সাহেব। এইরকম আলোচনা

থেকেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সভার জন্ম হয়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষায় এটি ছিল—এ ডিবেটিং ক্লাব—কল্ড্ 'দি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। এ সভার সভাপতি স্বয়ং ডিরোজিও। উঁচু ক্লাশের সব ছেলেরাই এর সদস্য। ঘুরে ঘুরে নানান জায়গায় এ সভার বৈঠক বসত। কখনো ডিরোজিওর বাড়িতে, আবার কখনো মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়িতে।

এ সভা-ই মুক্ত চিন্তার প্রথম আখড়া। ভালোভাবেই চলছিল সভাটি। হঠাৎ ডিরোজিও মারা গেলেন। যা হয়, হোতা বিহনে যজ্ঞ পণ্ড হল। হেয়ার সাহেবকে সভাপতি করে অ্যাসোসিয়েশন কিছু দিন চালানো হয়েছিল বটে, কিন্তু হেয়ার সাহেবের ভেতর সে আগুন ছিল না। ফলে সাড়া পাওয়া গেল না; উঠে গেল সভা। তবে ইয়ং বেঙ্গল হতাশ হল না। নতুনভাবে ঐ আগুন জ্বালিয়ে রাখা যায় কিনা তার চেষ্টা চলল। এবং শীঘ্রই ফল পাওয়া গেল। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—'নব্যবঙ্গের নেতৃগণ নিরুদ্যম না থাকিয়া আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী ও একটি এপিস্টোলারি অ্যাসোসিয়শন স্থাপন করেন।' বাছাই বাছাই বই কিনে বন্ধুদের ভেতর পড়াবার জন্য বিলি করাই ছিল ঐ সার্কুলেটিং লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য। কেবল পড়া নয়, 'লিপি লিখন সভা' তৈরী হল চিঠি লেখার জন্য। বই-পড়ার পর চিঠি লিখে পরস্পরকে নিজের মতামত জানাতে হবে। পঠিত বিষয় নিয়ে চলবে আলোচনা।

চলল আলোচনা। জমল আলাপ। এরপর এ ভাবসূত্র থেকেই জন্ম নিল আরেকটি সভা। না, সভা না বলে ইংরেজিতে সোসাইটি বলাই ভালো। সেকালে ইংরেজিতে এদের নামকরণ করাই ছিল কেতা। ইংরেজিতে একটি ঢাউস নাম দেওয়া হল—'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিসন অব জেনারেল নলেজ।' বাঙলায় সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। আঠারশো আটত্রিশে হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী সন্তানেরা এ সভার পত্তন করল। স্থায়ী সভাপতি —তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

নতুন হাওয়া বইল এ সভায়। নতুন হাওয়া। একেকটা বৈঠক বসে, সঙ্গে সঙ্গে একেকটা আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। কেউ আলোচনা করেন শিক্ষিত ভারতীয়দের ভেতর সিভিল ও সোস্তাল রি-ফর্ম সম্পর্কে। কেউ বর্ণনা করেন—হিন্দু মেয়েদের অবস্থা। কেউ গরম গরম বক্তৃতা দেন। কেউ

বা নরম নরম। মোটকথা এঁদের আলোচনা থেকে কিছুই বাদ পড়ে না বাঁকুড়া-চট্টগাম মায় ত্রিপুরাকে নিয়েও এঁদের অসীম কৌতূহল। বাদ যায় না ডাক্তারি বিদ্যাও—'দি ফিজিওলজি অব ডিসেকসন'।

উত্তেজনা একটু একটু করে বাড়ে। পলিটিকাল আলোচনার দিকে ঝোঁক আসে। মানিকতলার বাগানবাড়িতে ঘন ঘন সভা বসে। সভা বসলেই বক্তৃতা। বক্তৃতার নেশায় পেয়ে বসে সকলকে। বক্তৃতা না দিলে কারোর রেহাই নেই। যদি কেউ আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিছিয়ে যায়, তবে তাকে বাঁচায় কে? সভার কাছে তার জরিমানা অনিবার্য।

বিপ্লবীদের জন্য হাওয়া যখন এইভাবে গরম হচ্ছে তখন এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে প্রথম বিপ্লব আরো ত্বরান্বিত হ'ল। সেবার দ্বারকানাথ ঠাকুর গিয়েছিলেন বিলেতে। ইউরোপে তখন নতুন চিন্তার হাওয়া। বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনের মুখে তখন আগুন ঝরছে। আগুনের গোলার মত সারা ইংলণ্ডে তিনি সংস্কারের প্রাচীরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছেন। সে হেন বিপ্লবীর সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় হয়ে গেল।

টমসন ও তারাচাঁদ ছিলেন একই বয়সী। এক সনেই দু'জনের জন্ম। আঠারশো চারে ইংলণ্ডের লিবারপুল শহরে জন্ম হয়েছিল সাহেবের। দু' বছর বয়স থেকেই বেচারি পিতৃ-মাতৃহীন। ওদিকে আবার বাপের অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই শিশু টমসন লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে উঠতে পারেন নি। যা কিছু শিখেছিলেন সবই নিজের চেষ্টায়, ঘরে বসে। সেকালের ইউরোপ-আমেরিকায় দাস প্রথার চল ছিল। বড়ো হয়ে এই প্রথার বিরুদ্ধেই তিনি প্রথম আঘাত হানলেন। যখন বয়স বছর তিরিশ, পাড়ি দিলেন সুদূর আমেরিকায়। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা করে অত্যাচারীদের দুর্গম দুর্গ ধসিয়ে দিয়ে সগৌরবে ফিরলেন দেশে। দু' বছর পর। দেশে ফেরার পর কয়েকজন ভারতপ্রেমিক মনীষীর সঙ্গে মোলাকাত হয় তাঁর। ভারত সম্পর্কে তিনি অনুভব করেন কৌতূহল। আঠারশো চল্লিশে শহর লণ্ডনে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর টমসন সাহেব হলেন তার বিশিষ্ট সদস্য। ভারতে এসে এখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং এখানকার রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হবার কৌতূহলে ছিল তাঁর তীব্র। হয়ত প্রথম দেখায় টমসন সাহেব তাঁর মনের কথা বলে ফেলেছিলেন দ্বারকানাথকে। দ্বারকানাথও ক্ষুরধার বুদ্ধি ধরতেন। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে

দিয়েছিলেন আমন্ত্রণ। আর দেশে ফেরার সময় নিজের জাহাজে করে দ্বারকানাথ এই আগুনের গোলাটিকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ডিসেম্বরের এক শীতের দিনে একটি জ্বলন্ত বিপ্লব সেকালের গঙ্গার ঘাটে এসে নামল।

যুবক টমসন তখন খ্যাতির তুঙ্গে। আমেরিকা জয়ের গৌরব তখনো গায়ে লেগে রয়েছে। সুতরাং বাঙলা দেশ যে তিনি জয় করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? তারাচাঁদ তৈরী হয়ে বসে আছেন। দক্ষিণারঞ্জন ও রামগোপালের দল বয়সে অনেক ছোট হলেও, তারা ডিরোজিওর মন্ত্রে দীক্ষিত। তারাও আছে উন্মুখ হয়ে।

এদিকে টমসন এসেই পরিচিত হতে চাইলেন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' সঙ্গে। এ সভাও চাইল সাহেবকে স্বাগত জানাতে। উৎসাহী দ্বারকানাথের চেষ্টায় অতি সহজেই পুব-পশ্চিমের এ মিলন ঘটল। বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন।

আঠারশো তেতাল্লিশ। জানুয়ারী মাস। এগারো তারিখ। টমসন সাহেবের অশ্বশকটটি জোড়াসাঁকো থেকে আসছিল মানিকতলার দিকে। শীতের দুপুর। ঘোড়ার পায়ে পায়ে চমকে উঠছিল পথের ধুলো। নেটিভরা খোলা জায়গায় রোদ পোহাচ্ছিল। পালকি বেহারারা বিচিত্র শব্দ করতে করতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পালকি। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান-বাড়িতে তরুণ বাঙলা ওদিকে অপেক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে। টমসন সাহেবের গাড়ি এসে দাঁড়ালো সেই বাগানবাড়িতে। লাল কার্পেট বিছিয়ে সেদিন তাঁরা স্বাগত অভিনন্দন জানালেন ইউরোপের বিখ্যাত 'পাবলিক এজিটেটর'কে।

টমসন সাহেবও অকপটে তাঁর খুশির কথা ব্যক্ত করলেন। নব্য বাঙলাকে তিনি যে রাজনীতিতে দীক্ষিত করতে চান সে উদ্দেশ্যের কথাও অনুক্ত রাখলেন না। বরং রাজনীতিতে উদ্বোধিত করার জন্যই তিনি এসেছেন এদেশে। এসব কথা শুনে মানিকতলার বাগানবাড়িতেই তরুণ বাঙলা আশ্চর্য এক উত্তেজনা অনুভব করলো। মন মেতে উঠল। সেখানে বসেই ঠিক করে ফেললেন তাঁরা যে প্রতি সোমবারে সভা করবেন। প্রতি সোমবারে। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী এ সভা যাতে ভালোভাবে হতে পারে তার দায়িত্ব নিলেন। মোটকথা জর্জ টমসনের সঙ্গে

নব্যবঙ্গের ভাবধারা অতি সহজেই উঠল একাত্ম হয়ে। সেদিনের কথা স্মরণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—'জর্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন।'

বেশিদিন নয়, মাত্র সাড়ে তিন সপ্তাহ পরেই এই মেলা-মেশার ফল দেখা গেল। কলেজ স্ট্রীটের আসল কলেজটিতেই দেখা গেল এর প্রতিক্রিয়া। মধুসূদন-ভূদেব-গৌরদাস তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ক্যাপটেন রিচার্ডসন তখন অধ্যক্ষ। নব্যবঙ্গের নামকরা এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেও ভাবধারায় তখনো তাঁরা হিন্দু কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তাই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি সভা বসল হিন্দু কলেজের বাড়িতে। সেদিনের তারিখ হল আটই ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা বিভাগের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এই বিখ্যাত কলেজে সভা বসল। উদ্যোক্তাদের মনে নতুন উদ্যম।

স্থায়ী সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তাই সেদিনও তিনি সভাপতি। অনেক জ্ঞানী-গুণী এসেছেন। অধ্যক্ষ রিচার্ডসন এসেছেন।

সেদিনের প্রবন্ধ পাঠক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পয়লা নম্বর ডিরোজিয়ান। সেদিন তাঁর পঠনীয় প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'দি প্রেজেন্ট স্টেট অব দি ইসট ইণ্ডিয়া কোমপানিজ ক্রিমিনাল জুডিকেচার অ্যাণ্ড পুলিশ, আণ্ডার দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি।' পেল্লায় একটা নাম থাকলে কি হয়, আসলে ওটি ছিল রাজনীতিমূলক। যেকালের ফৌজদারী বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থার সমালোচনা ছিল প্রবন্ধটিতে।

রিচার্ডসন সাহেব সেদিনের সভার একজন বিশিষ্ট শ্রোতা। সেকালের তরুণ ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অধ্যাপক। দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধে সেদিন জর্জ টমসনের বক্তৃতার উষ্ণতা। সে উষ্ণতায় নড়েচড়ে বসলেন ক্যাপটেন রিচার্ডসন। সেদিনের রাষ্ট্র সমালোচনায় তিনি বারুদের গন্ধ পেলেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে সাহেব ছিলেন টোরী দলের পৃষ্ঠপোষক। অর্থাৎ অত্যন্ত রক্ষণশীল। ঐ সর্বনাশা বক্তৃতা শুনতে শুনতে ধাঁ করে সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। লাফিয়ে উঠলেন তিনি চেয়ার ছেড়ে। দক্ষিণার-রঞ্জনের বক্তৃতা থামিয়ে দিয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন 'মশাই এ প্রবন্ধ

পাঠ থামান। এ কলেজ-বাড়িটাকে আমি কখনও রাজদ্রোহীদের আখড়া হতে দিতে পারি না। নেভার।

এ হেন অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সারা সভা কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সকলের মুখে কথা হারিয়ে গেল। ওদিকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি তারাচাঁদ। অল্পই তিনি কথা বলতেন—খুবই অল্প। খুবই স্বল্প ভাষণে রিচার্ডসনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ক্যাপটেন সাহেব এ কলেজের অধ্যক্ষ হতে পারেন, কিন্তু এ বাড়িটার তিনি কেউ নন। ব্যবহারের জন্য আমরা যাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি, তাঁরা যদি আপত্তি করতেন তাহলেও না হয় বোঝা যেত। কিন্তু তিনি কে? একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্র। তাঁর এ প্রগলভতা মোটেই সমীচীন হয় নি। সুতরাং তিনি যা বললেন তা তাঁকে এখনই প্রত্যাহার করতে হবে। এখনই। নতুবা তাঁর এ কুৎসিত ব্যবহার কলেজ কর্তৃপক্ষের অথবা প্রয়োজন হলে গভর্নমেণ্টেরও গোচরে আনা হবে।'

তারাচাঁদের এ বক্তৃতায় সকলে থ। এদিকে তাঁর কথা ফুরতে না ফুরতে উঠে দাঁড়ালেন দক্ষিণারঞ্জন। তারাচাঁদের বক্তৃতা সমর্থন করে তিনিও একটি বক্তৃতা দিলেন।

সভাতে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সকলের চোখেমুখেই যেন একটি জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। সকলের মনেই উদ্যত হয়ে উঠল একটি প্রশ্ন—এবার কি হবে? সকলে তাকালেন ক্যাপেটেন রিচার্ডসনের দিকে। রিচার্ডসন তাকালেন তারাচাঁদের দিকে। তারাচাঁদ ও ক্যপটেন প্রায় একই বয়সী। ব্যবধান সামান্যই। সুতরাং সাহেব আর দেরী করলেন না। তিনি অনুভব করলেন যে টমসনের আনা নতুন হাওয়া শীঘ্রই ঝড় হয়ে দেখা দেবে। তাকে অটেকাবে কে। অন্তত বাধা দেবার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই সে অভাবিত ঘটনাই ঘটল। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং নিজের কথা প্রত্যাহার করে নিলেন।

কলেজ স্ট্রীটের ইতিহাসে রাজনীতি এই প্রথম। এটিই হল প্রথম বিপ্লব। বোমাপটকা ফুটল না বটে, কিন্তু বারুদের গন্ধ যে পাওয়া গেল, তাতে আর সন্দেহ কি?

* * *

আর এটি যে একটি খাঁটি বিপ্লব, পরের দিন কাগজে কাগজে তার প্রমাণ

পাওয়া গেল। লেগে গেল ধুন্ধমার। 'ইংলিশম্যান' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নব্যদলের এ রাজনীতি চর্চাকে খুব এক হাত নিল। অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল। বন্যা বয়ে গেল কটুকথায়। তারচাঁদ ঐ দলের নেতা বলে ঐ তরুণ দলকে' চক্রবর্তী ফ্যাশন' বা চক্রবর্তী-চক্র বলে অভিহিত করা হতে থাকল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' খুব কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে লিখল, 'এ যা করা হয়েছে তা খাঁটি রাজদ্রোহমূলক এবং এরকম রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্য বাটাভিয়া বা সামারঙে, কম করে হলেও বক্তাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে মানিকতলা থেকে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাকে' সরিয়ে এনে একেবারে শহরের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। লোয়ার চিৎপুরের কাছে। এককালে হুগলীর মুঘল ফৌজদার এখানে থাকতেন বলে জায়গাটির নাম হয়েছিল 'ফৌজদারী বালাখানা'। নিত্য সভার বৈঠকে ঐ বালাখানা গমগম করতে থাকল। আর ঐখানেই টমসনের থাকার ব্যবস্থাও হল। তবে একটু পাশে।

কেবল টমসন নয়, সাহেবের সঙ্গে নব্য বাঙলাও নেমে পড়ল বক্তৃতা দিতে। তরুণ রামগোপালের ভেতর তখন ধীরে ধীরে জন্ম নিল 'ডিমস্থিনিস'। সারা কলকাতা অবাক হয়ে এই অভাবিত দৃশ্য দেখল; 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এ প্রসঙ্গে লিখল—'এখন দুইদিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে; পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়।'

কথাটি সর্বৈব সত্য। তবে এ বজ্রকে আহ্বান করে যে নিজে নিয়ে এসেছিল, সে ফৌজদারী বালাখানা নয়, সে কলেজ ষ্ট্রীট। গোলদীঘির কলেজ। তাই আজো সে অনির্বাণ। তার আগুনের ঘর সর্বদাই জ্বলছে।

ঠনঠনে চটি বনাম ওয়েলিংটন-শু

'রে তালতলার চটি, ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না। ইংরাজ, বটবিটপীর সহিত সাফোটক (সম্ভবত ছোট গাছ) সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচিকে এক কাণ ফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন, কেবল রে চটি। তোর দুরদৃষ্টক্রমে বুট-চটি একভাবে দেখিতে পারিলেন না।'

একালের পাঠকেরা ওপরের ক'লাইন পড়ে নিশ্চয় ধরে নেবেন যে গত শতকের কোনো তরুণ কবি বুঝি চটি-বুট নিয়ে নির্ঘাত কোনো পাদুকাপুরাণ রচনায় বৃত হয়েছেন। না, বিষয়টি ঠিক তা নয়। কোনো তরুণ কবির কাব্য নয়, এ এক প্রবীণ সাহিত্যিকের রচনা। যে সমস্যার তীব্র দাহে তিনি ঐ ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেছিলেন, সে সমস্যা সেদিনকার সকলেরই মুখে মুখে— 'দি গ্রেট শু কোশ্চেন'।

অথচ জুতো নিয়ে হট্টগোল করার মত আমাদের কোনো ট্র্যাডিশন ছিল কি?—নৈব নৈব চ। শোনা যায়, কোনো এক নবাব নাকি নিজের হাতে জুতো পরার মত ঘৃণ্য কাজে হাত লাগানোর বদলে গর্দান দিয়েছিলেন, তবু জুতোয় হাত দিয়ে মান খোয়ায়নি। আর সেই দেশে কি না শু-কোশ্চেন? নাঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শেই যে এ অধঃপতন ঘটেছিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

'অল দি ইয়ার রাউণ্ড' সেকালের একটি বিলেতি সাপ্তাহিক পত্রিকা। চার্লস্ ডিকেন্স ছিলেন তার পরিচালনায়। আঠারোশ বাষট্টি সালের আটাশে জুন তারিখে সে পত্রিকায় একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটির নাম 'দি গ্রেট শু-কোশ্চেন'। তার প্রথম দুটি লাইন এইরকম—'দি গ্রেট শু-কোশ্চেন ইজ বিয়িং এজিটেটেড ইন ইণ্ডিয়া। দি গ্রেট শু-কোশ্চেন হ্যাজ বিন এজিটেটেড ইন ইণ্ডিয়া বিফোর।' অর্থাৎ আঠারোশ বাষট্টিতে যখন এই প্রবন্ধ লেখা হয়, তখন জুতোরপ্রশ্নে আমরা উত্তেজিত। আর সেদিনই যে ঐ উত্তেজনার আরম্ভ, তা নয়। এর আগেও জুতো নিয়ে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল।

তা হলে ব্যাপারখানা কি? 'অল দি ইয়ার রাউণ্ডে' আরও জবাব আছে। প্রবন্ধকার লিখেছেন—'দি গ্রেট শু কোশ্চেন হ্যাভ-ইট্‌স অরিজিন অ্যাট এ কমপ্যারাটিভলি রিসেন্‌ট পিরিয়ড, অ্যারোজ আউট অব দি কনফ্লিক্‌ট অব ইউরোপীয়ান উইথ এসিয়াটিক ম্যানার্স, প্রডিউস্‌ড বাই দি ক্লোজার ইন্‌টার-কোর্স অব দি টু রেসেজ।' মোদ্দাকথা, এশীয়-ইউরোপীয় এ ছুটি জাতির গভীর মেলামেশার ফলে এবং উভয় সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

আঠারোশ সতেরোতে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হ'ল ইংরেজী শিক্ষা। সম্ভবত সেদিন থেকেই এ ঝগড়ার শুরু। ইংরেজী শিখতে গিয়ে সেকালে অনেক ইয়ংম্যানের মাথা গিয়েছিল ঘুরে। তারা ইংরেজদের আঁকাড়া অনুকরণে ছিল ব্যস্ত। ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান ছিল না। মেজাজ ত নয়ই। ইংরেজীতে কথা ব'লে, ইংরেজীতে লিখে—এমন কি তাতে স্বপ্ন দেখেও ঐ তরুণদের পিপাসা মিটল না। সাহিত্যের সুধাভাণ্ডেও তারা হাত বাড়াল। তরুণ গরুড়ের মত ক্ষুধার আবেশে বেমালুম সেক্সপীয়র-মিলটনকে উদরস্থ করে ফেলল। তাতেই কি নিশ্চিন্ত? —না, ক্ষিধে কিছুতেই থামতে চায় না। আরো চাই। চারদিকে দেশাচারের যে সব বেড়া ছিল, সে দিকে নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বেড়া টপকাল। চোখে দেখল নিষিদ্ধ মাংস। গলায় ঢালল শ্যামপেন ও 'ব্র্যাণ্ডি পানি'। পা ফাঁক করে ফুকল ম্যানিলা চুরুট। —কিন্তু না, এখানেও ক্ষান্তি নাই।

নজর পড়ল এবার জুতোর দিকে। যে ইয়ং-বেঙ্গল কোট-প্যাণ্ট পরা আরম্ভ করে দিয়েছে, সে কি খালি পায়ে থাকবে নাকি? সেকালের সাহেব মহলে 'ওয়েলিংটন বুটের' ছিল বেজায় কদর। সেই কদরের পাদুকায় নব্য-বাঙ্‌লা এবার পা গলালো। যাদের 'ওয়েলিংটন শু' পায়ে দেবার সঙ্গতি হ'ল না, তারা কিন্তু ভুলেও তালতলার বা ঠনঠনের দিকে গেল না। তারা ব্যবহার করল, 'পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ির জুতা।'

আগেই বলেছি, ভারতীয় আদর্শে জুতো চিরকালই বাহুল্য। দেবায়তনে তার প্রবেশ নিষেধ। গুরুজন সন্নিধানেও সে বাতিল। রাজাকে যখন আমরা চিরকাল দেবতার মত খাতির করে এসেছি, তখন তাঁর কাছেই বা কেমন ক'রে জুতো পায়ে যাই? ইংরেজরা যখন এই দেশে রাজা হয়ে বসল, তখন আমাদের ট্র্যাডিশনকে তারা যথাপূর্বং রেখে দিল। ফলে, ওয়েলিংটন বুটের প্রবেশাধিকার থাকল সর্বত্র, কিন্তু আমাদের নেটিভ জুতোর ভাগ্যে রইল কেবল নিষেধ

আর নিষেধ। —ওয়েলিংটন বুট পরে ইয়ংবেঙ্গল যে ভাবে হস্তে হ'য়ে—ঘুরতে লাগল, 'হাউ-টু গেট দেম অফ্ ওয়াজ দি ডিফিকালটি।' আর বুট-জ্যাক নিয়ে সকলের সামনে জুতো পরতে বসা রীতিমত এটিকেট-বিচ্যুতি তাই তারাও একদিন পেয়ে গেল রাজকুলের মত প্রবেশাধিকার। লর্ড ডাল-হৌসি সেদিন একটি আপোষ মীমাংসা করে দিলেন। —'হি ইস্যুড এন অর্ডার দ্যাট নেটিভস হু ড্রেস্‌ড্ লাইক নেটিভস অ্যাণ্ড ওয় স্লিপার্স শুড লিভ দি ল্যাটার অন দি থ্রেশোল্ড, অ্যাকরডিং টু নেটিভ কাস্টম'...অর্থাৎ তিনি নির্দেশ দিলেন যে, যে-সব নেটিভ দেশী পোশাকে থাকবেন এবং পায়ে পরবেন চটি, দেশী প্রথা অনুসারে তাঁদের প্রবেশ পথে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে হবে।

কিন্তু সাহেব-পোশাকধারী নেটিভদের এ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে না। —'নেটিভস্ হু কনফর্মড, টু এ পার্সিয়াল একস্টেন্ট টু দি ফ্যাশান অব ইউ-রোপীয়ান কস্টিউম, মাইট রিটেন দেয়ার বুটস ইফ দে চুজ টু ডু সো।' তবে মাথায় হ্যাট থাকলে, 'দে মাস্ট ড্রফ্ দেম।' কিন্তু টারবান বা পাগড়ির বেলায় এ নিষেধ থাকবে না।

এ বিধি যিনি বেঁধে দেন, সেই ডালহৌসির রাজ্যকাল হল আঠারো শ আটচল্লিশ থেকে ছাপান্ন। দেখতে দেখতে তাঁর সময় কেটে গেল। এলেন লর্ড ক্যানিং। ইতিহাসের সে দুর্যোগমুহূর্তে কত ঘটনা যে ঘটে গেল তার ঠিক নেই। সিপাই বিদ্রোহে সারা ভারতবর্ষ রক্ত স্নান সেরে উঠল। বাঙলা দেশে ঘটল নীলবিদ্রোহ। এদিকে দুর্ভিক্ষ তো লেগেই আছে। কোম্পানীর কাছ থেকে রাজ্য বদল হ'ল ভিক্টোরিয়ার হাতে। প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পুনর্নিয়োগ হলো ভাইসরয় পদে।

এত সোরগোলেও কিন্তু শু কোশ্চেন চাপা পড়ল না। আঠারো শ বাষট্টিতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

এ উত্তেজনার ঠাঁই কলকাতা নয়। বোম্বাই। সেখানকার কয়েকজন রাজ-ভক্ত পারসীক এসেছিলেন ইনকামট্যাক্স কমিশনারের অফিসে। যেহেতু সেটা রাজদ্বার নয়, তাই নেটিভ-পোশাক পরিহিত সেই ভদ্রসন্তানেরা দেশী জুতো আর খোলেননি। জুতো পরেই এসেছিলেন সাহেবদের কাছে। সে দৃশ্য দেখে সাহেবরা একেবারে রেখে আগুন। তাঁরা হাঁক পাড়লেন—জুতো না খুলে এলে 'আভি নিকালো'। —'দি অফিসিয়াল ডিগনিটি ওয়াজ রাউজ্‌ড, অ্যাণ্ড অ্যান অর্ডার ইস্যুড, রেনভারিং দি ড্রফিং অব দি স্লিপার্স কমপালসারি।'

এ হেন নির্লজ্জ আচরণ দেখে বিলেত থেকে সাহেবরা পর্যন্ত হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তাই জোড়াতালি দিয়ে ভয়ে ভয়ে একটি মীমাংসাও করে দেওয়া হল।

কিন্তু যে প্রশ্নের মূল আরো গভীরে সে কি অত সহজে চাপা পড়ে। তাই আঠারোশ চুয়াত্তর সালে এ সমস্যাটি একেবারে প্রলয় কাণ্ড করে বসল। আর তা ঘটল একেবারে কলকাতার বুকেই। তালতলার চটি আর বুট জুতোয় সেদিন যে ঠোকাঠুকি লেগে গেল, ইতিহাসে এহেন সংঘর্ষের তুলনা মেলা ভার।

এ পক্ষের নায়ক যিনি ছিলেন, তিনি হলেন সেকালের সেরা ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একসময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' —সুতরাং এ হেন মানুষের চটি—বুট্ জুতোর গাম্ভীর্যে ভিরমি খাবে কেন? প্রিন্সিপাল কার টেবিলে পা তুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে, জনশ্রুতি ছিল তিনিও কার-কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন টেবিলে পা তুলে। চটি নাচিয়ে নাচিয়ে। অতএব জনশ্রুতিই প্রমাণ করে এ সংঘর্ষে প্রতিপক্ষ পিছু হটার লোক নন।

ঘটনার আরম্ভটি এ রকম। সেবার সবে চুয়াত্তর সালের সূচনা। জানুয়ারি মাস শেষ হ'তে আর দু'দিন বাকি। বাঙলা তারিখ হিসাবে ষোলোই মাঘ। বারো শ আশি সাল।

বিখ্যাত হিন্দী কবি হরিশ্চন্দ্র এসেছেন কলকাতায়। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে। হরিশ্চন্দ্রের ওপর বিদ্যাসাগরের স্নেহ ছিল অপরিমেয়। তাঁর বইগুলি হিন্দী অনুবাদের অধিকার এঁকেই দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আর বিদ্যাসাগরের মা যখন কাশীতে ছিলেন, এঁরই হেফাজতে ছিলেন। —সেই তরুণ কবি হরিশ্চন্দ্র এসেছেন কলকাতায়। আর চলেছেন মিউজিয়াম দেখতে। বিদ্যাসাগর মশাই স্বয়ং এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজ ছেলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে চলেছেন।

বিদ্যাসাগর মশাই যথারীতি তালতলার চটি এবং ধুতিচাদর পরিহিত হরিশ্চন্দ্রের পায়ে বিলিতি জুতো, গায়ে চোগা চাপকান এবং মাথায় পাগড়ি, সুরেন্দ্রনাথের পোশাক সবটাই সাহেবী। মোটকথা এঁদের তিনজনকেই কোনো অপরিচিত লোক দেখলে ভাবতেন, একজন বাঙালী, একজন হিন্দুস্থানী এবং

একজন নির্ঘাত ওড়িয়া। ওড়িয়া বলে যাকে মনে হত, তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর এ নিয়ে অনেক রঙ্গরসিকতা করতেন।

যাই হোক, সেদিন সেই মাঘ মাসের শীতের দুপুরে তিনজনে গিয়ে হাজির হলেন পার্ক স্ট্রীটের একটি পুরোনো বাড়িতে। সেকালের ঐ একই বাড়িতে একদিকে ছিল এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী এবং অপরদিকে যাদুঘর। প্রথমে তাঁরা সোসাইটি দেখলেন। তারপর পা বাড়ালেন যাদুঘরের দিকে। আর এখানেই ঘটল বিপত্তি। দারোয়ানের চোখে বিদ্যাসাগর সমীহ করার মত মানুষ বলে মনে হলেন না। এবং খৈনী টিপ্‌তে টিপতে সে জানাল জুতো না খুললে তাঁর প্রবেশাধিকার মিলবে না। অপর দু'জনের পায়ে বুট জুতো ছিল, তাই হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথকে আটকানো হ'ল না।

ব্যস, বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি ছুঁইয়ে দেওয়া হল। না, সেখানেই বিস্ফোরণ হল না। বিদ্যাসাগর মশাই গম্ভীরভাবে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। মুহূর্তের ভেতর সে খবর এসিয়াটিক সোসাইটি অফিসে পৌঁছে গেল। সোসাইটির সহকারী সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দৌড়ে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে আসার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাড়া দিলেন না। নিজের সঙ্কল্পে তিনি তখন দৃঢ়। সোজা বাড়ি ফিরে এলেন।

সেকালের এইচ এফ ব্ল্যানফোর্ড ছিলেন 'অনারারি সেক্রেটারি টু দি ট্রাসটিজ অব ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।' সপ্তাহখানেক পরে ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে তাঁকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর। চিঠিটির ছত্রে ছত্রে জুতো-জিজ্ঞাসার অভিযোগ ধ্বনিত হয়ে উঠল। খুব স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি লিখলেন—'এই জুতো রহস্যের কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যাদুঘর তো সাধারণের...। এখানে এরূপ জুতা বিভ্রাট দোষাবহ। যাদুঘর যখন মাদুরমোড়া, কারপেট বিছান বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এরূপ নিষেধ-বিধির আবশ্যকতাই বা কি? তা ছাড়া পায়ে যাহাদের বিলাতী জুতা, কিন্তু আসিয়াছে পদব্রজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে পাইতেছে, তখন তাহাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকে, পায়ে শুদ্ধ দেশী জুতা বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা যাহাদের ইহাদেরও অপেক্ষা উন্নত, আসেন গাড়ি পাল্কী করিয়া, তাঁহাদিগের উপরই বা এরূপ নিষেধবিধি প্রবর্তিত হয় কেন?'

বিদ্যাসাগর কিন্তু এখানেই থামলেন না। এ অসঙ্গতি যেখানে থাকলে থাকতে পারত, সেই হাইকোর্টের উদাহরণ দিয়ে লিখলেন—পসার-প্রখ্যাতিতে নামে-মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা। সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা নাই, তখন সাধারণের আরাম বিশ্রামের স্থানে এরূপ অসঙ্গত নিষেধবিধি দেখিয়া আমাকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে।'

বিদ্যাসাগর মশাই এ অসঙ্গতিতে যতখানি বিস্ময়াবিষ্ট হলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাসটিরা বোধহয় ততখানি বিস্মিত হলেন না। তাই লাল ফিতের বাঁধনে এ চিঠির উত্তর আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল। আর দেরী করে হলেও যে উত্তর এলো তা নিতান্ত নৈরাশ্য-জনক।

প্রায় একমাস কুড়ি দিন পরে ছাব্বিশে মার্চ তারিখে হেনরি ব্লানফোর্ড একটি চিঠি লিখে বিদ্যাসাগর মশাইকে জানালেন—'মহাশয় আমি গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মিউজিয়াম প্রবেশকালীন জাতীয় প্রথানুসারে বহির্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উক্ত মিউজিয়ামের ট্রাষ্টিগণের গোচরার্থ অর্পণ করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে আপনাকে অবগত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে ট্রাষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোনপ্রকার আদেশ প্রচার করেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই...

মোদ্দাকথা, বিদ্যাসাগরের অভিযোগকে ব্লানফোর্ড সাহেব বেমালুম হাঁকিয়ে দিলেন তাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন না, কেবল লিখলেন 'একজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক'।

বিদ্যাসাগর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দু' জায়গায় 'রিজয়েণ্ডার' পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি অবহেলায় সেকালে সকল শ্রেণীর মানুষই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরকে খাতির করতেন না এমন কোনো রাজা-মহারাজা বা সাহেব-সুবো সেকালের বাংলাদেশে ছিল না। সাধারণ মানুষ ত কা কথা। তারা তাঁকে দেবতার চেয়েও বেশি ভক্তি করত! সেই দেবোপম বিদ্যাসাগরের এ হেন লাঞ্ছনা?

এ অবমাননার বিরুদ্ধে কলম ধরল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। সাহেবী হলেও 'ইংলিশম্যান' পর্যন্ত বাদ গেল না। 'দি গ্রেট কোশ্চেন' নাম দিয়ে সেকালের 'ইংলিশম্যান' যে বিরাট প্রতিবাদ-প্রবন্ধ রচনা করল, তার ভাষা বোধহয় সব

থেকে গরম। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তারা লিখল—'এ নেটিভ জেণ্টল্‌ম্যান অব লার্নিং, মডেষ্টি অ্যাণ্ড মেরিট্‌স, হু হ্যাজ রেনডারড্‌ ইনএষ্টিমেব্‌ল সার্ভিস টু হিজ ফেলো কান্ট্রিমেন্‌ অ্যাণ্ড হুজ রেপুটেশন এক্সটেনড্‌স ফার বিয়ণ্ড দি বাউণ্ডস অব এসিয়া'—এ হেন বিদ্যাসাগর কিনা জুতো, পায়ে দিয়ে মিউজিয়ামে ঢুকতে পাননি! আর কাউনসিল জানে না, 'হাউ টু রি অ্যাক্ট ইন্‌ দিস্‌ ম্যাটার?' শেষবেশ এই সাহেবী পত্রিকাটি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে লিখল: বিদ্যাসাগরের মতন একজন পণ্ডিতের প্রতি যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন এসিয়াটিক সোসাইটিতে আর কোনো পণ্ডিত যেতে চাইবেন না।'

এ ঘটনা নিয়ে 'সাধারণী' পত্রিকায় 'তালতলার চটি' নামে একটি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হল। বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয় চন্দ্র সরকারই নিশ্চয় এর রচনাকার। এই রচনাটির ছত্রে ছত্রে সেকালের সাহেবী সভ্যতার ওপর বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে। লর্ড মেকলে থেকে অনেক বড়ো বড়ো সাহেব এ ব্যঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। ব্যঙ্গচিত্রটি এইরকম ;—তালতলায় সম্ভূতার এতদূর স্পর্ধা! শৌণ্ডিকালয়ের নিভৃতাভ্রপ্রদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপর্যুপরি থাকিয়া লর্ড মেকলের তপস্যা করিতে পারিস, করিয়া লালবাজারে জন্মগ্রহণ করত পেনটুলনধারী কোন কেরানীর পদধূলি সর্বাঙ্গে ধারণ করিতে পারিস, তবে এরূপস্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করিস। তোর এ জন্মে, এ চর্মচটি জন্মে কুসন্তান বিদ্যাসাগরের বলে তুই এস্থানে প্রবেশ করিতে পারিবি না।'

'ব্যঙ্গের কথাই সত্যি হল। বিদ্যাসাগরের চটি মিউজিয়ামে প্রবেশাধিকার সংগ্রহ করতে পারল না। শোনা যায়, এ পাদুকা প্রশ্ন গড়াতে গড়াতে বাঙলা সরকার এবং সেখান থেকে ভারত সরকার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ভারত সরকার কিন্তু সেদিন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আর যেহেতু এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না, সেই হেতু বিদ্যাসাগরও তাঁর জীবৎকালে ঐ যাদুঘরের দিকে আর পা বাড়ালেন না। অনেক অনুরোধেও না।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ অভিমান বুঝবে কে?—চার্লাস ডিকেন্স? না, তখন তিনি বেঁচে ছিলেন না। জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আরেকবার কলম তুলে নিতেন। 'দি গ্রেট কোশ্চেন' নামে দ্বিতীয় দফায় তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করতেন, তাতে নিশ্চয়ই পাদুকা প্রশ্ন চিরদিনের জন্য মিটে যেত।

দুঃখ এই, ইতিহাস আমাদের হে সুযোগ দিল না।

ইংরেজি চর্চার সেকাল

একালে ইংরেজি চর্চাকে যখন আমরা দেশ থেকে বিদায় দিতে চলেছি, ঠিক সেই সময় কৌতূহল হতে পারে ইংরেজি চর্চার প্রথম দিকটা কেমন ছিল ?—সেই সেকালে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়নি, মিশনারি স্কুলগুলিও যখন এখানে সেখানে বিকশিত ছিল না সেই ঊষাকালে ইংরেজি শেখবার জন্য যখন আমরা ব্যাকুল হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি তখন কেমন ছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—ছেলেকে আপনি কোন ভাষায় পড়াবেন ? আরবী-ফারসী-সংস্কৃত ? না, ওসব সেকেলে ভাষায় চলবে না। নবদ্বীপ-মুর্শিদাবাদের গৌরব অস্তমিত। কৃষ্ণনগর—সেও, সেকেলে। গঙ্গা তীরে চার্ণক সাহেবের শহরে নতুন যুগ এসেছে। এসেছে নতুন ভাষা ! সুতরাং নতুন ভাষাই শিখতে হবে। শেখাতেও হবে।

সে বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে একশ সাতষট্টি বছর আগেকার কথা। সেকালের কলকাতায় সবে বিলিতি ঘড়ির চলন হয়েছে। পঁচিশ বছরের এক তরুণ ইংরেজ সেদিন চাঁদপাল ঘাটে এসে নামল। সে লোকটির সংবর্ধনায় একশটি কেন একটি তোপও পড়ল না। 'সাহেব' স্কচ। নিতান্তই সাদামাটা। পেশা ঘড়ির ব্যবসা। এদেশে এসে খামোখা যে সমাজ-সেবা বা শিক্ষাদানে লেগে যাবেন, তাঁর কাছে এহেন কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। ব্যবসা-পত্তর করে দু-পয়সা রোজগার করবেন এই ছিল আকাঙ্ক্ষা। ব্যবসা করতে হলে খদ্দেরের ভাষা জানা দরকার। তাই জাহাজে আসার সময় ভাবতে ভাবতে এসেছেন নেটিবাদের ভাষা কেমন করে রপ্ত করবেন। কিন্তু তাজ্জব কি বাৎ এখানে এসে দেখেন বিলকুল সব উল্টো। কোথায় তিনি তাদের ভাষা শিখবেন তা নয়, তারা শিখতে চায় ইংরেজি !—সাহেব তো থ।

ঐ থ হওয়া সাহেব আর কেউ নন, ইনিই হলেন ডেভিড হেয়ার। আঠারোশ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন এদেশে এলেন তাঁর চোখেই নেটিবদের আকাঙ্ক্ষাটি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। আর দেশী-বিদেশী মানুষদের ভেতর তিনিই বোধ করি প্রথম যিনি উপলব্ধি করলেন যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া এদেশের কোনো উন্নতি নেই।

আঠারোশ সালেই তৈরি হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বিলেত থেকে এসে সিভিলিয়ানরা এ-দেশী ভাষা শিখবে এই ছিল কলেজটির উদ্দেশ্য। দেশী লোকদের কোনো কলেজ ছিল না। যদি থাকত তাহলে দেখা যেত দেশী ভাষা নয় সাহেবী ভাষাতেই তাদের আসক্তি। শহরের তা-বড় তা-বড় লোকেরা নিজের নিজের সন্তান-সন্ততিদের এ ভাষা শেখানোর জন্য ব্যাকুল।

মওকা দেখে কয়েকজন ফিরিঙ্গি কলকাতায় নানান জায়গায় একটি-দুটি করে ইংরেজি পাঠশালা খুলে ফেলল। এ ধরনের একজন সাহেবের নাম শেরবার্ন। চিৎপুর রোডে তিনি একটি স্কুল খুলেছিলেন। শোনা যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ এ স্কুলেই ইংরেজির পাঠ নেন। সতেরোশ চুরাশিতে সম্ভবত ঐ শেরবার্ন সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সেখানে তৈরি হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ। যাই হোক ঐ ফিরিঙ্গি পাঠশালাটির সত্যি সত্যিই খুব নামডাক ছিল। কেবল দ্বারকানাথ নন হরকুমার ঠাকুর-প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষের মতন খ্যাতিমানরাও সেখানে পড়েছিলেন।

মার্টিন বাউল আরেক সাহেব যিনি এর দুই বছর পরে সেকালের আমড়াতলায় এহেন একটি পাঠশালা তৈরি করলেন। তাঁর পাঠশালার গৌরবও কিছু কম ছিল না। মতিলাল শীলের মতন শিক্ষানুরাগী মানুষটি তাঁর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অন্বেষণ করলে অনেক স্কুলের নামই আমরা পেতে পারি। আর্চার সাহেবের স্কুল, হজেস স্কুল, গ্রিফিথ সাহেবের বোর্ডিং-স্কুল, ইউনিয়ন স্কুল, স্যানাবেল্‌স স্কুল, ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, রিড সাহেবের স্কুল প্রভৃতি অজস্র স্কুল সেকালে তৈরি হয়েছিল। শুধু কি সাহেবদের স্কুল?—বাঙালীরাও পিছিয়ে থাকল না। যে সব বাঙালী ইংরেজি শিখেছিল, তারাও একটি একটি করে স্কুল খুলে ফেলল। রামজয় দত্ত স্কুল ও রামনারায়ণ মিত্রের স্কুল এদের ভেতরে প্রধানতম। কলুটোলায় ছিল রামজয়ের পাঠশালা। সতেরোশ একানব্বই সালে তাঁর স্কুল তৈরি হয়। রামকমল সেন ছিলেন এ স্কুলের সেরা ছাত্র। রামনারায়ণের স্কুল ছিল জোড়াবাগানে। ইংরেজি জানা এক উকিলের কেরানীকে দিয়ে এর আরম্ভ। কেরানী বেচারি খুব সামান্যই ইংরেজি জানত। কিন্তু তাতেই যা বোলবোলা ছিল, সে ঠেলা সামলায় কে? চার থেকে ষোল টাকা মাইনে দিয়ে সেকালের অনেকেই এ পাঠশালায় পড়তে আসত।—শুধু ছেলেদের নয়, সেকালের মেয়েদের স্কুল দু' একটি ছিল। হেজেস সাহেবের বিবি সতেরোশ বাট সালে যে স্কুলটি তৈরি

করেন সেটি সম্ভবত কলকাতার প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়। শোনা যায়, এখানে নাচ শেখানো হত এবং শেখানো হত ফরাসী ভাষা। এরপরেই ডারেল সেমিনারি এবং প্র্যাট মেমোরিয়াল গার্ল স্কুলের উল্লেখ করতে হয়। ডারেল নাম্নী এক মহিলা সতেরোশ উনআশি সালে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশে প্রথম পাঠশালাটি তৈরি করেন। দ্বিতীয়টি কবে তৈরী হয়েছিল বলা শক্ত। তবে লোয়ার সার্কুলার রোডে এটি অবস্থিত ছিল।

এহ বাহ্য। স্কুলের বিবরণ থাক। এ-সব পাঠশালায় কি ধরনের পাঠ দিত, তার প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো, সেকালে সিলেবাস ঠিকঠাক করে ইংরেজি শেখানো হত না। বাঙলা অর্থসহ অভিধান মুখস্থেই ছিল সেদিনকার কৃতিত্ব। ফলে এক-একজন ছাত্র ছিল এক-একটি 'ওয়াকিং ডিক্সনারি।' অর্থাৎ চলমান অভিধান।

বেশি-কম মুখস্থের ওপর ভালো-মন্দ চাকরি জুটত। আর ঐ শব্দ মুখস্তকে সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও অর্থ দিয়ে গাঁথা হত কবিতা বা ছড়া। মুখস্থ করতে পারলে ইংরেজিও আসত আয়ত্তে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ধরুন আপনি সেকালের একটি পাঠশালায় বেড়াতে গেলেন। স্কুল-মাষ্টার সাদরে আপনাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর কি বিষয়ক কবিতা শুনতে চান সেই প্রসঙ্গে বললেন, 'কি ঘোষাব?—গার্ডেন না স্পাইস?' অর্থাৎ উদ্যানজাত দ্রব্যগুলির নাম ঘোষাব না মশলার নাম? এখন আপনার মর্জি। যেটা খুশি আপনি শুনতে পারেন।

তবে পুরনো বই খুজলে আজও হয়ত সেকালের সেই ছড়াগুলির দু-একটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটি এই রকম:—

গাড্ ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর
কম মানে এস,
ফাদার বাপ, মাদার মা,
সিট মানে বস।
ব্রাদার ভাই, সিসটার বোন
ফাদার-সিসটার পিসি,
ফাদার ইন্ ল মানে শ্বশুর,
মাদার-সিসটার মাসি।

আই মানে আমি

আর ইউ মানে তুমি,

আস্ মানে আমাদিগের,

গ্রাউণ্ড মানে জমি।

ডে মানে দিন,

আর নাইট্ মানে রাত,

উইক্‌কে সপ্তাহ বলে

রাইস মানে ভাত।

আরেকটি কবিতা পাওয়া যাচ্ছে, তার দুটি লাইন এই রকম :—

পমকিন লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।

ব্রিঞ্জেল্ বার্তাকু, প্লামেন্ চাষা॥

না, কেবল কবিতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠান্তরও পাওয়া যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু, তাঁর 'সেকাল আর এ একাল' গ্রন্থে যা লিখেছেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থে তা আবার একটু অন্যভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ঐ দুই লাইনের একটি কোথায় ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বদলে নতুন একটি লাইন যুক্ত হয়েছে। তাই অন্য মূর্তিতে কবিতাটিকে দেখতে পাই—

ফিলজফার বিজ্ঞলোক

প্লোম্যান—চাষা।

পমকিন লাউ কুমড়ো,

কুকুম্বার—শশা॥

কেবল কবিতা নয় সুরারোপ করে এ কবিতাকে আবার গানে পরিণত করা হত। খামবাজ রাগিনীতে ও ঠুংরি তালে সোল্লাসে যে গানটি সেদিন গাওয়া হত, তার হদিশ পাওয়া গেছে। সে গানটি হল এই—

নাই—কাছে, নিয়ার—কাছে,

নিয়ারেস্ট—অতি কাছে,

কাট—কাট কট—থাট

ফলোয়িং—পাছে॥

আগেই বলেছি ব্যাকরণ শেখানো হত না। শুধু শব্দ আর অর্থ জানা। ফলে বাক্য গঠনে যে অভিনবত্ব দেখা দিত তা রীতিমত মৌলিক। আর বাঙলা কথাকে যখন ইংরেজি অনুবাদ করা হত। সেখানেও ঐ রীতি

বহাল রাখা হত। ফলে বাঙালীদের মুখে ইংরেজি—সে এক রীতিমত মজলিসি গল্প হায় দাঁড়াত।

ঝড়ের বেগে একটি জাহাজ একদা গঙ্গাতীরে কাৎ হয়ে যায়। জাহাজের সরকারবাবু হন্তদন্ত হয়ে দৌড়লেন সাহেবের কাছে। সাহেব বললেন, 'কি ব্যাপার?' সরকারবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'স্যার শিপ ইজ এইটিওয়ান।' সে কি? এর অর্থ ভাবতে ভাবতে সাহেব ত ঘেমে উঠলেন। কিন্তু তিনি যদি এইটিওয়ানের বাঙলা জানেন তা হলে সহজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতেন। আসলে জাহাজটি একাশি হয়ে পড়েছিল। আর সরকার মশাই ঐ 'একাশির'ই অনুবাদ করেছেন।

নবীন বসু নামে এক বাঙালী সাহেবের বাবু ছিল। আর সাহেবের ছিল অনেক ঘোড়া। আস্তাবলে দানার সরবরাহ ছিল তাই অবারিত। সাহেবের বাবু দুপুর বেলা বাড়ি থেকে আর টিফিন আনতেন না। ঐ ঘোড়ার দানাতেই সেটি সারতেন। এদিকে দুষ্টু সহিসেরা গোপনে ঘোড়ার দানা বিক্রি করত। শেষ পর্যন্ত তারা একদিন ধরা পড়ল। দুষ্টু সহিসেরা তখন নবীন বসুর টিফিন খাবার রহস্য ফাঁস করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর ডাক পড়ল। 'নবীন! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?' অকপটে সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে সে বলল, 'ইয়েস স্যার, মাই হাউস মার্নিং অ্যাণ্ড ইভনিং টুয়েনটি লিভস ফল—লিটিল লিটিল পে,—হাউ ম্যানেজ?'

এ হেন ইংরেজি ভাষণ শুনে সাহেবের চোখ কপালে উঠল। পরে যা বুঝলেন, তা হল—আমার বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যায় কুড়িখানা পাতা পড়ে, এত কম মাইনেতে কেমন করে চালাই?'—না, এরপর সাহেব আর কোনো কৈফিয়ৎ তলব করেন নি। বরং সঙ্গে সঙ্গে বসু মহাশয়ের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। ঐ অভিনব ইংরেজি ভাষণই তার কারণ কিনা কে জানে?

আরেক সাহেবের কাহিনী একটু ভিন্ন ধরনের। যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি তাঁর সরকারের ওপর বেজায় রেগে গিয়েছিলেন। 'মনিব বাঁচালে বাঁচাতে পারেন, মারলে মারতে পারেন' এ রকম চিন্তা করে সরকার সাহেবের কাছে বলল: 'মাসটার ক্যান লিভ, মাসটার ক্যান ডাই।' কি? মাসটার ক্যান ডাই? এ কথা শুনে সাহেব আরো রেগে গেলেন। সরকারকে

প্রহার করার জন্য তিনি লাঠি তুললেন। সরকার বুঝল হিতে বিপরীত হয়েছে। তখন সে সাহেবকে হাত তুলে থামতে বলল। তারপর নিবেদন করল, 'ডাই মি', অর্থাৎ আমাকে মেরে ফেলুন। আর 'ইফ মাসটার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কাউ ডাই, মাই ব্ল্যাক ষ্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনরেশন ডাই।—অর্থাৎ মনিব যদি মরেন, তবে আমি মরি।—আর শুধু কি আমি? আমার সঙ্গে মরে আমার গোরু আমার শালগ্রাম শিলা এবং আমার চৌদ্দ পুরুষও।

আর সেই সরকারটির কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, যে রথের দিন অফিস কামাই করেছিল। পরের দিন সাহেব কৈফিয়ৎ তলব করলেন। জানতে চাইলেন রথ বস্তুটি কি? তখন গলদঘর্ম হয়ে সাহেবের বাবু রথের যে বর্ণনা দিয়েছিল তা রীতিমত রোমাঞ্চকর।—'উডেন চার্চ—থ্রী ষ্টোরিস হাই—গাড অল মাইটি সিট আপন—লং লং রোপ—পুল-পুল-পুল—রান অ্যাওয়ে—রান অ্যাওয়ে—হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।' বলা বাহুল্য এই সঙ্গে হাত-পা নাড়া এবং অভিনয়ও যুক্ত ছিল। তার ফলে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল, একালের শিব্রামদের পক্ষে নিশ্চয়ই তা ঈর্ষাযোগ্য।

না, আর আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে একথা ঠিক এ ঘটনাগুলি আমাদের কাছে আজ যেমন হাস্যোদ্দীপক সেদিন সাহেবদের কাছেও এগুলি কম হাসির ব্যাপার ছিল না। সাহেবদের সান্ধ্যভোজে এরা প্রাত্যহিক খোরাক জোগাত।

হয়ত এরকম করেই ইংরেজি শিক্ষার ধারা চলত। কিন্তু চলল না। আগেই বলেছি ঘড়ির ব্যবসা করতে এসেছিল যে সাহেবটি, সে এদেশের মাটিতে পা দিয়েই বুঝল এদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া খুবই দরকার। নেটিব, সাহেব—যে লোকই তাঁর দোকানে আসে তাঁদের সকলের কাছেই তিনি একটি ইংরেজি পাঠশালা তৈরী করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। কিন্তু না, কোথাও তেমন সাড়া মেলে না।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। আঠারোশ সাত সালে শ্রীরামপুর থেকে ফরাসী ভাষায় একটি পুস্তিকা বেরোল। মিশনারিদের পুস্তিকা। মহম্মদীয় ধর্মের ওপর খ্রীষ্টীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা—এই ছিল বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐ ছোট বইখানি নিয়ে নেটিব মহলে এমন সরগোল শুরু হয়ে গেল যে, কলকাতায় সাহেবদের থাকা কঠিন হয়ে উঠল। শ্রীরামপুর ছিল সেকালে

ড্যানিশদের অধীনে। তড়িঘড়ি ঐ বই বন্ধ করার জন্ম আবেদন পৌছল ডেনমার্কে। ডেন সরকার বইগুলি বাজেয়াপ্ত করলেন, তখন সরগোল থামল।

দেশী ভাষার বদলে ইংরেজি ভাষা শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন যাঁরা, এ ঘটনা দেখে তাঁরাও রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। বিদেশী ভাষা শেখাতে গিয়ে কি বিপত্তি ঘটে কে জানে?

না, হেয়ার সাহেব তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

অবশ্য ইতিমধ্যে রামমোহন রায় কলকাতায় এসেছেন। তাঁর 'আত্মীয়-সভা'ও স্থাপিত হয়েছে। হেয়ার সাহেব সেই সভাতে গিয়েও হাজির হলেন। তারপর নেটিবদের কাছ থেকে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইসটের কাছে প্রস্তাব গেল। আঠারোশ সতের সালের বিশে জানুয়ারি গরানহাটায় স্থাপন করা হল একটি কলেজ। সেটিই হল হিন্দু কলেজ। এরপর থেকেই যথার্থ ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ। আর ইংরেজি জানার দরুন সামাজিক প্রতিপত্তি যা বাড়ল তা সত্যি সত্যিই অসাধারণ।

কিন্তু ফিরিঙ্গি স্কুলগুলি সভায় যে মর্যাদা পেয়েছিল হিন্দু কলেজ বোধহয় তার সিকিও পায়নি। আর ছাত্ররা? না, তাদের কথা না বলাই ভালো। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা স্মরণ করা যেতে পারে। সেকালে যে অজস্র ফিরিঙ্গি স্কুল ছিল 'আরটুন পিট্রাস' স্কুল ছিল তাদের একটি। নিতাই সেন আর অদ্বৈত সেন ছিল সে বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। প্রথম জন ছিলেন কানা, দ্বিতীয় জন খোঁড়া। ব্যাকরণহীন ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ভাষণে এবং অনুরূপ লেখায় তাঁদের দুজনেরই দক্ষতা ছিল।—কিন্তু সামাজিক সম্মান তাঁদের 'ভাঙা ভাঙা' ছিল না। সেখানে তাঁরা পুরোর চেয়েও বেশি পেতেন। শিক্ষায়তন বা সভায় যে খাতির পেতেন, সে না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু সামাজিক উৎসবে?—ঐ কানা-খোঁড়াদের নিয়ে সেখানে যে হুল্লোড় পড়ে যেত তা সত্যিই ঈর্ষাযোগ্য। আর নিজেদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে এঁরাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের চিহ্নস্বরূপ তাঁরা অঙ্গে চড়াতেন কাবা ও চাপকান। পায়ে পরতেন জরীর জুতো। কেউ কেউ আবার গলায় মতির মালাও পরতেন।

এ কালের ইংরেজি নবীশরা হয়ত এ কাহিনী শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু ঐ দীর্ঘশ্বাসই সম্বল।

গগনে গগনে আপনার মনে

পারস্য দেশ। সবে বসন্ত এসেছে। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। গুলবাগিচায় লেগেছে রঙের আগুন। ভ্রমর আর মৌমাছিদের গুঞ্জনে কানপাতা দায়। এদিকে মধু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে সহর্ষ রোমাঞ্চ।

এই বসন্ত সমাগমকে স্বাগত জানাতে এলো নওরোজ উৎসব।

নওরোজ মানে নববর্ষ। সেকালে পারস্যে এর থেকে বড়ো উৎসব আর দুটি ছিল না। সারা বছর ধরে লোকে খোয়াব দেখত এই উৎসবটির জন্য। তাই এ উৎসব এলেই দরিদ্রের কুটীর থেকে আরম্ভ করে বাদশাহের দৌলত-খানা পর্যন্ত সর্বত্র আনন্দের বান ডেকে যেত। উৎসবের দিন দেশ-দেশান্তর থেকে নানা ধরনের লোক আসত। নানারকমের মজাদার জিনিষ ও খেলা দেখিয়ে বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে পুরস্কার নিয়ে যেত।

রাজধানী সিরাজনগরে সেবার বসেছে নওরোজ উৎসব। নানা রঙের নতুন নতুন পোষাক পরে দলে দলে লোক এসেছে। এসেছে বাজীকর আর নানা ধরনের মজার খেলার খেলোয়াড়েরা। স্বয়ং বাদশাহ উৎসুক হয়ে দেখছেন এইসব। মাঝে মাঝে তাদের উৎসাহিত করছেন।

হঠাৎ সেখানে একজন ভারতীয় এসে হাজির। সঙ্গে একটি কাঠের ঘোড়া। সে বাদশাহকে আভূমি কুর্ণিশ করে এগিয়ে দিল কাঠের ঘোড়াটিকে। বাদশাহ ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন, তারপর ভারতীয়টির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ এটি অবিকল ঘোড়ার মতনই দেখতে, কিন্তু তাতে কি? এই নকল ঘোড়া কি দৌড়তে পারে?

ভারতীয়টি বার কয়েক কুর্ণিশ করে বলল, না হুজুর এ ঘোড়া দৌড়তে পারে না, এ কেবল ওড়ে। এ পক্ষীরাজ শাহানসা! যদি ফারমাস করেন, আর গরীবের গোস্তাকি মাপ করেন তবে একবার এ চিড়িয়াকে উড়িয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।'

বাদশাহের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো কৌতূহল। প্রাসাদের সামনে যেখানে বিরাট মাঠে বসেছিল নওরোজের দরবার, সেখান থেকে বেশ

কিছুদূরে একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, আর তার মাথায় ছিল কয়েকটি তালগাছ, বাদশাহ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশত! ওখান থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসো ত!'

ব্যস! কথা ফুরোতে না ফুরোতে কাঠের ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে গেল। আকাশে উড়তে উড়তে এগিয়ে চলল সেই ভারতীয় জাদুকরের আশ্চর্য চিড়িয়াটি।

আমাদের গগন পর্যটনের ইতিহাস এইভাবে আরম্ভ হলে বোধ হয় ভাল হত। কিন্তু তা হয় নি। তাই আমরা কাল্পনিক ছবি এঁকেছি এইভাবে আরব রজনীর আজগুবি রহস্যময়তা মিশিয়ে। না, ওপরের ঐ কাহিনীটি সত্যি নয়, আরব-উপকথার একটি কাহিনীর আরম্ভ।

আমাদের দেশে পুষ্পকরথ আকাশে উড়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই। রূপকথার মতই এ আরেক জগত। কল্পনা এখানে অবাধ।

কিন্তু মজা এই, মানুষ বেশি দিন কল্পনা নিয়ে বসে থাকতে পারে না। তাকে রূপায়িত না করা পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নেই। যেখানে বাধা, সেখানেই দুর্বার হয়ে ওঠে মানুষ। তাই কল্পনা বিলাসের সঙ্গে মানুষের অন্তহীন চেষ্টাও চলল পাশাপাশি। আর সে প্রয়াস রূপকথার থেকেও রোমাঞ্চকর। আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তার একটি ছবি এঁকে গেছেন। সে ছবি এইরকম:

'সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন করে। কথিত আছে তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খৃষ্টাব্দে একটি কাঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খৃষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোমনগর প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিত শাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসীমিন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদভগ্ন হয়। মাম্সবার নিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোড্উইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুতপূর্বক

হস্তপদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্স দে গুজমান নামক একজন ফরাসী দারুনির্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও এই দশা ঘটিয়াছিল।'

গগনভ্রমণের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত হল তা থেকে একথাই মনে হয় যে মানুষ সেদিন ওড়ার অ্যাডভেঞ্চারেই উড়তে চেষ্টা করেছিল, ওড়ার বিজ্ঞান অধিগত ছিল না বলে পাখিকেই অনুসরণ করেছিল আদর্শ হিসাবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু পাখি নয়, তাই তার ব্যর্থতাও ত্বরান্বিত না হয়ে পারে নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ্যাভ্‌ভেঞ্চার গিয়ে ফুরোল দুর্ঘটনায়। কখনো হাত-পা ভাঙল, আবার কখনো বা ঘটল জীবনহানি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হঠাৎ মানুষের কাছে আকাশের দরজা খুলে গেল। আমাদের এই কলকাতায় তখন চলেছে ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমল। কলকাতায় বের হচ্ছে প্রথম খবরের কাগজ, তৈরী হচ্ছে রেসকোর্স, ঠিক সেই সময় সুদূর ইংলণ্ডে সতেরোশ একাশিতে ক্যাভেণ্ডিস সাহেব আবিষ্কার করলেন হাইড্রোজেন গ্যাস। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে।

ওদিকে ফ্রান্স দেশে দুই ভাই জোসেফ আর এটিনে মগোল ফী সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাচ্ছিল। তাদের হাত দিয়েই যে প্রথম আকাশে বেলুন উড়বে তা কে জানত। হঠাৎ একদিন তারা বেলুন ওড়ানোর তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলল। তারপর ঘোষণা করে দিল যে তারা আকাশে বেলুন ওড়াবে।

জুন মাসের পাঁচ তারিখে ঐ বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এলো। ফ্রান্সের ছোট্ট শহর 'এলোন' ছিল প্রথম বেলুন ওড়ানোর ঐতিহানিক স্থান। দুই ভাই জোসেফ আর এটিনে তৈরী করেছিল কাপড়ের বিরাট বেলুন। ভারীও ছিল তেমনি, পাকা সাত মণ। ঐ সাত মণের ভারী বেলুন কেমন করে আকাশে পাড়ি দেয় তা দেখবার জন্য দলে দলে লোক এলো। উঃ, সে লোকে লোকারণ্য! আর সেই লোকারণ্যের মাঝে পৃথিবীর প্রথম বেলুন আকাশে উড়ল। সাত মণের বেলুন ওপরে উঠল সাত হাজার ফিট।

তারপর?—তারপর আর কী! বিষয়টিকে একবার আয়ত্ত করতে পারলে তাকে বার বার দেখানো যায়। তাই মাস তিন গড়াতে না গড়াতে

আবার এই বেলুন সেখানে নয়, একেবারে খোদ প্যারী শহরে। এদিকে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল খবর, বেড়ে গিয়েছিল কৌতূহল। তাই কৌতূহলীরা দলে দলে ভিড় করল। এলো দূর-দূরান্ত থেকে।

প্যারীর ক্যাম্প দ্য মারস' ময়দান লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে উঠল ছাপিয়ে। এদিকে সেদিন আবার আকাশ জুড়ে মেঘ এলো। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! কৌতূহলী জনতা কিন্তু একপাও নড়ে না।—শেষ-বেশ সেই ময়দান থেকে বেলুন উড়লো।—বেলুনটির নাম ছিল 'গ্লোব'। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে বেলুন উড়ল। ভাসতে ভাসতে চলল দূর থেকে দূরান্তরে। পনের মাইল যাওয়ার পর বেলুনটি ফেটে গেল। গোনেস নামক ছোট্ট একটা গ্রামে নেমে পড়ল বেলুনটি।

গোনেশ গ্রামের লোকেরা অতশত জানত না। তারা তো অবাক। আকাশ থেকে ঐ রকম একটা আজব জিনিস নেমে আসতে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট। অনেকে চেঁচামেচ আরম্ভ করে দিল। কেউ গিয়ে বেলুনের গায়ে খোঁচা মারল, কেউ লাঠি, আবার কেউ পালাল দৌড়ে। শেষে একজন বন্দুক ছুঁড়ল। পাদ্রীরা এসে বলল, এ এক অলৌকিক জীব, সুতরাং—

বেলুনের নাটক এইভাবে দেখতে দেখতে জমে উঠল। গগনে গগনে আপনার মনে আরম্ভ হয়ে গেল বেলুন নিয়ে খেলা। ঐ বেলুনে চেপেই ইউরোপীয়রা একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হল। আরো পরে দেশান্তরে পাড়ি জমাল। এমন কি বছর দশের ভেতরে সতেরোশ তিরানব্বই সালে কাটল নামে এক ক্যাপ্টেন বেলুনে করে সৈন্য বহন করল অষ্ট্রীয়ানদের বিরুদ্ধে। মোটকথা রূপকথার রাজ্যে অথবা আরব রজনীর উপকথায় মানুষ যাকে মনে মনে রেখেছিল, এখন সে সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। দূরদূরান্ত ও দেশ-দেশান্তরের লোক—যারা তখনো এসব আজব ব্যাপার দেখেনি, পারস্যের বাদশাহের মতই তাদের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল কৌতূহল। এবং তারা নয়ন সার্থক করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

আমাদের কলকাতাবাসীদের অবস্থা ঠিক দাঁড়ল অনুরূপ। তখন বাবুদের গৌরবের দিন চলেছে কলকাতায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগ কেটে গেল। হারমনিক ট্যাভার্নে সম্ভ্রান্ত। কলকাতা বিদায় অভিনন্দন জানাল তাকে। তারপর যুগ গড়াতে গড়াতে চলে এলো একেবারে অকল্যাণের রাজত্বে। ইতিমধ্যে শহর কলকাতার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। কর্নওয়ালিশের

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্বে নিয়ে এলো বিপ্লব। স্তর উইলিয়ম জোন্স মারা গেলেন। রিচার্ড বারওয়েলের খিদিরপুরের বাড়ী বিকিয়ে গেল। তেরো লক্ষ টাকা খরচ করে লাট প্রসাদ তৈরী হল। পুরনো ফোর্ট ভেঙে সরিয়ে ফেলা হল। প্রথম কলের জাহাজ চলল বাংলাদেশের নদীপথে। রাজা রামমোহন রায় চললেন বিলেতে, আর তারপর একদিন অকল্যাণ্ড সাহেব এলেন বাংলাদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে।

সেবার আঠারোশ ছত্রিশ সাল। কলকাতার বাবুরা বুলবুলির লড়াই দেখে, পায়রা উড়িয়ে বাঈজীদের নাচের আসরে তুড়ি দিয়ে এবং ইয়ার-বকসিদের নিয়ে বাগানবাড়ির বিলাসে গা এলিয়ে দিয়েও যখন বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছে না, তখন রবার্টসন নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে এসে দেখা দিলেন কলকাতায়। তিনিই প্রথম কলকাতায় বেলুনের রোমান্স নিয়ে এলেন।

রবার্টসন সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে তার নামে যে শহরটি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সে খবর পাওয়া যায়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এর আগে তিনি যোলবার উঠেছিলেন। সুতরাং এ লাইনে একবারে তিনি পেশাদারী ছিলেন বলেই অনুমান করা যেতে পারে। যাইহোক তিনি এসে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বেলুন নিয়ে আকাশে উড়বেন। অবশ্য এ অভিনব দৃশ্য দেখাবার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দাবী করলেন চাঁদা।

সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে চাঁদা উঠে গেল। সেকালের কলকাতায় হুজুগে বাবুর কোনো অভাব ছিল না। বেড়ালের বিয়েতে যাঁরা লাখ টাকা খরচ করেন, তাঁরা কি বেলুনবাজিতে টাকা দিতে অকৃপণ হতে পারেন?

সেদিন বুধবার। চৈত্র মাসের প্রায় মাঝামাঝি। কলকাতায় ভরা বসন্ত। আমের বোলে মৌমাছিদের ভিড়। শিমুল-পলাশ পরেছে আগুনের পোষাক। গাজনের সন্ন্যাসীরা শিব সেজে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে।—এই সময় নতুন ভিড় দেখা গেল মুচিখোলাতে। ভীষণ ভিড়। কাগজঅলারা লিখল মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধকরি এ প্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই বিশাল জনতার একাংশ এলো গাড়ি করে, তাদের ঘোড়ার খুরে খুরে কলকাতার পথে ধুলোর ঝড় উঠল। কোনো কোনো রসিক লোক এলেন পালকি করে। পালকি-বেহারাদের বিচিত্র শব্দে

মুখর হয়ে উঠল কলকাতার পথ। ওদিকে নদীতেও নৌকা ভাসল। মাহেশের স্নানযাত্রায় অথবা ঘোষ পাড়ার মেলা দেখতে বাবুরা চিরকালই গা ভাসিয়েছেন নৌকা-বিলাসে! সুতরাং বেলুন-বিহারেও তা বাদ থাকে কেন? —আর এদিকে পয়দালে যারা গেলেন তাঁদের কথা না তোলাই ভালো। তাঁদের সংখ্যা অজস্র।

যদিও এ উৎসব পারস্যের নওরোজ উৎসব নয়, কিন্তু দর্শক বাবুদের পোশাকের বাহার, আর জনতার কৌতূহল তাকে এনে দিল নরওরোজের মহিমা। বাবুরা প্রত্যেকেই হয়ে গেলেন এক একজন বাদশাহ। তাঁরা বারবার রুমাল ঝাড়া দিলেন, আর গোঁফে দিলেন তা।

যাইহোক এদিকে যথাসময়ে বেলুন উড়ল আকাশে। নির্মল নীল আকাশ। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। রবার্টসন সাহেবও বেলুনের সঙ্গে উঠলেন। বাবুরা রুমাল নাড়লেন, রবার্টসনও হাত নাড়লেন। তারপর বেলুনের সঙ্গে ভেসে চললেন সাহেব। বেলুন ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকল। ওপর থেকে আরো ওপরে। তারপর ভাসতে ভাসতে চলল দক্ষিণ দিকে।

এইভাবে দেখতে দেখতে কতক্ষণ যে কেটে গেল কারো হুস ছিল না। অধীর আগ্রহে রুদ্ধনিঃশ্বাসে লোক তাকিয়ে রইল হাঁ করে।

তারপর হঠাৎ কী যেন কোথা থেকে ঘটে গেল। ভেসে চলা বেলুন নামতে আরম্ভ করল সোঁ সোঁ করে। মনে হল যন্ত্র বুঝি বিকল হয়ে গেছে। মুহূর্তের ভেতর মেলাতে শোরগোল পড়ে গেল। কোথায় বেলুন নামেছে দেখবার জন্য কৌতূহলীরা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল।

তারপর? তারপর জোর শোরগোল পড়ে গেল। না, সাহেবের কোনো উদ্বেগ-আশঙ্কা ছিল না। কেননা তিনি নেমে এসেছিলেন নির্বিঘ্নে। এখন লোকের মুখে মুখে কেবল একটি মাত্র প্রশ্নই ঘুরে বেড়াতে থাকল, এবং সে প্রশ্নটি হল বেলুন যাত্রায় সাহেব এইভাবে ইতি টানলেন কেন? এ কী কোনো যান্ত্রিক গোলোযোগ না সাহেবের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? —'ঊর্ধ্বে উঠিয়া কি কারণ বেগে পতিত হইল?'

কেউ বলল, বেলুনের চাঁদায় সাহেব খুশি নন, তাই সাহেব নেমে পড়েছেন তাড়াতাড়ি। যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান তাঁরা বললেন, না না, তা হবে কেন? উত্তরের বাতাসে সাহেব যেভাবে দক্ষিণে যাচ্ছিলেন, সেটাই ছিল ভয়ের ব্যাপার। সাহেব বোধহয় সামনে সমুদ্র দেখতে পেয়ে ভয়ে নেমে

পড়েছেন। কোনো কোনো ঠোঁটকাটা মন্তব্য করল, নারে বাপু না, কলকাতার লোকদের অনেক টাকা কিনা, সেই টাকা হাত করবার জন্যে সাহেব এই কল করেছেন!'

এইভাবে সেকালের নেটিবেরা নানারকম আলোচনা করতে করতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এলেন বাড়ী। একটু পরেই সন্ধ্যা নামল। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো।

মশালচীরা কোনো কোনো বাবুর পালকি পথ আলো করে পৌছে দিয়ে গেল। তারপর শেয়ালের ডাকে ধীরে ধীরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

কিন্তু না, গোটা রাতটাও বাবুদের বিষণ্ণ থাকতে হল না পরের দিনই কাগজ-অলারা সাড়ম্বরে ঘোষণা করল: আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রবার্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠ হইতে পুনরায় বেলুন যন্ত্রে উর্ধ্বে গমন করিবেন। আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।"

এর পরে কলকাতায় এই বেলুন ওড়ানো রীতিমত নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

আরো অনেক বিদেশীরা টাকা রোজগারের ধান্দায় এই কলকাতায় পাড়ি জমালেন। যে রবার্টসন সাহেব এখানে প্রথম বেলুন ওড়ানোর দাবী করতে পারেন, তিনি বছর দুই পরে এই কলকাতাতেই দেহ রাখলেন। বেলুন ওড়ানোর জন্য সেকালে চব্বিশ হাজার টাকা খরচে তিনি যন্ত্র কিনেছিলেন তিনটি। সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি নীলামে বিক্রী হয়ে গেল এবং ঐ যন্ত্র তিনটিও। তবে যন্ত্র তিনটি বিক্রয় হল মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। কে বা কারা ঐ যন্ত্রগুলি কিনেছিল তা জানা যায় না। তবে সে যন্ত্র যে বেলুন-ওড়ানোতে ব্যবহৃত হয় নি তা ঐ দামের বহর দেখেই অনুমান করা যায়।

এদিকে কলকাতার আকাশ কিন্তু তাই বলে বেলুনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত রইল না। এক সাহেব যান, আসেন আরেক সাহেব। কাইট নামে এক ইংরেজ সাহেব কলকাতার বাবু মহলে রীতিমতো নাম করে ফেললেন। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত তাকে নিয়ে লিখলেন একটি কবিতাও। লিখলেন:

এ আবার কোথা হতে আইল 'কাইট?'
নাহি বলে, বলে চলে কলের 'কাইট'।
মর্তলোকে শব্দ করে, 'কাইট, কাইট॥'

শুধু সাহেবের কথা নয়, কবিতায় মুখ্য বক্তব্য হল বেলুন। এই বেলুন কবল আকাশেই ওড়েনি, উড়েছিল কলকাতাবাসীর মনেও। বুলবুলির লড়াই দেখে, রেসকোর্সে ঘোড়ার দৌড় দেখে যে লোক আনন্দ পায়নি, এমন ক ঘুড়ি উড়িয়েও না, সেই আনন্দ ও সেই সুখ লোকে খুঁজে পেয়েছিল বলুন যাত্রায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সেই উদ্বেলিত আনন্দেরই প্রকাশ—

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস॥
সাবাস্ সাবাস তার কিছু নাই ভয়।
যত ওঠে তত মনে সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত করে হই হই।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই॥

বেলুনকে নিয়ে বসল সুখের হাট। এই সুখের হাটে সকলেই আসে। আকাশের রোমান্স দিয়ে অবকাশ ভরিয়ে নেন কলকাতার সাধারণ মানুষেরা। এদিকে দেখতে দেখতে গড়িয়ে চলল সময়। হিন্দু কলেজের থেকে বিপ্লবী ছেলেরা বেরিয়ে এলেন একে একে। এঁদের ভেতর কেউ বক্তৃতা দিলেন, কেউ কবিতা লিখলেন, আবার কেউ বা মন দিলেন সমাজ সংস্কারে। ওদিকে সিপাহী বিদ্রোহে সারা ভারত জুড়ে প্রবাহিত হল রক্তস্রোত। নীল হাঙ্গামা সোনার বাংলাকে করে দিল ক্ষতবিক্ষত। এই সব বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটে যায়, কখনো আতঙ্কে, কখনো কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে মন, বেলুন কিন্তু ঠিক উড়ে চলে। ময়দানে ঠিক জনসমাবেশ হয়, আর বেলুনবাজ সাহেবেরা ভেসে চলেন বেলুনে—

কেহ বলে দেখিতেছি, ওই ওই, ওই।
কেহ বলে, ওই বটে, কেহ বলে কই॥
কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হোলো চাঁদ সই॥

এইভাবে কালের নদীতে ভাসতে বাংলা দেশ এসে পৌঁছুল হিন্দুমেলার আমলে। বেলুন-বাজ স্পেনসার সাহেব সেদিন দাপটের সঙ্গে উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন বেলুন।—কলকাতার বেলুন ওড়ানোর ইতিহাসে পার্সিভাল-স্পেনসারের নাম চিরকাল লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। গাড়ের মাঠে হাজার

হাজার লোকের সামনে তিনি উড়িয়ে দিতেন বেলুন। তারপর নেমে আসতেন প্যারাসুটে করে।—সেকালে এই নিয়ে একটি বই পর্যন্ত লিখিত হয়েছিল। বইটির নাম, 'পার্সিভেল-স্পেনসার ও গড়ের মাঠে বেলুন।' বেলুনের রোমান্স কোনো কোনো নাট্যকারকে রোমন্টিক নাটক রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং একজন লিখে ফেললেন, 'বেলুনে বাঙালী বিবি।'

এদিকে হিন্দুমেলার কল্যাণে তখন জন্ম নিচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ। চারদিকে ন্যাশানাল চিন্তার ছড়াছড়ি। আমাদের জাতীয় পোশাক কি নেই?—এই নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রকাশিত হল ন্যাশানাল পেপার, প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশানাল থিয়েটার, এবং শেষে হল ন্যাশানাল সার্কাস। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এই ন্যাশানাল যুগের প্রবর্তক। তাই কেউ কেউ কৌতুক করে তাঁর নাম দিয়ে বসল, 'ন্যাশানাল নবগোপাল।'

যাই হোক, শেষবেশ ঐ ন্যাশানাল চিন্তা বেলুনে গিয়েও ঢুকে পড়ল। আর এ ব্যাপারে যিনি উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন, তিনি বিখ্যাত বাঙালী অ্যাডভেঞ্চারিস্ট রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পদব্রজে পৃথিবী পর্যটন করার প্রথম কৃতিত্ব যেমন বাঙালী হিসেব দাবী করতে পারেন উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তেমনি প্রথম বেলুন বিলাসের নায়ক হলেন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামচন্দ্রের আর্থিক সামর্থ্য তেমন ছিল না। তাই তাঁর ঐ ব্যোমপ্রিয়তার জন্য হাত বাড়াতে হল বিখ্যাত ধনী গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গোপাল টাকা দিলেন। সেই টাকাতে থান থান তসর গরদ কেনা হল তারপর কেটে তৈরী হল বেলুন। ঐ বেলুনে গ্যাস ভরে ওড়ান হল। রামচন্দ্র সেই বেলুনে উঠে উড়ে বেড়ালেন। তবে ওই ওড়ার ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। একটি সুদীর্ঘ ও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল ঐ ব্যোমযানটিকে, যাতে গগনবিহার করতে করতে বেলুনটি নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে না যায়।—যাইহোক বাঙালীরা এইটুকু দেখেই বেজায় খুশি। চিরকাল সাহেবরাই এ সব কাণ্ড করে এসেছে, দেশীয় লোকেরা যে এ খেলায় সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে তা কি কেউ ভেবেছে? —তাই রাজ্য জয়ের গৌরব নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে নেটিবরা সেদিন ঘরে ফিরলেন।

ওদিকে নেটিবদের এই স্পর্ধা দেখে সাহেবদের চোখ টাটাল। তাঁরা গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'বটে!'—তাই পাল্টা জবাব দিতে তাঁরা আর দেরী করলেন না। গড়ের মাঠে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন খোলা বেলুন।

ঐ বেলুন উড়ে চলল 'গগনে গগনে আপনার মনে।' তারপর নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে যাবার আগেই বেলুনবিহারী সাহেব ঝাপ দিলেন প্যারাসুট খুলে। ধীরে ধীরে গড়ের মাঠে নেমে এলো প্যারাসুট, আর সাহেবদের জয়োল্লাসে সারা কলকাতা ফেটে পড়ল। নেটিবরা কিন্তু সেদিন কালো মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল।

কোথায় সুদূর ফ্রান্স, আর কোথায় এই কালা নেটিবদের কলকাতা! বেলুনবিহারের বিজয়বৈজয়ন্তী দেখে খুশি ছিল লোকে, কিন্তু সেটা যে এমন ভাবে সাদা ও কালো নেটিবদের প্রতিযোগিতার খেলায় দাঁড়িয়ে যাবে তা কে জানত ?—অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট রামচন্দ্রও জানতেন না যে এটি মর্মপীড়ার কারণ হবে।

তবে সেদিন ন্যাশানাল হাওয়া অত্যন্ত প্রবল। নিজের জীবনের থেকেও বড়ো তখন জাতীয় সম্মান। তাই উদ্দীপ্ত হতে রামচন্দ্রের আর দেরী হল না। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে খোলা বেলুনের খেলাই তিনি দেখাবেন। তারপর প্যারাসুট খুলে নামবেন যেমন সাহেবরা নামে।

ব্যস, রামচন্দ্রের এই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত। লোকের মুখে মুখে যথাসময়ে এ খবর গিয়ে পৌঁছুল সাহেব-টোলাতেও। সাহেবরা সমান কৌতূহলী হয়ে উঠলেন নেটিবদের মতন। তরপর শহর কলকাতা এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় রইল অধীর অগ্রহে।

না, এবার গড়ের মাঠে নয়। নারকেলডাঙ্গায় যেখানে গ্যাস তৈরী হত সেখানকার ময়দান হল বেলুন ওড়ানোর জায়গা। হাজার হাজার লোক জমা হতে থাকল সেখানে। কলকাতায় প্রথম বেলুন ওড়ানোর দিন যেমন হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। শুধু কালা নেটিবরা নয় সাদা সাহেবরাও এলেন। অনেকেরই হাতে দূরবীণ। আমাদের দেশী লোক সেদিন ঐ ভিড়ের 'জনগণমন অধিনায়ক', এ কি কম গৌরবের কথা ?

এবারও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের টাকাতেই তৈরী হয়েছিল বেলুন। অনেক অনেক টাকা খরচ করেছিলেন তিনি। যথা সময়ে সেই মহামূল্যবান বেলুন আকাশে উড়ল। রামচন্দ্র ঐ বেলুনে সমাসীন। প্রথমের দিকে বেলুনটি ছিল দড়ি বাঁধা। সেই সুদীর্ঘ শক্ত দড়িতে আটকানো। কথা ছিল রামচন্দ্র ইশারা করে রুমাল নাড়লে দড়ি কেটে দেওয়া হবে। হলোও তাই। কিছুদূর বেলুনটি ভেসে চলার পর রামচন্দ্র রুমাল নাড়লেন। ব্যস, সঙ্গে

সঙ্গে খটাস করে দড়ি কেটে দেওয়া হল। এর পর বেলুন ওপরে উঠতে আরম্ভ করল।—কখনো হেলে-দুলে আবার কখনো বা শোঁ-শোঁ করে ওপরে ওঠে বেলুন। কে একজন ভিড়ের ভেতর থেকে টিপ্পনী কেটে মন্তব্য করে—

হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চলিয়াছে মেঘের উপরে।

এদিকে সত্যি সত্যিই মেঘের ওপরে বেলুন ভেসে চলে। আর স্তব্ধ বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে সকলে তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে। মনে মনে ভাবে, এইবার বুঝি রামচন্দ্র প্যারাস্যুট হাতে লাফ মারবেন বেলুন থেকে। কিন্তু তা আর হয় না, আরব রজনীর গল্পের মতন রক পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যেন রামচন্দ্রকে। ভিড়ের ভেতর বিজ্ঞান-জানা এক সাহেব ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'না, রামবাবু আর নামতে পারবেন না। এখন তিনি একেবার কোল্ড ওয়েভের ভেতর চলে গেছেন। ওখানে গেলে কেউ জীবন্ত ফিরে আসে না।'

এসব কথা শুনে কালো নেটিবদের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল। কেউ কেউ হায় হায় করে উঠল। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অত টাকার বেলুন তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রও গেলেন?

কৌতুহলীরা চোখে দূরবীন এঁটে অধীর আগ্রহে ওদিকে তাকিয়ে আছেন—এক সময় হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন রামবাবু লাফিয়ে পড়েছেন বেলুন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি খেয়ে ভারমুক্ত বেলুনটা আরো ওপরে উঠে গেল, আর রামবাবু পাক খেতে খেতে নীচে নামতে থাকলেন। শূন্যে এক একটি পাক খান, আর নেমে আসেন একবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত এইভাবে বার কয়েক পাক খাবার পর প্যারাস্যুট গেল খুলে।—ত্রেতাযুগের রাবণবিজয়ী রামের মতই রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পুষ্পক রথ থেকে নেমে আসতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

এদিকে সারা মাঠ জুড়ে লেগে গেল হৈ চৈ। সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে, রুমাল উড়িয়ে টুপি উড়িয়ে দু' হাত তুলে নাচতে থাকল। আর ঘন ঘন জয়ধ্বনি পড়ল -জয় রামবাবুকী জয়! সাহেবরা এ দৃশ্য দেখে একে একে কেটে পড়লেন।

প্যারাস্যুটের সঙ্গে রামবাবু মাটিতে নামতেই, সকলে তাঁকে ঘিরে ধরল।

কেউ তাঁকে হাওয়া করতে থাকল আবার কেউ বা ভিড় ঠেলে এগিয়ে দিল শরবৎ।

এবার একটু সুস্থ হওয়ার পর কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল: 'কী ব্যাপার? বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়তে এত দেরী করলেন কেন? বুঝতে পারেন নি বুঝি রামবাবু?'

রামবাবু জিব কেটে বললেন, 'না না, ওসব না। বুঝতে ঠিকই পেরেছিলাম। কিন্তু যতবারই লাফিয়ে পড়বার জন্যে দড়ি ধরতে যাই, মনের ভেতরটা কেমন যেন হয়ে ওঠে। হাত সরিয়ে নি।'

'তাই নাকি? তারপর?'

তারপর আর কি! যখন দেখলুম বেলুন উঠতে উঠতে এত ওপরে উঠে গেছে যে আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না, তখন সাহসে ভর করে 'জয় মা' বলে লাফিয়ে পড়লুম।'

না, ওর পরে আর কোনো কাহিনী নেই। গগনে গগনে খেলার একটি পর্ব এখানেই শেষ হল। পরে অবশ্য আকাশের দরজা অন্যভাবে খুলে গেল। তার ইতিবৃত্ত অন্য ধরনের, সুতরাং বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে বহুকাল ধরে মানুষ যে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নকে বেলুনই প্রথম বাস্তবে রূপায়িত করে, তাই প্লেন-জেট-রকেট-হেলিকপ্টার যতই আসুক না কেন বেলুনের রোমান্সকে মানুষ বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আর সেই সঙ্গে বাঙালীরা বোধহয় রামবাবুকেও না। আগেই বলেছি এই রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায়, এর পরেই তিনি সঙ্কল্প নিয়েছিলেন বাঘের সঙ্গে লড়াই করবার। যে-সে বাঘ নয়, একবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে।

যে কথা, সেই কাজ। পাথুরেঘাটার রাজবাড়িতে কোথা থেকে তিনি একটি কেঁদো বাঘ জোগাড় করে আনলেন। তারপর দেখালেন খেলা। রামচন্দ্র ঘোষণা করলেন, 'সাহেব বেটারা আর কী খেলা দেখায় বাঘের পাশে দুটো বন্দুক নিয়ে লোহার খাঁচার ভেতর। আমি খেলা দেখাব একবারে খোলা উঠোনে।'

হ্যাঁ, দেখালেনও তাই। খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হল বাঘ। চড়-চাপড় ঘোঁষাঘুষি মেরে বাঘকে বসে আনলেন রামচন্দ্র। তারপর প্রহার দিয়ে পুরে দিলেন খাঁচায়।

যাই হোক, এই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষটি একবারে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হন। সোজা চলে যান হিমালয়ে। তারপর সেখানে তপস্যা করতে করতেই একদিন দেহত্যাগ করেন।

কোথায় আকাশ আর কোথায় সন্ন্যাস! বাইরে কোথাও মিল নেই। তবে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় কোনো সাদৃশ্য আছে! তাই মহাশূন্যের রহস্য যে জেনেছে, সে শেষ পর্যন্ত মুক্তজীবনের দীক্ষা না নিয়ে কি পারে?—'গগনে গগনে আপনার মনে' এ আরেক খেলা! বেলুনবিজয়ী রামচন্দ্র সেই খেলাই খেললেন।

গোল দীঘির কলেজ ও উইলসন সাহেব

কোথায় লণ্ডন শহরের 'সোহো স্কোয়ার' আর কোথায় আমাদের গোল দীঘি! এ দুয়ের যে কথনো যোগাযোগ হতে পারে, তা কি কোনোদিন কেউ ভেবেছে?—না, উইলসন সাহেবও ভাবেন নি।

'সোহো স্কোয়ারে'র কৃতী ছাত্র হোরেস হেম্যান উইলসন সত্যি সত্যিই কথনো চিন্তা করেন নি যে তাঁর নাম একদা শহর কলকাতার গোলদীঘির কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে নিবিড়ভাবে। তাঁর দেশেরই এক নিষাদ যথন ঐ ছায়াঘেরা শান্ত সরোবরের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রটির দিকে শরসন্ধান করবে, তথন সরোবরবিহারী হংসকুল প্রাণরক্ষার্থে তাঁরই কাছে কাতর প্রার্থনা জানাবে, ভবিষ্যতের এ ছবি উইলসন সাহেব চোথের সামনে কথনো দেখেন নি। কথনো না।

পেশায় ডাক্তার ছিলেন উইলসন সাহেব। সোহো স্কোয়ারের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে, ডাক্তারি পড়তে ঢোকেন সেণ্ট টমাস হাসপাতালে। সেথান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করে ঢুকে পড়লেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মেডিক্যাল সার্ভিসে। আর সেই সূত্রেই কলকাতায় এসে হাজির হলেন আঠারোশ আট খ্রীষ্টাব্দে।

তথন লর্ড মিণ্টোর আমল। শহর কলকাতা নোংরা আবর্জনায় তথন ভর্তি। রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো নর্দমা। মশা মাছির উৎপাতে টেকা দায়।—শহরের ভেতর না আছে কোনো স্কুল, না কোনো কলেজ। সুতরাং মনের অন্ধকার বা আবর্জনা আরো বেশী।—বাইশ বছরের তরুণ উইলসনের পক্ষে কলকাতার অভিজ্ঞতা যে খুব মনোরম হয়েছিল তা কথনোই বলা চলে না।—তবু কলকাতার প্রেমে পড়ে গেলেন সাহেব। এত দোষ থাকা সত্বেও ভালোবেসে ফেললেন তাকে।

হোরেস হেম্যান উইলসনের প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সুনিবিড়। ফলে অতি তাড়াতাড়ি সংস্কৃত শিথে ফেললেন। এদিকে রসায়নবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞানেও তাঁর দক্ষতা ছিল সুবিদিত।

কলকাতা ট্যাঁকশালের সঙ্গে এই বিদ্যার জন্য অচিরে যুক্ত হয়ে পড়লেন। সোনা-রূপোর বিশুদ্ধতা পরিমাপে তাঁর মত পারদর্শী লোক সেকালের কলকাতায় প্রায় কেউই ছিলেন না। আঠারোশ ষোল সালে তিনি এ বিষয়ে প্রধান পদ অধিকার করে বসলেন এবং যত দিন তিনি এ দেশে ছিলেন ততদিন ট্যাঁকশালের এ পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

এদিকে প্রায় বাইশ বছর ধরে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন উইলসন সাহেব। এদেশে আসবার পর পাঁচ বছরের ভেতর মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করলেন। প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক তাঁর গবেষণাগ্রন্থ অনেক। তাঁর লেখা সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান আজো সর্বোত্তম বলে বিবেচিত।—এদেশে তিনি প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর ছিলেন এবং এই সময়ে শহর কলকাতার সমাজ সংস্কৃতিতে বা নাগরিক চেহারায় বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। আজ আমরা যাকে ইতিহাস বলি, সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সেদিন ঘটেছিল চোখের সামনে। একেকটি ঘটনা ঘটেছে, আর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। রামমোহন-রাধাকান্ত দেবকে তিনি চোখের ওপর বিকশিত হতে দেখেছেন। হিন্দু কলেজের জন্ম, সংস্কৃত কলেজের সৃষ্টি বা ব্রাহ্মধর্মের উত্থান এ সব ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল কম ছিল না। নেটিভদের শিক্ষার জন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং ইংরেজি সাহিত্যকে যখন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, সে সময় তিনি কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশানের সম্পাদক ছিলেন। আর নিয়মিত তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে যেতেন।

গোলদীঘির ধারে সংস্কৃত কলেজ। ভারী সুন্দর পরিবেশ। পটলডাঙার এদিকটা প্রায় ফাঁকা ফাঁকা। দীঘির ধারে নানা গাছগাছালি। ঝিরঝিরে বাতাসে প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়। সাহিত্য শাখার অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নানা রসিকতায় এবং সুন্দর সুন্দর শ্লোক বলে আসর জমিয়ে রাখতেন। আঠারোশ চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংস্কৃত কলেজ। সেই গোড়া থেকেই তর্কালঙ্কার মশাই এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।—প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ আরেকজন অধ্যাপক। তাঁকেও উইলসন সাহেবের খুব ভালো লাগত। তিনিও খুব রসিক।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে।

প্রকৃতপক্ষে এঁদের হাত ধরেই চিকিৎসক উইলসন সংস্কৃত রসশাস্ত্রের স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেলেন। ছায়া উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে কলকাতার

আকাশে যেদিন মেঘ ভেসে আসত, সেদিন কালিদাসের মেঘদূতের কথাই তাঁর মনে পড়ত। সেক্‌সপীয়ার বা মিলটনের কথা নয়। আর নায়িকা বলতে তিনি, অলকার সেই বিরহিণী যক্ষবধূর ছবিই চোখের সামনে দেখতে পেতেন।—'বিষ্ণুপুরাণ' পড়তে পড়তে একদা তিনি ডুব দিয়ে ছিলেন অতীত ভারতে। আর অতীত দিনের ভারতে হাঁটতে হাঁটতে তিনি 'ঋক-বেদ'কে খুঁজে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটিকে তিনি ইংরেজী পাঠকদের কাছে ধরে রাখবার জন্য মাতৃভাষায় অনুবাদ করে ফেললেন।

উইলসন সাহেবের মনটি ছিল খুব কোমল। তিনি যাকে ভালোবাসতেন, তাকে প্রাণমন দিয়েই ভালোবাসতেন। সংস্কৃত ভাষাকে ভালোবেসে গোল দীঘির এই মহাবিদ্যালয়টিকেও ভালোবেসে ফেললেন। না, ঐ ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। সংস্কৃত কলেজের যাতে উন্নতি হয়, তাঁর-জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।—প্রায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটিয়ে আঠারোশ বত্রিশ সালে সাহেব দেশে ফিরে গেলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতই দেখে গেলেন।

ওদিকে দেশে গিয়ে অক্‌সফোর্ডের 'বোডেন' প্রফেসারের পদ অলঙ্কৃত করলেন। অর্থাৎ স্বদেশেও তিনি সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন অবারিত। বছর তিনেক পরে ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিয়ান হয়ে এই পড়াশোনার আরো সুযোগ পেয়ে গেলেন বেশি করে। সেদিন হোরেস হেমান উইলসন সত্যি সত্যিই সুখী। এবং খুশিও।

কিন্তু কে জানত কলকাতার আকাশে কালো মেঘ জমেছে? কে জানত ঘন ছায়া নেমে আসছে গোলদীঘির ঐ কলেজটির ওপর?—আর যার সঙ্গে উইলসন সাহেবের আত্মিক বন্ধন, সেখানে কোনো আঘাত এলে, সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে বসেও তিনি কী নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন?

এ-অঘটন ঘটল সংস্কৃত কলেজের বয়স যখন এগারো। এবং এর জন্য যিনি দায়ী, সেই নিষাদের নাম হল টমাস ব্যারিংটন মেকলে। উইলসনের মত ভেজা নরম মন তাঁর ছিল না। ছিল না ভারত-প্রেমের কোনো রঙিন বাষ্প তাঁর হৃদয়ের ভেতর। বরং ছিল তাঁর শাসনের উগ্র মেজাজ। ভালো চাকরি-বাকরি করে দু-হাত ভরে রোজগার করবেন, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

আঠারোশ তেত্রিশ সাল পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেকলের সে-আশা পূর্ণ হয়নি।

তেত্রিশ বছরের যুবক মেকলে হতাশায় ভেঙে পড়ে ঐ তেত্রিশ সালেই তাঁর বোনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'জীবনে কলম চালিয়ে দু'শো পাউণ্ডের বেশি কখনো রোজগার করিনি। সুতরাং ধরেই নিতে পারো আমাদের পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ আগের থেকে অনিশ্চিত।'

আইন সচিবের কাজ পেয়ে পরের বছরেই সাহেব এসে হাজির হলেন এদেশে। জাহাজে এলেন। এসে নামলেন মাদ্রাজে। তখন জুন মাস। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস। কলকাতার আকাশে ঝড়-বাদল লেগেই আছে। লাটসাহেব উইলিয়ম বেন্টিক সেবার সেই সময় বেড়াতে গেছেন উটথামণ্ডে। মেকলে সাহেব তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হলেন। অর্থাৎ মাদ্রাজ থেকে সোজা উটথামণ্ডে। বর্ষাটা ওখানে কাটিয়ে শরতের এক আলো-ঝলমল দিনে হাজির হলেন এসে কলকাতায়। আজ যেখানে বেঙ্গল ক্লাব, চৌরঙ্গীর ওপর সেই বাড়িটায় রাজকীয় ঐশ্বর্যে সংসার ফেঁদে বসলেন—

কলকাতা মেকলের কাছে হল কামধেনু। সেই কামধেনুকে হস্তগত করে সাহেব ভারি খুশি। আইন সচিবের কাজ পেয়েই তিনি বোনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—দশ হাজার পাউণ্ড হল আমার বার্ষিক মাইনে। যারা কলকাতার খবরাখবর ভালো রাখে এবং সর্বোচ্চ সমাজে যাদের চলাফেরা, তাদের কাছে জানলাম যে, পাঁচ হাজার পাউণ্ড বছরে খরচ করলে কলকাতায় রাজার হালে থাকা যায়। বাকি বেতন সুদ সমেত জমানো চলে। সুতরাং আশা করা যায়, উনচল্লিশ বছর বয়সে পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে হাজার তিরিশ পাউণ্ড পকেটে করে ফিরতে পারব। এর বেশি অর্থ আমি চাই না।

এই হল মেকলে সাহেবের পরিচয়। নিজের দেশ সম্পর্কে তাঁর সাংঘাতিক অহংকার। আর এদেশ সম্পর্কে ছিল তার এর থেকেও অবজ্ঞা। সুতরাং তার কাছ থেকে আমরা কী পাবো, তা সহজেই অনুমেয়।

মেকলে যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখন এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কী রকম হবে, তা নিয়ে খুব জটিলতা ছিল। একদল ছিলেন প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী, আরেকদল চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা। আবার কেউ কেউ এর মাঝামাঝি পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন।

এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'কথা উঠিয়াছিল

এ-দেশীয়দিগকে কোন রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। উভয় দলেই প্রায় সমসংখ্যক ব্যক্তি, সুতরাং কোন মতই নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় না কাজকর্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল।'

অবশ্য এর আগেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছ সংস্কৃত কলেজ। আঠারোশ তের সালের চার্টার অনুসারেই তা হয়েছে। তেত্রিশে এসে ব্যাপারটি ভীষণ জট পাকিয়ে গেল। শিক্ষা খাতে অনেক টাকা মঞ্জুর হল, কিন্তু কীভাবে তা ব্যয়িত হবে?—হোরেস হেমান উইলসন বা ভারতবন্ধু জেমস প্রিন্সেস প্রমুখ শিক্ষাবিদরা ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে। আরেক দিকে ইংরেজি-ওয়ালারা। মোট কথা, আসর বেশ জমে উঠেছিল।

উইলসন দেশে ফিরে যাওয়াতে কমিটিতে একটু পরিবর্তন হল। আর বেন্টিঙ্ক সাহেব মেকলেকে যেদিন এই জট খোলবার দায়িত্ব দিলেন, সেদিন পাল্লাটা বিপরীত দিকেই ভারি হয়ে গেল। অর্থাৎ ইংরেজি-ওয়ালাদের হল জয়-জয়কার।

আত্মগর্বী মেকলে সাহেব সেদিন ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে সওয়াল করে সদম্ভে ঘোষণা করলেন, 'এ সিঙ্গল সেলফ অফ এ গুড ইউরোপীয়ান লাইব্রেরী ওয়াজ ওয়ার্থ দি হোল নেটিভ লিটারেচার অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আরেবিয়া।' অর্থাৎ এক সেলফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরব দেশের সাহিত্যে তা নেই।

কালা নেটিভদের চামড়া একটু মোটা। বা বিপরীতভাবে বলা যায়, পরানুকরণপ্রিয়তা নেটিভ চরিত্রে বড়োই প্রবল। মেকলে সাহেবের দম্ভোক্তি তাই আমাদের মনে একটু আঁচড় কাটল না। জ্বালা সৃষ্টি করতে পারল না আমাদের অন্তরে। বরং নব্য বাংলা মেকলের বাণীকে স্বাগত জানিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে আরম্ভ করল। ওদিকে ভারতপ্রেমিক প্রিন্সেপ ও সেক্সপীয়ার রাগে ক্ষোভে মেকলের মন্তব্যে প্রতিবাদ করে কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। —আর মেকলে গিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। সভাপতি হয়ে গেলেন পাবলিক ইন্সট্রাকসন কমিটির। এবং এর পর থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'এ-দেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের রাজ্য আরম্ভ হইল।'

শিক্ষার রাজ্য পেয়ে রাজা মেকলে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর প্রথম কোপদৃষ্টি গিয়ে পড়ল গোলদীঘির ঐ কলেজটির ওপর। যে সরোবরে

মাছ নেই, ধীবর কী তার প্রতি যত্ন নেন? অন্ততঃ সাহেব মেকলে যে সেরকম ধীবর ছিলেন না তাঁর উক্তিই তার প্রমাণ। সুতরাং গোলদীঘির কলেজটি যে উঠে যাবে তাতে আর কোনো সংশয় রইল না। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতসমাজের মাথায় ভেঙে পড়ল আকাশ। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ছিলেন ওঁর ছাত্র। তখন তিনি এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সে বেচারিরও মুখ গেল শুকিয়ে।

জয়গোপাল ছিলেন সকলের থেকে বড়ো। সব থেকে বিচক্ষণ। একদা তিনি কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। পাকা আঠারো বছর তিনি কাজ করেছিলেন পাদরী কেরীর কাছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে তিনিই কীটদষ্ট পুঁথির খোলস থেকে উদ্ধার করে পাঠোপযোগী করে তুলেছিলেন একদা। অন্য কোথাও না, সে বই ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। কেরী-মার্শমানের মতন গোঁড়া পাদরীরা কখনো ভারত-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার করেননি। বরং খুবই শ্রদ্ধার চোখে এদেশের পণ্ডিতসমাজকে তাঁরা দেখতেন।—কিন্তু মেকলে?

গোলদীঘির কলেজের প্রবীণ ও বিচক্ষণ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঐ কলেজটিকে বাঁচাবার কোনো পথ খুঁজে পেলেন না। কোনো মতলবই মাথায় এলো না। ছুটির পর বিষণ্ণ মনেই তাই বড়ি ফিরে যান। যাতায়াত করেন পালকিতে। পালকিতে বসে বসে কতরকমই না ভাবেন। ইংরেজি শিক্ষার আগুন যে কী ভয়ঙ্কর, তা ডিরোজিও সাহেবের চেলাদের দেখলেই বোঝা যায়। আঁচ পাওয়া যায় দক্ষিণারঞ্জন-রসিককৃষ্ণ-কৃষ্ণমোহন-তারাচাঁদকে কাছে পেলে। এঁদের ক্রিয়াকর্ম দেখে একদা একটি শ্লোক লিখেছিলেন, তার লাইনগুলো গড় গড় করে মনে পড়ে যায় তর্কালঙ্কার মশায়ের। মনে পড়ে যায় শেষ দুটো লাইন—

ফিরিঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ ডিরোজিও কুশেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ বিদিগ্ মান বর্জিতাঃ॥

পালকি চলছিল। চলছিল পাড়া কাঁপিয়ে। এই শ্লোকটিকে বারকয়েক আবৃত্তি করেছিলেন জয়গোপাল। আর আবৃত্তি করতে করতে তাঁর মাথায় একটি নতুন ভাবও খেলে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ঘোর বিপদে উইলসন সাহেবের শরণ নিলে কী হয়! সাহেব সেদিন বিলেতে, তা হোক না বিলেতে, চিঠি পাঠাতে আপত্তি কী!—যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ।

সংস্কৃততে শ্লোক রচনা তাঁর ভালোই আসত। সুতরাং তাঁর হৃদয়ের ভার সংস্কৃততেই লাঘব করলেন।

লিখলেন,

অস্মিন্ সংস্কৃত পাঠসদ্মসরসি
ত্বৎ স্থপিতা যে সুধী—
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা
দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি
পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্থান্ যদি পাসি পালক
তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

অর্থাৎ এই সংস্কৃত পাঠশালারূপ সরোবরে আপনি যে সকল সুধীরূপ হংসকে স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আপনি দূরে চলে যাওয়ায় কালবশে তাঁরা এখন পক্ষহীন (পাখা বা দল) হয়ে পড়েছেন। অধুনা এই সরোবরের কাছে কয়েকজন ব্যাধ এসেছেন তাদের উচ্ছেদের জন্য। হে পালক, আপনি যদি তাদের হাত থেকে এঁদের রক্ষা করেন, তবে আপনার কীতি চিরস্থির থাকবে।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মশায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। উইলসন সাহেবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। তিনিও উইলসন সাহেবের কাছে শ্লোক লিখে আবেদন জানালেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মেকলের নাম সোজাসুজি করেননি তাঁর শ্লোকে, প্রেমচাঁদ কিন্তু সে গোপনতা রক্ষা করলেন না। অকপটে সব কথা সোজাসুজি নিবেদন করে লিখলেন,

'গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহু বিটপিতটে
কোলিকাতা নগর্য্যাং
নিঃসঙ্কো বর্ততে সংস্কৃত পঠন
গৃহার্থ্যঃ কুরঙ্গকৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃত
খরোশরো 'মেকলে' ব্যাধরাজঃ
সাশ্রুক্রুতে স ভো ভো উইলসন
মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ।'

এর মর্মার্থ হল, কলকাতা নগরীর গোলদীঘির গাছগাছালি-ঘেরা তটদেশে

সংস্কৃত পাঠগৃহরূপ যে কৃশকায় কুরঙ্গ এতদিন নিঃসঙ্গভাবে বাস করছিল, 'মেকলে' নামে এক সবল নিষাদ তাকে বধ করবার জন্য আজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করেছে। ঐ কুরঙ্গ এখন ভীত হয়ে সাশ্রু নয়নে প্রার্থনা জানাচ্ছে,—ভো ভো মহাত্মন উইলসন, আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

এই করুণ আর্তনাদ এবং বিপন্নের প্রার্থনা যথাসময়ে হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেবের কাছে গিয়ে পৌঁছুল। গোলদীঘির ছবিটি ধীরে ধীরে ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। ভেসে উঠল সোহো স্কোয়ারের ছবিও। সোহোতে তিনি প্রথম বিদ্যাচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন, গোলদীঘিতে পেয়েছিলেন অমৃত-আস্বাদের। একটির ভেতর দিয়ে হোরেস হেম্যান উইলসন পেয়েছিলেন জ্ঞানরাজ্যে ঢোকবার চাবিকাঠি। অন্যটির মাধ্যমে সুযোগ পাওয়া গেল সংস্কৃত রসশাস্ত্রের বিশাল মহাসাগরে অবগাহন করবার।

রসতীর্থ পথের পথিক উইলসন সাহেব এই উত্তেজনা কী ভুলতে পারেন? —আজ যদি 'সোহো' বিপন্ন হত, সাহেব কী চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন?

পারতেন না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজ রক্ষার্থে নিষাদ মেকলের সঙ্গে যে সাহেব লড়াই করবেন, তা কীভাবে এবং কেমন করে? তাঁর মাথায় কিছুই এলো না। নিরুপায় লোক বিপদে পড়লে যা করেন, তিনিও তাই করলেন। শরণ নিলেন ঈশ্বরের। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে শ্লোক লিখেই তিনি জানিয়ে দিলেন,

'নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতমাভৈঃ
শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নি
স্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং
মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ—
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং
ধাতুর্দয়া দুর্বলে।'

বহু প্রাণীর শত শত পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ সূর্যকর নিকরে তাপিত হচ্ছে। ছাগাদি পশুগুলি নিত্যচর্বণ করছে, 'কোদাল' দিয়ে কত চেঁচে ফেলা হচ্ছে, তবু অতি ক্ষীণতনু দূর্বা কিছুতেই মরে না। কারণ দুর্বলের ওপর বিধাতার দয়া। মোট কথা, সংস্কৃত মরবে না, বিধাতাই তাকে বাঁচাবে।

প্রবীণ অধ্যাপক জয়গোপালকেও চিঠি লিখলেন উইলসন সাহেব। ছত্রে ছত্রে উচ্ছলিত সংস্কৃতানুরাগ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শ্লোক থেকে শ্লোকান্তরে। কী গভীর সহানুভূতি, কী বেদনা মেকলে সাহেবের উদ্ধত দম্ভোক্তিতে এবং তদনুরূপ ক্রিয়া-কলাপে তিনি যে কতখানি দুঃখ পেয়েছিলেন, সেকথা অকপট রাখলেন না তিনি কোথাও। বরং প্রতিটি শব্দ নির্বাচনের ভেতরে ধরা পড়ল তাঁর নিরুদ্ধ অশ্রুর ছাপ।

সাহেব জয়গোপালকে লিখলেন, বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা। হংসকুল তাঁর প্রিয় বাহন। সুতরাং প্রিয় বলেই তিনি রক্ষা করবেন তাঁদের।

বিধাতা বিশ্বনির্মাতা
হংসাস্তৎ প্রিয় বাহনম্।
আস্তঃ প্রিয়তরত্বেন
রক্ষ্যতি স এব তান্।

সংস্কৃতের প্রসঙ্গে সাহেব লিখলেন, অমৃত অতি সুমধুর, কিন্তু সংস্কৃত তার থেকেও মধুর। এটি দেবতার ভোগ্য, তাই একে বলা হয় দেবভাষা।

অমৃতং মধুরং সম্যক
সংস্কৃত হি ততোধিকম।
দেব ভোগ্যমিদং যস্মাদ
দেব ভাষেতি কথ্যতে॥

এর পর সাহেব নিজের কথা লিখলেন। বিদেশী হলেও তিনি এ ভাষায় কেমন করে মজলেন তা অকপটে কবুল করলেন। লিখলেন, জানি না, সংস্কৃত ভাষায় কী মহামাধুর্য আছে! যার জন্য আমরা বিদেশী হয়েও সর্বদাই সমুন্মত্ত।

ন জানে বিদ্যতে কিং
তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন
বৈদেশিকা বয়ম॥

শেষ শ্লোকে সাহেব ভক্তিনম্র চিত্তে জানালেন, যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন থাকবে বিন্ধ্যপর্বত ও হিমাচল, যতদিন থাকবে গঙ্গা-গোদাবরী, ততদিন সংস্কৃত ভাষাও থাকবে বিরাজিত।

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ
যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ
তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥

সংস্কৃতানুরাগী উইলসন অনেক কথাই বললেন বটে, কিন্তু কীভাবে নিষ্ঠুর নিষাদের হাত থেকে সংস্কৃত কলেজকে বাঁচানো যাবে তার কথা জানালেন না। যদিও তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজকে তিনি বিধাতার কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু সত্যি সত্যিই কী তিনি নির্বিকার হয়ে বসেছিলেন?

এদিকের ব্যাপারটি সংক্ষিপ্ত। মেকলে সাহেব বেপরোয়া। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার রথ তিনি চালিয়ে ছিলেন গড় গড় করে। দরাজ হাতে এবং সাড়ম্বরে তিনি আয়োজন করলেন ইংরেজি পঠন-পাঠনের। আর সংস্কৃত?—এক সেলফ ইংরেজি গ্রন্থে যে জ্ঞান আছে, গোটা সংস্কৃত ভাষায় তা যখন নেই, তখন তার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে কী লাভ?—গোলদীঘির কলেজে যে সব বৃত্তি দেওয়া হত সংস্কৃত পাঠে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, নির্মম হাতে ছেঁটে দেওয়া হল সেগুলিকে। অনেক ধ্রুপদী সাহিত্য গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, মেকলে সাহেবের কল্যাণে তাও গেল। এইভাবে একের পর এক সংস্কৃত পঠন-পাঠনের নিভৃত আশ্রয়টি ধ্বংস হতে থাকল। শেষে সংস্কৃত কলেজও যায় যায় অবস্থা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব গেলেও কলেজটির মৃত্যু হল না। মেকলে সাহেব অনেক চেষ্টা করেও পারলেন না। কারণ?—কারণ বলা কঠিন। উইলসন সাহেবের গোপন কোনো হস্তক্ষেপ ছিল বোধহয়। আর তা যদি না হয়, উইলসন প্রার্থিত বিধাতা পুরুষই আমাদের এই বিদ্যায়তনটিকে বাঁচিয়ে দিলেন। জয়গোপাল-প্রেমচাঁদ চোখের ওপর এই দৃশ্য চাক্ষুষ করলেন।



সেই অপ্রকাশিত নাটকটি

শরতের সোনার রদ্দুর সেদিন ঝলমল করছিল হাইকোর্টের চূড়োয়। গঙ্গার বুক থেকে জাহাজের ভোঁ ভেসে আসছিল থেকে থেকে।

হার ম্যাজিস্টিজ হাইকোর্টের 'গ্রাণ্ড জুরি হলে' কালা নেটিভদের সে কি ভিড়! লাল কার্পেট বিছিয়ে দিয়ে তারা সেদিন একজন সাহেব-কে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে। না, ইনি একজন হেঁজিপেঁজি সাহেব নন। ইনি হলেন হাইকোর্টের তদানীন্তন বিখ্যাত বিচারপতি—শ্রীল শ্রীযুক্তস্যার মরডানট ওয়েলস্, কে. টি.। যখন তিনি এদেশে আসেন, তখন কলকাতার এই কোর্ট ছিল সুপ্রীম কোর্ট। পরে হল, হাইকোর্ট। একাধারে তিনি ছিলেন দুই কোর্টের বিচারক। এ-হেন সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? —এখন সাহেব বিলেত চলে যাচ্ছেন, তাই এই অভিনন্দন সভা! একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে মানপত্রটি সাজিয়ে সাহেবের লাল টুকটুকে হাতে তুলে দেওয়া হল। ওই মানপত্রটিতে কম করে তিনহাজার কালো নেটিভের সই ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অভিনন্দন-বাণী পাঠ করলেন। দুঃখভারে তাঁর গলা বোধহয় ভারী হয়ে এসেছিল। প্রত্যুত্তরে জজসাহেবও বিগলিত হৃদয়ে একটি সুন্দর ভাষণ দিলেন।

সকলে খুব খুশী হল। মনে হল পূর্ব-পশ্চিমের এ-হেন মিলন কখনও ঘটেনি। ঘটবে না।

না, আপাতদৃষ্টিতে এ দৃশ্যটি দেখলে আন্তরিক বলে মনে না করার কিছু ছিল না। কিন্তু ইতিহাস বলে, এর চেয়ে বড় মিথ্যাচারণ আর কখনো ঘটেছে কি না সন্দেহ! বাঙালী জাতি নিজেকে অনেক আত্ম-প্রতারণা করেছে। কিন্তু এ-হেন দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলাদেশের হৃদয়ের লোক বলে যাঁকে স্বাগত জানানো হলো, তাঁর মত বঙ্গ-বিদ্বেষী সেকালে আর কি কেউ ছিল? আর যারা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন, তারা কি খুব একটা নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন? মোট কথা ইতিহাস বলে, ওখানে একটি ফাঁকির খেলা চলছিল।

ওয়েলস সাহেবের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করলেই—ওই ফাঁকিটা ধরা পড়বে। হুতোমের বিবরণে জানা যায়, শিবকেষ্টর মকদ্দমার মুখে ইনি প্রথম 'ইনডেণ্ট' হন। শিবকেষ্ট ওরফে শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমাটি যে খারাপ ছিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং তিনি যে শেষবেশ কুকর্মের জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙালীর কুলে কালি দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্ত জিঞ্জির গ্যালেন' এ কথা স্বয়ং হুতোমেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার এই যে, এ হাঙ্গামায় সাহেবের বঙ্গ-বিদ্বেষের চেহারাটা নিদারুণ ভাবে প্রকট হয়ে দেখা দিল। কারণে-অকারণে তিনি চার পা তুলে বাঙালীদের গাল পাড়তে থাকলেন। আর ধুয়ো ধরলেন: 'বাঙালীরা মিথ্যেবাদী ও বজ্জাতের জাত।'

এর পর এলো নীলের বিচার।

নীলদর্পণের বিচারের সময় বঙ্গ বিদ্বেষী ওয়েলস্-এর মুখোশটি একেবারেই খসে পড়ল। নিতান্ত আক্রোশের বশেই তিনি রেভারেণ্ড জেমস্ লঙকে জরিমানা করলেন এবং কয়েদ দিলেন। এ-হেন নির্লজ্জ আচরণ দেখে খাস বিলেতি সাহেবরা পর্যন্ত 'হায় হায়' করে উঠল। 'স্পিরিট অব পার্টিজনে'র নিন্দে করে সেকালের 'লণ্ডন রিভিউ' জানিয়ে দিল যে, এহেন কুবিচার সহ্য করা হবে না। 'ডেলি নিউজের ভাষা আরো গরম। লঙের ওপর ওয়েলসের এ সাজাকে তারা 'চাইলডিশ রিভেঞ্জ' বলে অভিহিত করল। 'প্রেস' বলে একটি কাগজ লিখল, বার্কের বাগ্মীতার কল্যাণে পরবর্তীকালের কছে স্তার এলিজা ইম্পে কুখ্যাতির কালিমালিপ্ত। স্তার মরডানট ওয়েলসের চরিত্রটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইনি হলেন সেই 'ইম্পের বংশধর।'

—মোট কথা ওয়েলসের বিরুদ্ধে সবাই চটে লাল। আর সবাইকার সহানুভূতি গিয়ে পড়ল রেভারেণ্ড লঙের ওপর। 'অ্যাবোরিজেনিস প্রোটেকটিভ সোসাইটি' লঙের উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দন-বাণী পাঠিয়ে জানাল যে, 'আমরা আছি'—দি সিমপ্যাথিজ অব ক্রিশ্চান ইংল্যাণ্ড আর উইথ ইউ।'

ওয়েলস্ সাহেবের কদাচারে বাঙালীরাও সেবার না রেগে পারল না। কিন্তু রাগ প্রকাশ করা যায় কেমন করে? —একটা সভা করলে মন্দ হয় না! তাই সভা ডাকাই ঠিক হল। কিন্তু সভা হবে কোথায়? 'সাধারণ' বলে সেদিনকার বাঙালীদের এক ছটাকও জায়গা ছিল না। তা' হলে? 'টাউন হল' অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তার মালিক হল সাহেবেরা। এ মিটিং কি তারা করতে দেয়? ছাদহীন একটি হল নিমতলায় ছিল, সেও সাহেবদের। সুতরাং বাদ। কাশীমিত্তিরের ঘাট—যেখানে সবাই মড়া পোড়ায় সেটি অবশ্য বাঙালীদের হাতে ছিল, কিন্তু সেখানেও 'হল' নেই। অতঃ কিম্! সভা করবার জন্য ঠাঁই খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সেকালের রাজা-মহারাজাদের শরণ নিতে হল। প্রসন্ন ঠাকুরের ঘাটে একটি বিরাট চাঁদনী চক ছিল, সে জায়গাটি পাওয়া গেলে অনায়াসে একটি বিরাট সভা করা যেত। কিন্তু তা হল না। বাবু যা সাহেবঘেঁষা তাতে কেউই তাঁর কাছে যেতে ভরসা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত সকলে মরিয়া হয়ে রাজা রাধাকান্ত দেবকে চেপে ধরল। রাজা রাজী হলেন। তাঁর নবরত্নের নাটমন্দিরে মিটিং-এর ভেন্যু বলে ঘোষণা করা হল।

আঠারোশ একষট্টি সালের ছাব্বিশে আগষ্ট সভা বসল। কাতারে কাতারে লোক এসে জমায়েত হল সভায়। নবরত্নের নাটমন্দির ভরে গেল দেখতে দেখতে। সেকালের কলকাতায় সে এক আশ্চর্য জনসমাবেশ। হাজার হাজার লোক সেদিন ওয়েলসকে তাদের ঘৃণা জানাতে হাজির। খ্যাতিমানদের ভেতর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নবাব আসগর আলী খাঁ এবং আরও অনেকে। এ সভায় সভাপতি হলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বয়ং। সে সভায় যদিও বেনিয়াবাবুরা আর সাহেবদের মো-সাহেবরা আসেনি তাতে কারোর কিছু এলো-গেলো না। গরম গরম বক্তৃতায় বাঙালীদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। ওয়েলসের 'মুখরোগের'

সাচ্চা দাওয়াই চাই। গণ-সাক্ষর করা একখানি দরখাস্ত তদানীন্তন ভারত সচিব চার্লস উডের কাছে পাঠানো ঠিক হল।

সেকালের লাট-বেলাটরা নেটিভদের এই গণ-স্বাক্ষরকে খুব খাতির করতেন। তাই স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। দরখাস্ত-গুলি ছাপিয়ে ফেলা হল। আর সই যোগাড়ের জন্য নানা লোকের হাতে হাতে দরখাস্তের নকল তুলে দেওয়া হল। 'হরকরা' আর 'ইংলিশম্যান' ছিল সেকালের দু'খানি সাহেবী পত্রিকা—আর যত নষ্টামির রাজা। ওয়েলসের সঙ্গে এদের ছিল গোপন আঁতাত। এরাই যোগসাজোস করে লঙের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। এখন ওই গণস্বাক্ষর সংগ্রহকে কোনো পোলিটিকাল কালার দেওয়া যায় কিনা পত্রিকা দুটি তারই সলা পরামর্শ করতে থাকল।

অবশ্য এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু দরকার। আগেভাগে একটি ছাপা দরখাস্তের নকল করতে পারলেই অনেকখানি কাজ হয়। সুতরাং এ চেষ্টাটাই চলল।

ছাপা আবেদনপত্রের একটি—মাত্র একটি কপি সংগ্রহের জন্য এই কুচক্রীরা সেদিন নগদ পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত খরচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু না, তাঁরা একটি কপিও সংগ্রহ করতে পারেন নি। এদিকে প্রায় একমাস ধরে ঘুরে ঘুরে নানা লোকের সই করানো চলল। শোনা যায়, সবসুদ্ধ দশ লক্ষ লোক ওই দরখাস্তে সই করেছিলেন।

কিন্তু দরখাস্ত পৌঁছাবার আগেই সাহেবরা আর মো-সাহেবরা একটা চাল চালাল। তড়িঘড়ি তারা মরডান্ট ওয়েলস্‌কে একটি সম্বর্ধনা জানিয়ে দিল। অর্থাৎ দেখো ওয়েলস্ সাহেবের অনুরাগীদের সংখ্যাও কম কিছু নয়।

এ চালে বিশেষ কাজ হল না। দশ লাখ লোকের সই-করা দরখাস্ত পেয়ে ভারত সচিব চার্লস উড একেবারে ক্ষেপে আগুন। ওয়েলস্‌কে সতর্ক করার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে ডেসপ্যাচে তিনি লিখে পাঠালেন—বিচার বিভাগে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত কত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁরা ন্যস্ত! পাপের প্রতি ঘৃণায় কখনই তাঁরা যেন কোন জাতি বা দেশকে কলঙ্কিত না করেন।'

ওয়েলস্ এবার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে বলতে পারে? ইংলণ্ডের সকলে তাঁর ওপর যে বেদম চটেছে, সে কথা আগেই বলেছি। নেটিভরাও ক্ষেপল। এখন উপায়? লর্ড

ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস—মায় এলিজা ইম্পে কাউকেই না কাঁদিয়ে ছাড়া হয়নি। আর তাঁদের দুর্গতিটা তো তখনো চোখের ওপর ভাসছে। দেশে ফিরে গেলে ওয়েলসেরও যে ইমপিচমেন্ট হবে না, এমন কথা কে হলফ করে বলতে পারে?

চতুর সাহেব একেবারে তাই ভোল বদলে ফেললেন। অনেক অপকর্ম করেছেন, এবারে একটু নামাবলী গায়ে দিলে ক্ষতি কি? বঙ্গ-বিদ্বেষী সাহেব এবার বঙ্গ-প্রেমিক সাজার ভান করলেন। দেশীয় লোকদের থেকে কিছু খয়ের-খাঁ জোটান যায় কিনা, সে দিকেও দৃষ্টি দিলেন। সাহেবদের দাক্ষিণ্য গ্রহণের জন্য সেদিন আগ্রহীদের অভাব হল না। কুঁড়ে গরুরা সহজেই তাঁর গোঠে ভিড়ল।

সাহেব সত্যি সত্যিই ছিলেন লগন-চাঁদা। কেননা, তাঁর এজলাসে সুবিধা মত একটি মকদ্দমাও এসে হাজির। দেশীয় লোকেরা ক্রীশ্চান মিশনারীদের মোটেই ভাল নজরে দেখত না। লঙের মত মহাপ্রাণ লোক ছিল বলে মিশনারীরা কখনো কখনো সম্মান পেত। নতুবা নয়। নীল আন্দোলনের সময় এঁরা প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করায় সাময়িকভাবে উভয়ের মধ্যে একটি মৈত্রী-বন্ধন গড়ে উঠেছিল।—ওয়েলস্ সাহেবের রাগ ছিল দু'দলের ওপরেই। এদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি হোক, এই ছিল তাঁর কাম্য।

ধর্মান্তরের এক মকদ্দমা এসে তাঁর সে কামনা পূর্ণ করল। একটি অল্পবয়স্ক কিশোর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে বলে ডাঃ ডাফের আশ্রয় নিয়েছিল। ছেলেটির বাবা তাঁর সন্তানকে বাঁচাবার কোন পথ না পেয়ে কোর্টে মকদ্দমা জুড়ে দিল। ব্যস, তারপরই ঘুঁটি গিয়ে পড়ল ওয়েলস্-এর হাতে। সাহেব এক ঢিলে দু' পাখি মারলেন। মনোমত রায় লিখে দেশীয় লোকদের কাছে প্রচুর হাততালি পেলেন, আর মিশনারীদের রীতিমত একহাত দেখে নিলেন। ওয়েল্স-এর বিচারে খুশি হয়ে দেশীয় কাগজ লিখল—'উই হোপ দি জাজমেন্ট উইল সেট্ল ফর এভার দি ডুম অব বেবি কনভারসন'।—একটি ভালো রায় লিখে, সাহেব তাঁর পাপদেহকে বেমালুম ঢেকে ফেললেন। চারদিক থেকে তাঁর জয়ধ্বনি উঠল।

নাঃ আর নয়। আঠারোশ' তেষট্টি সালের মাঝামাঝি অবসর নিয়ে সাহেব দেশে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন। কারণ? —শরীর ভালো যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে তাঁর অনেক অনুরাগী জুটে গেছেন। তাঁরা

সাহেবকে একটি বিদায় অভিনন্দন দেবেন বলে ঠিক করে ফেললেন। কি জানি, বিলেতে গিয়ে যদি তার আবার ইমপিচমেণ্ট হয়! নেটিভ কাগজের ভেতর 'বেঙ্গলি' ছিল সেকালের একটি নামকরা পত্রিকা। এ কাগজটি এ বিষয়ে সব থেকে উদ্যোগী হল। সাহেবের সম্পর্কে লিখল: 'দি লিভিং মেম্বারস অব দি নেটিভ কমিউনিটি অব ক্যালকাটা, উইথ সিঙ্গুলার ইউন্যানিমিটি, হ্যাভ রিজলভ্ড টু প্রেজেণ্ট অ্যান অ্যাড্রেস টু সার মরডান্ট ওয়েলস্ অন দি অকেশন অফ হিজ রিগ্রেটেড রিটায়ারমেণ্ট ফ্রম দি বেঞ্চ অব দি হাইকোর্ট।' —অর্থাৎ কলকাতার তা-বড় তা-বড় লোকেরা একমত হয়ে স্থির করেছেন যে, হাইকোর্ট থেকে অবসরের সময় স্যার মরডান্ট ওয়েলস্‌কে তারা একটি বিদায়-অভিনন্দন জানাবেন।

কালা নেটিভদের এ-হেন উচ্ছ্বাস দেখে ঠোঁটকাটা 'হরকরা' টিপ্পনী কাটল —মাত্র কমাস আগে ওই মাননীয় বিচারপতির মত নিন্দাভাজন ইংরেজ সন্তান এদেশে বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না। তখন যদি জজ সাহেব অবসর নিতেন, সে খবরকে নেটিভরা মুক্তকচ্ছ হয়ে অভিনন্দন জানাত। আর আজ?

কিন্তু বিদায়-অভিনন্দন যত সহজে নিষ্পন্ন হবে বলে মনে করা গিয়েছিল তত সহজে হল না। যতই দিন যেতে থাকল, দেখা গেল সাহেবদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমা হয়ে উঠছে। মাত্র কমাস আগে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরিত অভিমত নিয়ে যাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে, তাকে কি গুণে আজ অভিনন্দন জানানো হবে? —সকলের মুখেই এক জিজ্ঞাসা।

কিন্তু অনেক রইস লোক অভিনন্দন দেওয়ার পক্ষেই জুটে গেলেন। আর সব থেকে মজার ব্যাপার, সেদিন যাঁরা সাহেবের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বাণী বর্ষণ করেছিলেন, তারাই এ গোঠে আগে ভিড়লেন। দেখা গেল, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর অভিনন্দনে স্বাক্ষর করে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অসুস্থতার দোহাই পেড়ে সভায় আর গেলেন না। তবে সইটা রয়ে গেল। কালীপ্রসন্ন সিংহ যিনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় ওয়েলস্‌কে নিয়ে অনেক রকম রঙ্গ-রসিকতা করেছেন, 'মুখরোগের' চিকিৎসা করেছেন, আবার লঙের জরিমানার টাকা ঝনাৎ করে কোর্টে ফেলে দিয়েছেন, তিনিও অভিনন্দনে স্বাক্ষর করে বসলেন। শেষবেশ তিনিও অবশ্য সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বাক্ষর মোছা যায়নি। আর বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের

সহ-সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ?—যে গলায় তিনি নবরত্নের নাটমন্দিরে আগুন-বৃষ্টি করেছিলেন, সাহেবের বিদায়-অভিনন্দন সভায় তার সে কণ্ঠে বাঁশি বাজল। মানপত্রখানি তিনিই পাঠ করলেন।—মোদ্দা কথা, প্রধান প্রধান বঙ্গ-নেতাদের এ-হেন কাণ্ড দেখে সকলে অবাক।

তবে সেদিনকার বাংলা দেশে একজন বিবেকবান বাঙালী ছিলেন, যিনি এই ন্যাকামিকে ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি হলেন, নীলদর্পণের রচনাকার দীনবন্ধু মিত্র। —ওই কেচ্ছায় সেদিন যারা যুক্ত ছিলেন তারা সকলেই ছিলেন দীনবন্ধুর নিকটতম সহযোগী এবং বন্ধুজন। এঁদের এই আচরণে দীনবন্ধু রাগে ফেটে পড়লেন। একদা এমনি ক্রোধে তিনি নীল-করদের মুখে দর্পণ তুলে ধরেছিলেন। আজ আবার এই বন্ধুদের মুখে তেমনি একটি আয়না ধরার প্রয়োজন অনুভব করলেন। রাতারাতি তাই তিনি লিখলেন ছোট্ট একটি নাটিকা।

নাটিকার দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে 'কলিকাতা বোকা-রাজার পোড়ো বাড়ি'তে বসে বিচারপতি বলদ পঞ্চাননকে সম্বর্ধনা বা অভিনন্দন দেওয়ার শলা-সরামর্শ। সেখানে আমরা যাদের সাক্ষাৎ পাই, তারা হলেন—ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, স্বার্থক দাস, সাত হাটের কানাকড়ি এবং হুঁতোম প্যাচা। দ্বিতীয় দৃশ্য, 'বিচার মন্দির' অর্থাৎ 'হার ম্যাজিস্টিজ হাইকোর্ট।' সেখানে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

নাটকের চরিত্রগুলিকে চিনে নিতে হলে আমাদের একটু অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিচারপতি বলদ পঞ্চানন যে বিচারপতি মরডান্ট্ ওয়েলস এবিষয়ে বোধহয় কারো কোনো মতান্তরের অবকাশ নেই। হুঁতোম প্যাচা কে ? ইনি কি তবে নকশার লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ? গ্যাঁটা-গোঁটা যিনি পত্রিকা সম্পাদক, তিনি একেবারে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিনা হলফ করে তা বলার জন্য আজ বোধহয় আর কেউ নেই। অভিনন্দন উৎসাহী এবং মানপত্রদাতা যে ভোঁদাকে পাই, এ ভোঁদা কে ? ইনি কি তবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ? গোমা, সাত হাটের কানাকড়ি, স্বাথক দাস—এঁরা কারা ? বলা শক্ত। এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক এখন আর নেই। নাটিকাটির শেষে বিচারপতি বলদ পঞ্চানন বাঙালীদের চরিত্র নিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন—

উনপাজুরে লক্ষ্মীছাড়া
বরাখুরের দল।
যাবার বেলা খাবার
মাচ মানস সফল॥
গাল দিলেম যশ পেলেম
মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে
পেলেম পরিচয়॥

নাটিকাটির নাম 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। সেদিনকার বাংলাদেশে একেবারে দিনদুপুরে ওয়েলসকে নিয়ে যে প্রহসন হয়ে গেল, তাকে এর থেকে যোগ্য নাম আর কি দেওয়া যেতে পারে?

তবে শেষ দৃশ্যে আরো একটু মজা আছে। যে দীনবন্ধু দুর্ধর্ষ নীলকরদের পরোয়া করেন নি, নীলদর্পণ ছাপাবার বুকের পাটা রেখেছিলেন, সেই নাট্যকার কিন্তু এ প্রহসনখানি ছাপাতে ভরসা পাননি। পাণ্ডুলিপির আকারেই তার কুড়ে গরু পড়ে রইল। যখন ছাপা হল তখন উনিশ শতকের রাত কাবার। বিশ শতকের সূর্য সবে দেখা দিয়েছে দিগন্ত রেখায়। সে উষাকালে কলহ করার জন্য কেউ বেঁচে ছিলেন না।

কলকাতার প্রথম ভোটকাব্য

'ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।

সহজ পাঠের কবি একদা শহর কলকাতায় একটি ছবি এঁকেছিলেন। মজার ছবি। বে-এক্তিয়ার এ শহরটি সেদিন হঠাৎ চলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। একবারেই হঠাৎ। চোখ খুলতেই দেখা গেল—'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।' পথঘাট ঘরবাড়ি মায় মনুমেণ্ট পর্যন্ত চলছে টলমল করতে করতে। চলেছে হাওড়ার ব্রিজ। হ্যারিসন রোড তার পিছনে দৌড়াতে গিয়েও পেরে উঠছে না। কলকাতায় এ কাণ্ডকারখানা দেখে সকলে অবাক। নিষেধ করছে সবাই। হাঁ হাঁ করছে হাত তুলে। কিন্তু ওসব ছোট কথা কানেই তুলছে না খেয়ালী নগরী।—

কলিকাতা শোনে না'কো চলার খেয়ালে
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।

স্বপ্ন নয়. আজ যদি কবি বেঁচে থাকতেন তবে এ হেন খেয়ালী ও চলমান কলকাতার একটি সত্যিকারের ছবি চোখের সামনে দেখতে পেতেন। বাঙলাদেশ জুড়ে আজ যে রাজসূয় যজ্ঞের অঢেল আয়োজন চলেছে, এর হোতা কে?—এই কলকাতা। সদর-মফঃস্বলে, হাটে-বাজারে, ট্রামে-বাসে-রেলে মায় উড়ো জাহাজে পর্যন্ত সর্বত্র আজ দেহি দেহি রব। সকলের মুখে একটি মাত্র প্রার্থনা ভোট দাও। হবু রাষ্ট্রনায়করা ভোটপাত্র নিয়ে দরজায়-দরজায় ঘুরছেন। চেলা-চামুণ্ডারা প্রার্থীর গুণ বর্ণনায় মুখর। স্তম্ভে-দেয়ালে নানান অক্ষরে নৃত্য। অজস্র বীজমন্ত্র হাওয়ায় পাক খাচ্ছে। লাগ লাগ করে লেগে গেছে এর ঢালে আর ওর তরোয়ালে। ভোট কুড়োনীরা কেড়ে নিয়েছে ঘুঁটে কুড়োনীর দেয়াল। এই ফাঁকে আমাদের কলকাতা হরেক নামের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে পা-পা করে এগিয়ে চলেছে অ্যাসেম্বলি হাউসের দিকে। রসিকজনেরা চোখ খুললেই এ সরস রঙ্গচিত্র দেখতে পাবেন। সহজ পাঠের কবির আঁকা এ স্বপ্ন চিত্র নয়। এ বাস্তব ছবি। অতি বাস্তব।

আর বাস্তব বলেই বোধ হয় এটি এত রসাল। ভাষায় যদি কেউ একে 'বেহদ্দ তামাসা'ও বলেন, তবে তাঁর কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই শহর কলকাতায় এককালে কম মাতালো মাতালো ঘোঁট দেখা যায়নি। কম হুজুক হয়নি সেদিন। কিন্তু সে সবের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। নাক কাটা বঙ্ক, সাতপেয়ে গোরু, দরিয়াই ঘোড়া হুতোমের কলকাতায় কম উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি। কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন হরিভদ্দর খুড়ো, যিনি প্রত্যহ দেড়শ ছিলিম গাঁজা খেয়ে উপোস ভাঙতেন তিনিই কি কম উত্তেজনা এনেছিলেন কলকাতায়? না, এরা সবাই মিলে যা করতে পারে নি, ভোট রঙ্গ একা তা করেছে। ভূমিষ্ঠ হয়েই সে তাজ্জব খেল দেখিয়ে দিয়েছে। এ একবারে খাঁটি বিলিতী জিনিস। এর কাছে হরিভদ্দর খুড়োর দেড়শ ছিলিমের নেশা একবারে তুচ্ছ। সেবার বোধ হয় আঠারোশ সাতাত্তর। ছোট লাটের তক্তে বসেছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল্ বাহাদুর। এই শিশুর জন্ম সম্ভাবনার কথা যেদিন তিনি সবে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন কি না-বলছেন সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখই মিচি মিচি হাসিতে উঠল উদ্ভাসিত হয়ে। সকলের চোখ ঝলসে উঠল কৌতুকে। এক উকিল-কবি হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীতে বসে যখন এ বৃত্তান্ত শুনলেন, মাথার টুপি খুলে তিনি সাহেবকে সেলাম জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজ টেনে নিয়ে সেই মুহূর্তটির স্বাগত-ভাষণ না লিখে পারলেন না—

'ছেলাম টেমপল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপ্যাল বিলে।
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেল্কি বাজি ইংরাজের হদ্দমজা হায়!'

মজার স্রষ্টা হিসাবে সব প্রশংসাটুকু ছোট লাটের দিকে ছুঁড়ে দিলে চলবে না। পালার মূল গায়েন তদানীন্তন বড়ো লাট রিপন সাহেবকেও কিছু দিতে হবে বইকি। সুশাসক হিসাবে ভারত ইতিহাসে রিপনের নাম অনেকেই স্মরণ করে থাকেন। কেউ কেউ আবার বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে তাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যেদিন লাটগিরির চাকরি নিয়ে এ ভারতভূমিতে পা দেন, জর্জ ফ্রেডারিক শ্যামুয়েল রিপন সেদিন ইংলণ্ডের মাটিতে সবে হামাগুড়ি টানছেন। আঠারোশ' আশিতে এ দেশে তিনি আসেন ভারত-ভাগ্য বিধাতা হয়ে। নানা কারণে

তার শাসনকাল মনে করে রাখা হয়। আই সি এস পরীক্ষায় এ দেশীয় তরুণদের অংশ গ্রহণ তিনি করেছিলেন অবারিত। আর তার আমলে ইলবার্ট বিল নিয়ে যে কোঁদল শুরু হয় এবং ফলে কালো-ধলো সাহেব-নেটিবে যে উত্তেজনা সঞ্চার করে, এ দেশের ইতিহাসে সত্যি সত্যিই তা বিরল। ব্রান্‌সন্‌ নামে এক ব্যারিষ্টার তো ক্ষেপে গিয়ে কালো নেটিভদের কামড়াতে দৌড়েছিল। নেটিব পাড়ার লোকেরা সেদিন হুড়কো নিয়ে না বেরোলে কি হত কে জানে? নেটিবরা সেদিন সাহেবের ভাতরুটি—মায় ধোবা নাপিত পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। ক্ষিদের জ্বালায় বেচারি ব্রানসন্‌ 'হা—অন্ন যো—অন্ন' করতে করতে পালিয়ে বাঁচল। না, স্যামুয়েল রিপন কেবল এ কারণেই অমর হয়ে থাকবেন না। আজও আমরা তাঁকে যে কারণে স্মরণ করব, তার কারণ হল, একটি। লোকাল সেলফ্‌ গভর্নমেণ্টের প্রবর্তক তিনি, তাঁকে কি ভোলা যায়? আজকের যে ভোটরঙ্গ তা ঐ সেল্‌ফ-গভর্নমেণ্টের সূত্রেই পাওয়া। 'পপুলার পলিটিকাল ইন্‌সটিটিউশন' তৈরি হোক, এই ছিল সাহেবদের কামনা। তাঁদের কামনা বিফল হয় নি। সেদিন যে চারা গাছটি তাঁরা রোপণ করেছিলেন আজ সেটি একটি বিরাট গাছ। চারদিকে এত ঝুরি নেমেছে যে মূল শিকড়টিকে খুঁজে পাওয়া ভার।

এসব যখন ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র তখন সুস্থ শরীরেই বেঁচে ছিলেন। নেটিবকুলের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এ সাহেবী বদান্যতাকে তিনি সেদিন মোটেই ভালো মনে নিতে পারেন নি। পরে লোক-রহস্যে তিনি তাঁর মতামতকে প্রকাশ করে দিলেন। 'হনুমদ্বাবুসংবাদ'-এ বর্ণিত হনুমান সম্ভবত কালামুখ নেটিব সমাজের প্রতিনিধি। আর বাবু হলেন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের প্রতিভূ। সেল্‌ফ গভর্নমেণ্টের কথা শুনে 'সুপক্ক কদলী-লোভী' হনুমান বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছে—'জিনিসটি কি?—সুপক্ক কদলী?' বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন—'না-না লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট।' বেচারি হনুমান কিছুই ধরতে পারে না। তাই সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—'সে কি?' বাবু তখন সরল বাংলা করে বলেছেন—স্থানীয় আত্মশাসন।'

নাঃ, বাবুর এ ভাষাও শাখাচারী হনুমানের বোধ্য হয় নি। অনেক অন্যায় জীবনে দেখেছে। অনেক। প্রতিকারার্থে বার বার তার ল্যাজ উঠেছে সুড়সুড় করে। কেবল আত্মশাসনের কৌশলেই সে নিজের ল্যাজকে বশীভূত রেখেছে। সুতরাং আত্মশাসন তার কাছে মোটেই অচেনা নয়। আর লোভনীয় ত

নয়ই। বরং পাকা কলা তার কাছে অনেক লোভনীয়। অনেক প্রিয়।

সেকালের শিক্ষিত বাবুদের কাছে ঠিক এর উল্টোটাই ছিল সত্য। সেল্ফ গভর্নমেণ্টকেই তাঁরা পাকা কলার তুল্য বলে মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্বায়ত্ত শাসনের আবির্ভাবকে দু' হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল।—দে হেলড্ উইথ ফিলিংস অব স্যাটিসফ্যাকৃসন অ্যাণ্ড গ্র্যাটিচিউড। তবে মজা এই যে, আশায় ছাই পড়তে দেরি হয় নি। সত্যি সত্যি বিলটি যেদিন ভূমিষ্ঠ হল, তার চেহারা দেখে পাকা ত দূরের কথা কাঁচা কলাও লজ্জায় মুখ লুকোল। হিন্দু পেট্রিয়ট টিপ্পনি কাটল---'দি প্রেজেণ্ট বিল ইজ ডিজাপয়েন্টিং ইন দি এক্সট্রিম।'

*   *   *

এহ বাহ্য। আগে কহ আর। মুখ ফিরিয়ে নেবার যখন উপায় নেই, কালা মুখ নেটিবদের ঐ কাঁচকলাটি বাধ্য হয়েই গলাধঃকরণ করতে হল। কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ—এ শহরগুলিতে অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল মিউনিসিপালিটি। কিন্তু সে মিউনিসিপাল সভায় সকলেই ছিলেন শাসক সাহেবদের মনোনীত সদস্য। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি কেউই ছিলেন না। স্থির হল—তিন ভাগের দু'ভাগ সদস্য নির্বাচিত হবে জনগণের দ্বারা। কেবল মিউনিসিপাল সভা নয়, এর পর জেলায় জনগণের দ্বারা গঠিত নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দেখা দিল জেলাবোর্ড। আর মহকুমায় মহকুমায় লোকাল বোর্ড তৈরির উদ্যোগ আরম্ভ হয়ে গেল। মোট কথা, সে এক এলাহি কাণ্ড; সাহেবের দরাজ দাক্ষিণ্যে নেটিবরা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গেল।

ইলেকশনের ধুম শহর কলকাতাতেই প্রথম পড়ল। ভোটরঙ্গের সেই সূচনা। ক্ষ্যাপামিরও সেই প্রথম পাঠ। চারদিকে ভুল বকাবকি আরম্ভ হয়ে গেল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেদিন পরলোকে। রঙ্গরসের গন্ধ পেলেই নেচে উঠত তাঁর কলম। চারদিকে ঘিরে সেদিন যখন রঙ্গ আর রঙ্গ, স্বাভাবিকভাবেই সেদিন অনেকের গুপ্ত কবির কথা মনে পড়তে থাকল। বঙ্গের গো-গৃহে যখন রঙ্গরসের রণভেরী বেজে উঠেছে, ব্যঙ্গের বাজার যখন অবারিত, আমাদের কুঁড়ে ঘরে যখন লিবার্টির জন্ম হচ্ছে, আর সেই মুহূর্তেই কিনা আমাদের রঙ্গরসের সম্রাট অনুপস্থিত!

কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময়।

দেখিলে না চর্ম্ম চক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গো-গৃহে রঙ্গ, ব্যঙ্গের বাজার॥

না, ঈশ্বর গুপ্ত না হয় না থাকুন, ব্যংলা দেশে কি কবির অভাব? বাংলা মা অবনত অবস্থাতেও রত্নপ্রসবিনী। যে উকিল-কবি সেদিন রিচার্ড টেম্পলকে সেলাম জানাতে মাথা থেকে টুপি খুলেছিলেন, সেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবার কলম তুলে নিলেন। বাঁকা বিদ্রূপের ধারালো শব্দ দিয়ে দিয়ে তিনি লাইনের পর লাইন কবিতা লিখে চললেন। এমন ভোটকাব্য আজও দুর্লভ।

'হুতুম্বাবুসংবাদ' থেকে আগেই জানা গেছে যে, এ ভোটরঙ্গে বাবু-সমাজের উৎসাহ ছিল একটু বেশী। বুলবুলির লড়াই দেখে ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ালের বিয়ে দিয়ে অঢেল নেশাভাঙ করেও বাবুরা সেদিন জীবনের বৈচিত্র্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যেমনি সাহেবরা ঘোষণা করল—'ফ্রেমে বাঁধা ফ্রানচাইজে নেটিব স্বাধীন', সে মুহূর্ত থেকে হঠাৎ যেন তাঁরা মেতে ওঠার একটি সুযোগ খুঁজে পেলেন। সাজো সাজো রব পড়ে গেল চারদিকে বারবিলাসিনীদের আঁচলের তলায় গভীর আরামে কোনো কোনো বাবু রাত কাটাচ্ছিলেন। ভোরবেলায় কেল্লার তোপ যখন গর্জে উঠল, বাবুর চটকা হঠাৎ ভেঙে গেল। মনে পড়ে গেল—ফ্রানচাইজের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসলেন। মুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছলেন। চাপকান চড়ালেন অঙ্গে। বিলাসিনী বিবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন মিহি গলায়। কেউ কেউ আবার উত্তেজিত হয়ে নাটক করে বসলেন। মিহি গলায় বিদায় নেওয়া তার হল না। 'রাজার তলব' বলে অতি দ্রুত নাটকীয় প্রস্থান দেখালেন তিনি।

বাবুদের সেদিন নানান রঙ। কেউ কেরানি, কেউ মুৎসুদ্দি, কেউ দেওয়ান, কেউ নায়েব। এ ছাড়া কারিন্দা ক্লার্ক মোল্লা মুদি কেউই বাবুআনিতে কম যান না। মিউনিসিপাল বেঞ্চে দাঁড়াবার জন্য সকলেই দৌড়লেন উর্দ্ধশ্বাসে। এ হেন রঙ্গ দেখে ঘোষজা খুড়োর চোখ উঠল কপালে। অমন কৌতুক তিনি জীবনে দেখেননি। এদিকে পীরবক্স-রামগোবিন্দের দল—যারা সেদিন নব্য ভোটার—তারাও একবারে থ। ফ্রানচাইজের 'ফ' জানে না বেচারিরা। ভয়ে গুটিসুটি। সদা শঙ্কিত। কী-হয় কী-হয় ভাব। কেবল

ভোট প্রার্থীরাই সেদিন ছিলেন নিঃশঙ্ক। তাঁদের দর্প ও সাজসজ্জা দর্শনীয় ছিল রীতিমত!

দর্প করে দুপুর রেতে 'ক্যাণ্ডিডেট' যত।
ব্যস্ত হয়ে, বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত॥

নির্বাচনী বুথ ছিল না সেদিন। ছিল না প্রিজাইডিং অফিসার। ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স তো নয়ই। আঙুলে কালি লাগাবার লোক ছিল না। একটি বিরাট হল ঘরে সকলে এসে সমবেত হলেন। সে হলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ভোটিং হল'। ভোটাররা এসে একে একে হাজিরা দিলেন সেখানে। জমে গেল অনেক লোক। কেউ সাদা কেউ কালো। কারো মাথায় বাঁকা টেরি। কারো হাতে ছড়ি। দোমেটে গাঁদার মত কেউ কমলা বর্ণের, কেউ আবার অম্লান ঘেঁটুরাজ। কামিজ আঁটা নধর বাবুরাও দেখা দিলেন গুটি গুটি।

মোটর গাড়ির চল তখনো হয় নি। সে ঘোড়াগাড়ির যুগ। হগ সাহেব সেদিন সম্ভবত পুলিশ কমিশনার ছিলেন, নির্বাচনের দায়িত্ব তাঁরই ওপর পড়েছিল। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান হিসেবেও সাহেব কিছুদিন কাজ করেছিলেন। শক্ত সাহেব বলে তার অখ্যাতি ইতিমধ্যে রটে গিয়েছিল—

হগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
চাবুকে করবে লাল, সদা প্রাণে ভয়॥

হগ সাহবের ভয়ে বাবুরা পর্যন্ত তাই একটু আগে ভাগেই চলে এলেন। ভোটিং হলের সামনে গাড়ির ভিড় লেগে গেল। কত ধরণের যে গাড়ি এল, তার তুলনা মেলা ভার। কেউ এলেন ফীটনে, কেউ আপিস-যানে। কারো কপালে জুটল কেরাঞ্চী, কারো ভাগ্যে ঠনঠনে। যাঁরা পদব্রজে এলেন, তারা রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে 'বিবিআনি' চালে 'প্যারাসল' মাথায় দিয়ে এলেন। মোটকথা সে এক এলাহি সমাবেশ—

গাড়ী গাড়ী নামে বাবু, বণিক কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট, ফ্রেণ্ডের কোম্পানী॥

ভোটার ও ভোট প্রার্থীরা এগিয়ে চললেন পা-পা করে। আগে প্রার্থীরা। পিছনে দাতার দল। রকম সকম দেখে ভোট দাতারা অনেকেই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। ভোট দেওয়ার পরিবর্তে ভালোয় ভলোয় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন অনেকেই। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ, কি

হেতু তাড়াই ?' এ আপ্ত বাক্যও কারো কারো মনে পড়ল। কেউ কেউ স্রেফ মজা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু তেমন কিছু হল না দেখে নিরাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'ভোটের লড়াই এমন ধারা আগে জানে কেটা ?'

প্রার্থীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল একদিকে। দাতাদের অন্যদিকে। লম্বা ফর্দ মিলিয়ে একে একে ডাক পড়ছিল। ভোটদাতাদের একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি—সম্ভবত তিনি হগ সাহেব—এ-ভোট পরিচালনা করেছিলেন। একবারে মাঝখানটিতে ব্যাটন হাতে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বাবুরা একে একে যেমনি এগিয়ে আসছিলেন, সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটন হেলিয়ে 'ভোটার ধরে আস্ক করে তুমি কারে চাও ?'

এ পাশে প্রার্থীদের আসনে কে যে বসেছিলেন, ইতিহাসের উৎসাহী পাঠকেরা হয়তো তাঁদের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। তবে বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ভোটারদের প্রার্থনায় এঁদের কথা আছে—

কোন জন বলে সাহেব ঐটি আমায় দাও।
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্তি বগলে যাহার।
এলেম ভরা ভি-এল মারা পছন্দ আমার॥

ওড়িশার কীর্তি ও ঐতিহ্যের গবেষণায় রাজেন্দ্রলালের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কে না জানে? ও ব্যাজস্তুতি তাঁরই পাওনা। সেদিন আবার কেউ কৃষ্ণমোহনের কথায় বলেছিলেন—

আমার পছন্দ ওই খৃষ্টভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট জিতি আর হারি॥

না, ভোট পর্বের কোনো কথাই কবি অনুক্ত রাখেননি তাঁর কবিতায়। বিদকুটে বাঙাল, বৈষ্ণব ভোটার, চোপ্‌দার চাপরাশি, ভৃত্যসমাজ, পেগম্বর জমিদার—সিল্ক, সাটিন, গরদ-চেলি, চোগা-চাপকান, গজেন্দ্রগতি তরুণীর রুজ মাখানো মুখ—এমন কি বোট-বাগিচা-বাগান কিছুই বাদ পড়ে নি। হেমচন্দ্র তাঁর ভোট কাব্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বিবরণই দিয়েছেন। পোলিং হয়ে যাবার পর হগ সাহেব কেমন ভাবে ভোট-প্রার্থীদের হাজিরা নিয়েছিলেন, সে চিত্র দুর্লভ নয়—

কাগজ হাতে হগ বাবাজী হাকিমী ধরণ
একে একে ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ॥

নবাব নমুদ আলী, খানসামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম যুগী ?—উত্তর, 'সেলাম'।
কুমার ভেকেন্দ্র কৃষ্ট, কানাই নাজির,
সাহেব জাদা, সেকন্দর ?—উত্তর, হাজির।

এ রকম নাম ডাকা এবং প্রার্থীদের হাজিরা নেওয়ার তালিকা দীর্ঘতর। সকলেই সেদিন হুজুরে হাজির। কেউ সাহেবের কাছে এসে দণ্ডবৎ হল। কেউ বলল, 'আপকি ওয়াস্তে'। 'গরিব নমাজ' বলে কেউ কেউ নিজেদের উপস্থিতি পেশ করলেন। শেষাশেষি—গালাগালি থেকে কোলাকুলি এবং সেক-হ্যাণ্ড পর্যন্ত হয়ে গেল—

কোলাকুলি গালাগালি 'সেকেনে'র ধুম।
মিউনিসিপ্যাল মক্স দেখে আক্কেল গুড়ুম॥

হ্যাঁ, আক্কেল গুড়ুম হওয়ারই কথা। এ অভিনব নাটক এরপর শুধু কলকাতারই থাকল না। ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়। পাড়া গাঁয়ে পর্যন্ত। সেখানেও ক্ষেপামি আর ভুল বকাবকি আরম্ভ হয়ে গেল। একই প্রহসন। সোমপ্রকাশ সেদিন লিখল: 'চতুর্দিকে মিউনিসিপাল সভার ধুম বাধিয়া গিয়াছে। আজ বালি উত্তর পাড়ায়, কাল ঢাকায়, পরশ্ব: রাণীগঞ্জে ইত্যাদি নানা স্থানে মিউনিসিপাল সভা হইতেছে। লর্ড রিপন বাহাদুর ক্ষেপার দলকে কি ক্ষেপাইয়াছেন? হরা দৌড়িল, তাহার পিছনে নড়া দৌড়িল, দেখাদেখি রামাও দৌড়িল। ইহারা কেহ কি কিছু বুঝেন না? ইহারা কি বাস্তবিক ক্ষেপার দল? তাহা নয়।—আমাদের মহানুভব গবর্নর জেনারেল প্রজার মনকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর কি আহ্লাদ ধরে? তাই তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, বাস্তবিক ক্ষেপা নন।'

'সোমপ্রকাশ' বর্ণিত সেই ক্ষেপামির কাল থেকে আজ আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। অনেক দূরে। বহু বছর চলে গেছে। গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। ভারত বিধাতা রিপন আজ নেই, নেই কবি হেমচন্দ্র। সেকালে একালে অনেক ব্যবধান। এত সত্ত্বেও এক জায়গায় মিল কিন্তু রয়ে গিয়েছে। সেই সেদিনের মত ক্ষেপামি আজও বর্তমান। তবে ভরসা এই, আমরা কেউই বাস্তবিক ক্ষেপা নই। নির্বাচনের পাট ফুরোলে আমরা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। দই খেলেন রিপন সাহেব, বিকারের বেলায় কিন্তু আমরা রয়ে গেলুম।—এটুকুই যা দুঃখ।

বাবুদের কলকাতায় চড়ক

বাবু আমলের কলকাতা।

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা চৈত্র মাস যাই যাই করছে।

বিকেলের লাল সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। পাশেই বাগান। বসন্তের কোকিল ঘন পল্লবের ভেতর থেকে ডেকে চলেছে অবিরাম। সেই ডাক বাবুদের শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। মেহগনির খাটে পুরু গদির ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বাবু একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কাঁচের শাসিতে একটু একটু করে ছায়া নেমে আসছিল।—সেই সময় বাবুকে ভীষণ চমকে দিয়ে মেকাবি ঘড়িতে হঠাৎ টাং টাং করে বেজে গেল পাঁচটা।

মুহূর্তের ভেতর বাবুর আলস্য ছুটে গেল। ঘড়ির ঘণ্টি শুনে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন। বাগান বাড়িতে যাবার সময় হয়ে গেছে, আর কি তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন?

বৈঠকখানায় ফরাশ পেতে যাদের নিয়ে বাবু আসর জমান, সেই মোসাহেবের দল এসে গিয়েছে, বাইরে কমে এসেছে রোদ্দুরের তাপ, ফুলের 'তবক' সাজিয়ে দিয়ে গেছে মালি, আর তার ওপর কোকিলের ডাক যখন বাবুকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তখন এই মুহূর্তে বাবু কি আর শুয়ে থাকতে পারেন?—বাগানবাড়ি হল তাঁর যৌবনের উপবন, সেখানে না গিয়ে কি থাকতে পারেন?

বাগানবাড়ি যাবার জন্য বাবুকে তাই তৈরি হতে হল।

শোবার ঘরে বিশাল দর্পণ। সেই দর্পণের সামনে বাবু সাজতে বসলেন। পায়নাপেলের চাপকান চাপালেন অঙ্গে। রুমালে বোকো মাখালেন। তারপর চীনা বাড়ির জুতোয় সবে যখন পা গলাবেন, ঠিক সেই সময় ডাক এলো।—কিসের ডাক?—গাজনের। গাজনতলার ডাক। আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন চড়ক।—এই চড়ক-গাজন বাবুদের বহুকালের ক্রিয়াকাণ্ড। সেখানে বাবুকে একবার যেতেই হবে।

গাজনতলায় এক সন্ন্যাসী শিব সেজেছে। মাথায় তার জটার ভার।

সন্ন্যাসী সেই জটা ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু সেই জটা থেকে কোনো আশীর্বাদী ফুল ঝরে পড়ছে না। শুধু কি ফুল? বেলের একটি পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।— দর্শকদের ভেতর এ নিয়ে গাজুগুজু পড়ে গেল। বিষণ্ণ মুখে কেউ কেউ বলল, 'এ আমাদের পাপ। আমাদেরই অপরাধ।' কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, 'না বাপু, এ আমাদের দোষ নয়, এ দোষ সন্ন্যাসীর।'—এইভাবে নানান মন্তব্য বর্ষিত হতে থাকল।

তারপর লেগে গেল ঝগড়া। আর এই কলহ মেটাবার জন্য ডাক পড়ল বাবুর। বাবুকে এসে দু চারজন ধরল, 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে।'

এদিকে বেলা গড়িয়ে যায়। সহিস এসে জানিয়ে গেছে যে গাড়ি প্রস্তুত। মোসাহেবের দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবু বাবুকে যেতে হল। সাতপুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড, না-গিয়ে কি কোনো উপায় আছে? বাগানবাড়ি যাবার পোষাকেই বাবু গেলেন গাজনতলায়। দারোয়ান ও মোসাহেবের দল চলল পিছনে পিছনে।

বাবু গিয়ে পৌছুতেই সোল্লাসে ঢাক বেজে উঠল। কৌতুহলী জনতা হই হই করে উঠল। শিবের সামনে এগিয়ে গিয়ে বাবু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। গরমে বাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। বাবুর ক্লেশ দেখে দৌড়ে গিয়ে দু'জন বড়ো বড়ো দুটো পাখা নিয়ে এল। বাবুর গায়ে বাতাস করতে থাকল।

এদিকে একজন এগিয়ে এসে বাবুর দু হাত এক করে জড়িয়ে দিল ফুলের মালা। বাবুর গলায় রেশমী রুমাল বাঁধা। কাঁদো কাঁদো মুখ করে বাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একপাশে। এদিকে পুরোহিত শিবের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকল, 'বাবা ফুল দাও।'

গাজনতলায় অনেক সন্ন্যাসী। প্রধান সন্ন্যাসী উবু হয়ে বসে ঘোরাতে থাকলেন জটা। কোনো কোনো সন্ন্যাসী শুয়ে পড়লেন। মুহূর্তের ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে এলো গাজন তলা। একটি অলৌকিক ঘটনা দেখবার জন্য সকলে যেন হয়ে উঠল উদ্‌গ্রীব। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে প্রতীক্ষা করতে থাকল একটি আশীর্বাদী ফুলের জন্য। ঢাকীরা ঢাক কাঁধে করে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। এদিকে বাবুর কল্যাণ কামনা করে আরেকবার সন্ন্যাসীর জটায় পুরোহিত মশাই ঢেলে দিলেন গঙ্গাজল।

কী আশ্চর্য! ওই জটার গভীর থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটি ফুল খসে পড়ল টুপ করে। পড়ল এক ঝাঁক বেল পাতাও।

ব্যস সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলিত হয়ে উঠলেন বাবুরা। গুরু গুরু করে বেজে উঠল ঢাক। মোসাহেবের দল সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, 'বাহবা! বাহবা! এমন অলৌকিক ঘটনা না হয়ে কী পারে? দেখতে হবে কেমন বংশ! আর বাবুর কেমন পুণ্য! মোট কথা, আনন্দে গর্জনে ফেটে পড়ল গাজনতলা!'

পুণ্যবান বাবুও এখান থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন! মোসাহেবের দল নিয়ে মুহূর্তকাল মাত্র অপেক্ষা না করে সহর্ষে তিনি পাড়ি দিলেন বাগানবাড়ি। পাড়া কাঁপিয়ে তাঁর গাড়ি ছুটল। ঘোড়ার খুরে খুরে চৈত্র গোধূলিতে ধুলো উড়ল চিৎপুরের। জোড়াসাঁকোর। পাথুরেঘাটার। বাগবাজার-শোভাবাজার-সিমলা সর্বত্র একই চিত্র। ঢাকের শব্দে মুখর হয়ে উঠল কলকাতা। হাড়িরা ঢোলের সঙ্গে বোল তুলতে থাকল—'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ডাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।'

এই ভাবেই আরম্ভ হত চড়ক। সংক্রান্তির আগের দিন থেকেই সাধারণত উৎসব আরম্ভ হয়ে যেত। বাবুদের কল্যাণেই বাবু কলকাতার চড়ক প্রতি বছর বেঁচে উঠত নতুন হয়ে।

কলকাতার কালচার একদা ছিল বাবু কেন্দ্রিক। বাবুরা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে দোল-দুর্গোৎসব থেকে চড়ক পর্যন্ত কিছুই জমে না। যাত্রা-থিয়েটার বাঈনাচের অনুষ্ঠান বাবুদের বাদ দিলে শিবহীন যজ্ঞের মতই অকল্পনীয়।

চড়ক ছিল মূলত লোকায়ত উৎসব। নিম্নকোটির মানুষেরা মেতে উঠতেন এই উৎসবে। বাবুরা অর্থ দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দিয়ে এদের সাহায্য করতেন। দুলে বেয়াড়া, হাড়ি বা কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরীয় সুতো গলায় দিয়ে গাজনের সন্ন্যাসী সাজত বটে, অন্তরালে এদের পিছনে কিন্তু মদত থাকত বাবুদেরই। বাবুদের শিবতলাতেই উঠত গাজন। পোঁতা হত চড়ক গাছ। আর চড়কের বীভৎস খেলাগুলিতে বাবুরাই সব থেকে মজা পেতেন।

সারা চৈত্র মাস সন্ন্যাসীদের উৎসবে মুখর। ছুতোর-গয়লা-গন্ধবেনে-কাঁসারীরা আনন্দে হয়ে উঠতেন উতরোল। ওঁদের সর্বাঙ্গে থাকত গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার। সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ি পরতেন এঁরা মালকোচা দিয়ে। হাতে থাকত তারকেশ্বরের ছোবান

গামছা এবং গলায় ঝুলত বেলপাতা বাঁধা সুতো। এঁরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন এবং বলে বেড়াতেন, 'আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!'

চড়ক উৎসব উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা আসত কালীঘাট থেকে। এটি সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। ওই সন্ন্যাসীরা কালীঘাটে গিয়ে বাণ বিঁধিয়ে আসতেন। বিশপ হেয়ার এ দেশে এসেছিলেন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছু পরে। কলকাতা তখন অনেক সভ্য এবং অনেক সাহেবী। তবু তখন তিনি এই অপরূপ গাজন-সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা দেখা থেকে বঞ্চিত হননি। চৌরঙ্গীর পথ দিয়ে আসছিলেন তাঁরা হাজারে হাজারে। গলায় ছিল জবা ফুলের বড়ো বড়ো মালা। সারা গা সিঁদুরে লাল। পরনে একটি করে নেংটি।

ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পথ কাঁপিয়ে প্রতি বছর এই ভাবেই এগিয়ে আসতেন সন্ন্যাসীরা। চৈত্র সংক্রান্তির পথের ধূলোয় কালীঘাট থেকে কলুটোলা হয়ে যেত কালো, তারপর ওই ধূলোর শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত মেছোবাজার হয়ে আরো উত্তরে। উদ্বেলিত হয়ে উঠত চিৎপুর।

কালীঘাট থেকে ফেরার পথে লোহার শিক জিভে বিঁধে কোনো কোনো সন্ন্যাসী শোভাযাত্রার আগে আগে আসতেন। বিশপ হেয়ারের স্ত্রী এমনি একটি দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। বিদেশিনী ফ্যানী পার্কসও ওইসব দৃশ্য দেখে হয়েছিলেন অভিভূত ও রোমাঞ্চিত। হাচিসন ও ক্যাপটন মাণ্ডির মত শক্ত মানুষেরাও চড়কের বিভৎসতায় বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

চড়কের বীভৎস খেলাগুলির ভেতর প্রধান ছিল বড়ো বড়ো ও মোটা বঁড়শিতে নিজেকে বিদ্ধ করে চড়কগাছে ঘোরা। চড়ক গাছগুলি আকারে হত বিরাট। ওই বিরাট গাছে ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটাতেন সন্ন্যাসীরা। ছিটকে পড়তেন তারা গাছ থেকে এবং মুহূর্তের ভেতর তারা বরণ করে নিতেন মৃত্যুকে। সেকালের খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই দেখা যেত এই ধরণের ঘটনার বিবরণ।

এ ছাড়া আরো নানান খেলা ছিল। বীভৎসতার দিক থেকে সেগুলি কিছু কম ছিল না। ছিল কাঁটা ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ ও বাণ ফোঁড়া। আর ছিল ঝুল সন্ন্যাস। কাঁটা ঝাঁপে তলায় কাঁটা বিছিয়ে অনেক ওপর থেকে ঝাপ মারত সন্ন্যাসীরা। এতে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হত। পরবর্তী কালে অবশ্য

এ কাঁটার ভেতর অনেক কারচুপি করা হত। হুতোমের বিবরণ থেকে জানা যায়—সন্ন্যাসীরা বেশ কয়েকদিন আগে কাঁটা কেটে ফেলে দিয়ে আসতেন পুকুরে। বাবলা নয়, শিয়াকুল নয়, এ কাঁটা হত বৈঁচির কাঁটা। দিন তিনেক আগে পুকুর থেকে এ কাঁটা তুলে নিয়ে আসা হত গাজন তলায়। বিশ আটি খড় বিছিয়ে ওই কাঁটাগুলিকে বেশ করে পেটান হত। নষ্ট করে দেওয়া হত তীক্ষ্ণতা। তারপর এর ওপরে কাঁটা ঝাপের খেলা খেলত সন্ন্যাসীরা।

পরবর্তীকালে এই কাঁটা ঝাপের অন্তঃসারশূন্যতা কোথায় গিয়ে পৌছেছিল, তা হুতোম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সকৌতুকে হুতোম জানিয়েছেন, খেলার পর মেয়েরা সাগ্রহে এর কাঁটা সংগ্রহ করতেন। কারণ মেয়েপ্রবাদে বলত, 'ঝাপের কাঁটার এমনি গুণ যে ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হয় না।'

বাণ ফোঁড়ার বিবরণ আগেই দেওয়া গেছে। বঁটি ঝাঁপ ছিল কাঁটা ঝাঁপেরই অনুরূপ। অর্থাৎ কাঁটার বদলে এখানে বঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। 'ঝুল সন্ন্যাস' ছিল এরই ভেতর একটু বৈচিত্রপূর্ণ। খোলা মাঠে বাঁধা হত ভারা। ভারার নীচে ধরা হত জলন্ত খড়ের আগুন। ভারার বাঁশে ওপর দিকে পা আটকে সন্ন্যাসীরা নীচের দিকে রাখতেন মাথা ঝুলিয়ে। নীচে মুখের কাছে ধরা হত আগুন। গুড়ো ধুনো ছড়িয়ে দেওয়া হত আগুনে। ওই ধোঁয়া আর আগুনের ভেতর মুখ গুঁজে ঝুলতে থাকতেন সন্ন্যাসীরা। ভক্তরা এ দৃশ্য দেখে 'বাহ!' 'বাহ!' করত।

তবে খুব বেশী দিন সভ্য মানুষেরা এই ভয়ংকর আচরণগুলি অনুমোদন করতে পারেনি। এ সব প্রথা নিরোধ করবার জন্য ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল একটি জনমত। ধীরে ধীরে শাসকেরাও উপলব্ধি করলেন,…'হাড়ি বাগদি প্রভৃতি অন্তজ জাতীয় লোকেরা অপর্যাপ্ত সুরা পান করিয়া সর্বাঙ্গে লোহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেবরে ভিক্ষার্থ অটন করে, তাহাদের ভয়ংকর অবস্থা দর্শনে সকলেরই মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার হয়, ওই নির্দয় ব্যবহারে বর্ষ বর্ষ অনেক লোকের জীবননাশও হইয়া থাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট বন্ধ করে দিলেন এই প্রথা আঠারোশ বত্রিশ-তেত্রিশের কিছু আগেই। পরে ভারত সংক্রান্ত স্টেট সেক্রেটারী এই চড়কের কথা তুললেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। সদস্যদের সম্মতি নিয়ে নির্দেশ পাঠালেন, 'যদি চড়ক

পর্বের বাণ বিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহার রহিত করণে হিন্দু প্রজারা অপত্তি না করে, তবে ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট যেন ওই সকল কুপ্রথা রহিত করেন।'

না, হিন্দুরা আপত্তি করল না। সতীদাহ প্রথা একদা যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চড়কের কুৎসিত প্রথাও তেমনি একদিন নিষিদ্ধ হয়ে গেল আইন করে।

ওইগুলি নিষিদ্ধ হবার পর চড়কের উৎসবে আর যা রইল, তা হল মেলা ও সঙ। পাড়ায় পাড়ায় খুব জমকালো করে সেদিন মেলা বসত। ছাতুবাবু লাটুবাবুদের মাঠে চড়ক উপলক্ষে যে মেলা বসত, তা ছিল যেমন আড়ম্বরপূর্ণ, তেমনি বিরাট। পথের ধারে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সঙের মিছিল। এ সঙে থাকত নানা রকমের সামাজিক ব্যাঙ্গ চিত্র। কখনো দেখা যেত 'গোদ পুজোর দৃশ্য।' কখনো দেখা যেত ভণ্ড-তপস্বীকে। আবার কখনো দেখা যেত ডালিওয়ালা তক্তার ওপর ধ্যানরত নারী লোভী সেই পুরুষটিকে। বেহারার তাকে নিয়ে চলেছে কাঁধে করে। আর সে চলেছে মালা জপ করতে করতে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। না, চারদিকে সবার ওপর নয়, 'তাহার দৃষ্টি কেবল চতুর্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই।'

মোটকথা, এই রকম ছিল বাবুকলকাতার চড়ক। আনন্দে-উত্তেজনায় প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আবেগ মুখর। রুক্ষ চৈত্রের দিনগুলি নানা বৈচিত্র্যে সরগরম হয়ে উঠত। ঢাকের শব্দে, গাজনের গর্জনে, বাবুদের শৌখীনতায়, বেলফুলের গন্ধে এবং শেষে ওই সঙের তামাশায় বছরের শেষ দিনটি কেমন করে যে হারিয়ে যেত তা সেকালের কেউই তেমন করে খেয়াল করতে পারতেন না। কারোরই হুঁশ থাকত না। পরের দিন ভোরবেলায় কেল্লার তোপ পড়ার শব্দে যখন বাবুরা জেগে উঠতেন, তখন তাঁরা চোখ কচলে দেখতেন, এ আরেক দিন। নতুন দিন। নতুন বছর।

আর এই নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার জন্য তাঁরা এতই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন যে চড়কের অতীত কথা তখন আর তাদের মনেই থাকত না।

যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল

দিল্লীর একদল অরসিক নগর-কোটালের হাতে অধুনা কোতল হয়েছেন যিনি, সেই ঋষি বঙ্কিম একদা দুঃখ করে বলেছিলেন, '...গুরুতর বিপদ বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত। কিন্তু তাঁহাদের একথা অসহ্য যে পরাধীন দুর্বল হিন্দু জাতি, কোনকালে সভ্য ছিল, এবং এই সভ্যতা প্রাচীন। অতএব দুই-চারিজন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত।'

সেকালে বাঘা বাঘা ফিরিঙ্গি ইন্‌ডোলজিস্ট-এর দার্পটে কালো নেটিবেরা রীতিমত তটস্থ শঙ্কিত। নিত্যি নতুন পিলে চমকানো সংবাদ পরিবেশন করতেন তাঁরা। চাঁদপালঘাটে একেকটি করে পালতোলা জাহাজ এসে লাগত, আর সে জাহাজ ভরা হরেক রকম গবেষণার খবর আসত। কখনো কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা চামড়ার সেই কীর্তিমান ইনডোলজিস্টরাও দেখা দিতেন। রুক্ষ কটাচুল উড়ন্ত হাওয়ায়। নীল চোখে ঝলসে উঠত ভর্ৎসনা। ছাঁটাছোঁটা কুর্তিপরা ঐ যবন পণ্ডিতদের মুখের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন এলেম কারো ছিল না। এঁদের দেখে ভেতর থেকে আপনাআপনি উথলে উঠত ভক্তি। ঢাকঢোল বাজিয়ে কালো নেটিবরা সেদিন এঁদের স্বাগত না জানিয়ে পারত কই?

কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল।
যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাকঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি—গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে ভারী উগ্র মূর্তি।

ভারতবিদ্যার এই ক্ষুদে নবাবেরা রঙে সাদা হলেও ছিলেন এঁরা নানান জাতের। কেউ জার্মান, কেউ ইংরেজ। ফরাসী ও মার্কিনীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। বরং কেউ কেউ দু' কদম এগিয়ে ছিলেন। একালের শহর দিল্লীর ছোটলাটেরা সম্ভবত খবর রাখেন না—ঐ ভারতবিদ্যার ডাকসাইটে পণ্ডিতদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কি ধরনের পরিচয় ছিল! অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই

তাঁদের গবেষণা আমাদের সাহিত্যনায়ক পড়েছিলেন। প্রতিটি ছত্র-প্রতিটি শব্দ গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখেছিলেন তিনি। জেমস ফারগুসন, আলব্রেখট ভেবর, উইলিঅম ডুইট হুইটনি, ডক্টর লোরিঞ্জের, মনিয়ার উইলিঅমস্, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট প্রমুখ কীর্তিমানদের লেখা ত পড়েছিলেনই, উপরন্তু যাঁদের লেখা এতটুকুও বাদ দেননি, তাঁদের মধ্যে আছেন—কোলব্রুক, কর্জন, প্রাট, উইলফোর্ড, বুকানন, বুর্বফ, এলফিনস্টোন, শ্লেগেল, লাসেন, বেনফী, থিওডোর মার্টিন হৌগ, হোরেস হেমান উইলসন, স্পিজেল, রেনা, মুর আর ম্যাক্সমূলার থেকে মহর্ষি থিওডোর গোল্ডস্টুকর প্রমুখ সকলে। কিন্তু দুঃখ এই, এঁদের অনেকের লেখাই নানান ভুলে ভরা। অজ্ঞতার জন্য অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে। না, এ সেরকম নয়। এটি ইচ্ছে করে করা। ভারতবিদ্যার ওস্তাদদের ঐ স্বেচ্ছাকৃত ভুল ভারতীয়দের মুখে কালি মাখানোর জন্য ব্যবহৃত। যে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা মনোরম নয়। বরং গা-জ্বালা করাই স্বাভাবিক। উপায় থাকলে সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র এক হাত লড়ে যেতেন। কিন্তু হায়, লড়বেন কার সঙ্গে? আমাদের দেশের লোকেরাই সেদিন যে ঐ ফিরিঙ্গি ইনডোলজিস্টদের ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো করতে আরম্ভ করেছে। এসব দেখে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রুদ্ধ না হয়ে পারলেন না। আর ঐ ক্রোধ থেকে জন্ম নিল—'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' বা 'কোনো বিলাতী সমালোচকের' লেখা 'রামায়ণের সমালোচনার' মত রচনার। ক্ষুরধার ব্যঙ্গে দেশবাসীর জ্ঞানচক্ষুকে খুঁচিয়ে তোলাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য।

ভারতবিদ্যার ঐ দিকপালেরা ভারত সাগরের হাঁটু জলে নেমে বিরাট সাঁতারুর আখ্যা পেতে চেয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগালড স্টুয়ার্টের অভিজ্ঞতাই সব থেকে মজাদার। তিনি জলে না নেমেই সাঁতারু। সংস্কৃত না পড়েই তিনি ভারতবিদ্যার রাজহংস। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল—সংস্কৃত বলে আদৌ কোনো ভাষা নেই। স্যার উইলিঅম জোন্স বা ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতদের এ এক কারসাজি। বানানো ভাষা। নিজেদের পশার জমজমাট রাখার জন্য এ হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন।

ডক্টর লোরিঞ্জের আরেক বিখ্যাত নাম। ইনি অনেক পড়াশোনার পর আবিষ্কার করেছিলেন—'খ্রীষ্ট' থেকেই 'কৃষ্ণ' নামের উদ্ভব। ভাগবত গীতা আগাপাস্তলা বাইবেলের অনুবাদ।

এহ বাহ্য। চূড়ামণি-শিরোমণিরাই কি কম ভুল করেছেন? স্বয়ং

ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত ছোটখাটো ভুলের হাত থেকে রেহাই পাননি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণার সঙ্গে তিনি ছিলেন পরিচিত। উপকৃতও। অথচ মিত্র মশায়ের জাতি পরিচয় তিনি ভুল করে বসলেন। 'চীপস্ ক্রম এ জার্মান ওয়ার্কশপ' গ্রন্থে কায়স্থ রাজেন্দ্রকে তিনি ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করলেন কেমন করে? একজন বিখ্যাত ভারতবিদের কলম থেকে এ ভুল বেরোয় কেন? কোনো ভারতীয় যদি ম্যাক্সমূলার সম্পর্কে এহেন ভুল তথ্য দিতেন, তাকি মার্জনীয় হত?

তবে আমাদের দিক থেকে এগুলি নিশ্চয় মার্জনাযোগ্য। কেননা, আমরা আগে থাকতেই ধরে নিই যে বিদেশীর পক্ষে এতো জানা সম্ভব নয়। এগুলি যথার্থই ভুল। কিন্তু দুঃখ এই, ভারতবিদ্যার শাহানসারা এখানেই থেমে থাকেননি। অনেক পণ্ডিত-মূর্খ আছেন যাঁরা মুখ পোড়াবেন বলে নিজে নিজেই ল্যাজে আগুন বেঁধেছেন। এঁরা যুক্তির ধার ধারেননি। যা দেখেছেন তাই উড়িয়ে দিয়েছেন তুড়ি মেরে। এঁদের ভেতর কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ। হিন্দু জ্যোতিষের প্রাচীনতা? নাঃ, সে কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওটি নির্ঘাৎ চীন, যবন বা কালডিয় থেকে গৃহীত। হিন্দুর গণিত? স্রেফ চুরি। লিখিত অক্ষর? ওসব আবার ভারতীয়েরা কোথায় পাবে? সেমীয় জাতি এদের দিয়েছে—এরকম নানা ধরনের নাটকীয় সিদ্ধান্তের পিছনে বিদেশী তর্কচঞ্চু মশাইরা কোনো যুক্তি দেখাবার দায়িত্ব স্বীকার করেননি। যেসব তথ্যের দ্বারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পায়, সেগুলি সম্পর্কে এঁরা উদাসীন নতুবা অবিশ্বাসী। তবে দোষ বা কলঙ্কের কথা পেলে মনে করেন যে ওগুলি নির্ঘাৎ ভারতীয়। পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যকে এঁরা অস্বীকার করেন। কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পাঁচটি বিয়ের খবরে ঐ গবেষকরা সোচ্চার না হয়ে কি পারেন? আর কিছু না হোক, ভারতীয় মেয়েদের মুখে কালি ছিটানো ত যায়। পাঁচটি বিয়ের সূত্র ধরে ওঁরা প্রমাণ করতে এগিয়ে আসেন—প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চুয়াড় জাতি ছিল।

জেমস ফারগুসন সেকালের এক বাঘা পণ্ডিত। তাঁর উপাধি রাজসভার ডাকসাইটে শিরোমণিদের লজ্জা দেয়। তিনি সি. আই. ডি. সি. এল, এল. এল. ডি, এফ. আর. এস এবং এফ. জি. এস। ভারতীয় গবেষকদের নাক-কান কেটে নেবার মত লোক। ছেলেবেলায় লেখাপড়ার পাট ইনি চুকিয়ে দেন

এভিনবরায়। তারপর নিতান্ত তরুণ বয়সে সপ্তডিঙ্গা মধুকর চেপে ইনি চলে আসেন কলকাতায়। বাঙলা দেশের আকাশে বাতাসে সেদিন টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। নীলের ব্যবসা করে-সাহেব জাহাজ ভর্তি টাকা করেন। টাকা কামানোর ফাঁকে ফাঁকে একটু সংস্কৃত চর্চাও করেন। এদেশের পুরাকীর্তি ছিল সাহেবের কৌতূহলের বিষয়। দূরদূরান্তের নানান মন্দির ঘুরে ঘুরে ইনি বিভিন্ন রকমের তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ করতেন। দেশে ফিরে গিয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে নিজেকে জাহির করলেন। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হলেন। পরে কেবল সদস্য নয়, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। মথুরা অঞ্চলের কয়েকটি অপূর্ব মূর্তি দেখে ইনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ওগুলি কখনই ভারতীয় নয়। ও সৌন্দর্য নেটিব ভাস্কররা কোথায় পাবে? ওগুলি নির্ঘাৎ গ্রীক প্রভাবের ফল। না, সাহেব এখানেই থাকলেন না। বরং আরো এক কদম এগিয়ে গেলেন। ভারত-ভাস্কর্যের বিবস্ত্রা স্ত্রী-মূর্তিগুলি দেখে ওঁর চোখ উঠল কপালে। অমন পীনোন্নত পয়োধর, নিখুঁত নিতম্ব, সংকীর্ণ কটিদেশ প্রভৃতি দেখে সাহেবের মাথায় একটি চিন্তাও খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। উনি শয়ে শয়ে ঐ সব নগ্ন নারী মূর্তি দেখে ধারণা করলেন যে ভারভীয় মেয়েরা কাপড় পরতে জানত না। ভাস্কর্যের মত গৃহাঙ্গণেও এরা সদা-সর্বদা নগ্ন হয়ে থাকত।

খ্রীষ্টীয়ান লাসেন আরেক খ্যাতিমান। জাতে জার্মান। ভারতবিদ্যার গবেষণায় ইনি আকবর বাদশাহ। কিছু না হোক, এঁর কল্পনায় অন্তত বাদশাহী গরিমা আছে। ভারতবিদ্যার বিশ্বকোষ লিখে ইনি পেয়েছিলেন অক্ষয় খ্যাতি। এই জার্মান সন্তান কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের ঐতিহাসিকতাকে মাত্র স্বীকার করতেন। কুরুপাণ্ডবের নয়। মহাভারতের যা কিছু আছে সবগুলিকে প্রতীক অথবা ধাতুপ্রত্যয় বলে উড়িয়ে দিতেন। ইনি প্রচার করতেন—অর্জুনাদি সবই রূপক। 'অর্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চপাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পঞ্চজাতির একীকরণে সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই সুভদ্রা ইত্যাদি ইত্যাদি।'

খ্রীষ্টীয়ান লাসেনের দার্শনিক ব্যাখ্যার সত্যি সত্যিই আমেজ আসে। মনে হয় দুনিয়া ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। দুনিয়া উড়ে যাক ক্ষতি নেই, সাহেবের

গবেষণা অটল থাক, এটুকুই হয়ত তাঁর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তাই কি হয়? ছোট্ট একটি 'লস্' ধাতু খোদ লাসেনের ব্যুৎপত্তি ভেঙে তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণাকে ক্রীড়া কৌতুক বলে উড়িয়ে দিতে পারে তা কি সাহেব একবারও ভেবে দেখেছিলেন?

টলবরেজ হুইলার ছিলেন আরেক শিখাধারী পণ্ডিত। সাহেব সংস্কৃত ভাষার স্বর-ব্যঞ্জন পর্যন্ত চিনতেন না। তাতে কি? তাই বলে কি পাণ্ডিত্য আটকায়? অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বলে এক বাবুকে দিয়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করান। বাবু নির্ঘাৎ সাহেবের নাড়ি দেখতে জানতেন। তাই সাহেবের উপযোগী কাশীদাসী মহাভারতের কয়েক পাতা অনুবাদ করে দিলেন। সেই বুড়ির কথা হয়ত অনেকের মনে থাকতে পারে যে বেচারি মাণিকপীরের গান শুনে রামায়ণ ভ্রমে ঘন ঘন অশ্রুমোচন করেছিল। সাহেবেরও ঐ দশা হল। ঐ ক পাতা কাশীদাসী পড়েই সাহেব ইনডোলজিস্ট সাজলেন। অন্য কিছু নয়, তিনি জানালেন—মহাভারতের মূল কথা হল, 'ওয়ারস অব দি এরিয়ানস এগেনসট অ্যাবরিজিনস।' বাকি সব ফক্কিকার। 'পেল্‌পেব্‌ল ফিকশান্‌স্।'

না, আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। এহেন ভারতবিদ্যার গবেষক অজস্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আলোচনায় এসব পণ্ডিতদের নানাভাবে ঠাঁই দিয়েছেন। কেউ কপালে তারকা সেঁটে, আবার কেউ বা ত্রিশূল হাতে ফুটনোট আলোকিত করে বসে আছেন।

তবে গুরুশিষ্য ভেবর-হুইট্‌নির কথা না বললে আলোচনা বোধ হয় অসমাপ্ত থেকে যায়। কেননা, 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনায় সাহিত্য সম্রাট এঁদের ঘন ঘন স্মরণে এনেছেন। আর কেবল স্মরণে আনাই নয়, জয়তিলক পরাতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

আলব্রেখট্‌ ভেবর ছিলেন এক দুঁদে জার্মান পণ্ডিত। ব্রেজলাউ-বন-বার্লিনে সাহেবের পড়াশোনা। উচ্চতর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শেখার জন্য সাহেব গিয়েছিলেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় ইনি প্রথমে বৈদিক। যজুর্বেদীয়।—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেট্‌স প্রদেশের নর্দাম্পটনে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মাবার এগারো বছর আগে উইলিঅম ডুইট হুইট্‌নির জন্ম হয়। যৌবনে ব্যাঙ্কের কেরানী। ঐ চাকরীর ফাঁকে ফাঁকে অবসর কাটানোর জন্য উদ্ভিদতত্ত্ব, পক্ষী বিজ্ঞান এবং জার্মান ও সুইসভাষার একটু একটু চর্চা করতেন।

একদা আকস্মিকভাবেই তাঁর সংস্কৃত পড়ার কৌতূহল হল। বয়স যখন তেত্রিশ, দৌড়ে এলেন ইউরোপে বোপ ও ভেবরের কাছে সংস্কৃত পড়তে। গুরু আলব্রেখট্ ভেবরের পথ ধরে নেমে এলেন তিনি ভারতবিদ্যার বে-ওয়ারিশ দরিয়ায়। গুরুর মতই ঝাঁপাঝাঁপি আর সাঁতার কাটা আরম্ভ করে দিলেন।

আলব্রেখট্ ভেবরের কয়েকটি মতামত সত্যিসত্যিই রোমহর্ষক। ভারতীয় জ্যোতিষের গৌরব কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই উঠে পড়ে লেগেছিলেন কি করে তাকে খর্ব করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি যুক্তিও খাটিয়ে ফেললেন। কস্মিনকালেও বাবিলনীয় চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল ছিল না—এ তত্ত্ব জেনেও তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করে দিলেন যে হিন্দুরা ওটি বাবিলনীয়দের কাছ থেকে নিয়েছে। শিষ্য হুইট্‌নি আরেক কাঠি বাড়া। বিপক্ষে বলার মত কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি মন্তব্য করলেন —হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে তারা নিজের বুদ্ধিতে এত করতে পারে। সুতরাং—

না, ভেবর সাহেবের অনেক কীর্তির খণ্ড ছিন্ন মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণে নাম পাওয়া যায় নি এ অজুহাতে তিনি মহাভারতের প্রাচীনতা অস্বীকার করেছেন। মহাভারতের অনল্পপরবর্তী গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে পাণ্ডবদের নাম নেই যখন, তখন পাণ্ডবদের স্বীকার করেন কেমন করে? মহর্ষি থিওডোর গোল্ডস্টুকর অবশ্য দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে পাণিনিতে পাণ্ডবরা আছেন। স্ব-নামেই। আর পাণিনির প্রাচীনতা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী তো বটেই। অন্ততঃ নিশ্চিতভাবে বুদ্ধদেবের আগে।—ভেবর এসব ছোট কথায় কান দিলেন না। নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ভাবখানা এই, বয়সে তুমি আমার থেকে চার বছরের বড়ো হতে পারো, কিন্তু জয়পতাকা উড়িয়েছে কে? সে আমি নয়?

এ সব দেখে গত শতকের বাঙালীদের চোখ ছানাবড়া। বঙ্কিমচন্দ্র এ হেন কীর্তিকলাপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের ডাক দিয়ে বলেছেন—'পাঠকেরা অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় ভেবর সাহেবের জয় গাই।'

পাঠকেরাও প্রস্তুত। শুধু গলায় নয়, ঢাকঢোল বাজিয়ে তাঁরা যবন পণ্ডিতদের জয়ধ্বনি করতে চান। তবে অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, যবনকুলে সত্যিকারের পণ্ডিত কি কেউ ছিলেন না?—ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সেই মনীষীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যঙ্গ নিবেদিত হয়নি কখনো।

অথ মহামর্কট কথা

রামায়ণ সমালোচনা নিয়ে যে মর্কটীয় কাণ্ড শহর দিল্লীতে ঘটে গেল, শুনলে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন, এর একেবারে মূলেতে সত্যি সত্যি এক মহামর্কট বিদ্যমান ছিলেন।

সে বারো শ' উনআশি সালের কথা। শীতকাল। লর্ড নর্থব্রুকের কলকাতায় তখন সকাল হত লেপ-কাঁথার তলায় আড়িমুড়ি ভেঙ্গে। সেকাল গোটা নেটিবপাড়া খবরের কাগজ পড়ত পিঠে রোদ্দুর দিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে। পরে এরা যেত বাজার-হাট—আপিস-কাছারি। ঐরকম এক সকালে বাবুদের হাতে এসে পৌঁছুল একটি পত্রিকা। ছোট, কিন্তু রসাল। পৌষ সংখ্যাব বঙ্গদর্শন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনেকেরই চোখ আটকে গেল একটি বিশেষ লেখায়। লেখাটির নাম, 'রামায়ণের সমালোচনা'। তার গায়ে বিলায়েতী গন্ধ আবিষ্কার করা সেদিন সম্ভব ছিল না। কেন না, লেখাটি ছিল খাঁটি দেশজ; তলায় লেখকের নাম—মহামর্কট। ওপরেও লেখা ছিল,—'শ্রীমদ্ধনু-দ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত'। বংশগত গৌরবে লাঙ্গুল আস্ফালন করে মর্কট মশাই একটি রসের আলোচনা ফেঁদেছেন।

পুরনো কলকাতার আর যা দোষ থাক, একালের দিল্লীর মত সে গোমড়া-মুখো 'গোঁয়ার গোবিন্দ' ছিল না। বরং নানান রতিকতায় সে সদাই ডমমগ। রামায়ণ সমালোচনা?—সে ত তুচ্ছ। অভিনব কৌতুকভাষ্য পর্যন্ত তার মুখ ভার করাতে পারে না। বঙ্গদর্শনের রহস্যরচনাগুলির পিছনে যে বঙ্কিমের কলম উচ্ছলিত, কৌতূহলীরা সে খবর ভালোভাবেই রাখত। সেকালের বাঙলায় রঙ্গরসিকতার আরেক নাম দীনবন্ধু মিত্র। উনি আবার বঙ্কিমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। স্বয়ং বঙ্কিমও স্বীকার করতেন যে, উনি হাস্যরসের ঐন্দ্রজালিক। নব নব রঙ্গের নির্মাতা। সেকালের লোকেদের মুখে মুখে তার রঙ্গ ঘুরে বেড়াত।

এক শ' বছর পেরিয়ে এসে আজ যদি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সেদিন কি এমন ঘটেছিল যা বঙ্কিমকে ঐ ধরনের একটি লেখা লিখতে প্ররোচিত করেছিল; তবে তার জবাব খুঁজতে নিশ্চয় আমাদের তৎকালীন কলকাতার হাসির বাজার চুঁড়ে বেড়াতে হবে না। কেননা, সেদিন এটাই ছিল স্বাভাবিক। একটু পিছু হাঁটলেই আমরা একটি 'বারিক' পাবো। জামাই বারিক।

সেখানে ঢুকলেই রামায়ণ সমালোচনার একবারে উৎসে পৌঁছুন যায়। সমাজ বৃক্ষের ডালে ডালে ন্যাজ ঝুলিয়ে যেসব কীর্তিমানরা সেদিন বসে ছিলেন, তাঁদের অভিনব প্রতিভাকে নিয়ে এ কৌতুকের হাট।

জামাই বারিকের প্রকাশকাল, আঠারো শ' বাহাত্তর। মার্চ মাস। রচয়িতা —ঐ দীনবন্ধু মিত্র। বেরোন মাত্র, নাটকটি লোকের মন জয় করে নিল। জামাই বারিকের রামায়ণ ভাষ্য ও পারের গান অর্জন করল অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তাই মহামর্কটের রামায়ণ সমালোচনা পড়তে গিয়ে পঞ্চম জামায়ের রামায়ণ কথকতা অনেকেরই মনে পড়ল। সে রামায়ণটি কেমন তার পরিচয় একটু নেওয়া যেতে পারে। মর্কটের সঙ্গে মেলে কি না দেখা যাক।

'এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম নয়, বাবা। তবে শোনা,—ঐ যে রোজ সকাল বেলা অর্থাৎ যামিনী বিগত হলে, পূর্ব দিকে পরমরুণয়া প্রশাতি দৃশাং, ভারি লাল রক্তবর্ণ হিঙ্গুলের মত, কাঁচা সোনার ন্যায় একখানা চকমকে থালা উদয় হয়, ওটা সূর্য। তোমরা ভাব ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি যায়, এমন নয়; ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য বংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্বংশ। এই সূর্য বংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিল, মহাবল পরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর, নাগর ডাগর রাজা। অন্দর মললে রানীর পাল; পালঝাড়া রানী অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না; বাড়িতে ছেলের ভাঁজ নাই।'

এ হল ভূমিকা। কেবল কাহিনীর অসঙ্গতি নয়, ভাষ্যকারের চাতুরি, গ্রাম্য কৌতুক এবং অসংলগ্ন নিরর্থক শব্দগুলিকে সার্থক বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগের চেষ্টা হাস্যরসের প্রবাহকে অবারিত করেছে। সূর্যবংশ ও রাজা দশরথের পরিচয় শেষ হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন থেকে রাম লক্ষ্মণের বনবাস।—'রাজা কিংকর্তব্য অনূঢা হয়ে খুব গাঁ্যাটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোছ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ। ঋষিবর যোগ আরম্ভ করলেন। —বাবা কার দ্বারা কি হয়, কে বলতে পারে; রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার করতে লাগলো। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে লিখতে দিলে। অল্পকালের মধ্যে আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্মপলাশলোচনবৎ ফুলে উঠল।'

ইংরেজীতে যাকে বলে 'ম্যালাপ্রপিজম' তার সার্থক ব্যবহার দীনবন্ধুই বোধ হয় আমাদের সাহিত্যে প্রথম দেখান। কেবল শব্দের রঙ্গ নয়, জামাই বারিকের ইমেজেও রামায়ণ কাহিনী দর্শকদের কাছে অভিনব হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে কথক ও শ্রোতা উভয়ের ভেতরএক অদৃশ্য রসসংযোগ গড়ে উঠছে। এর পর রাজপুত্রদের পরীক্ষা। তীর ধনুক নিয়ে নয়। শালাবাবুদের যেমন কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়ার পরীক্ষা হয়, এ তেমনধারা পরীক্ষা। এখানে নির্ভুল উত্তর দেওয়ার অপরাধে রাম লক্ষ্মণকে পিতার আদেশে বনে যেতে হল। আর ভুল জবাব দেওয়ার গৌরব কনিষ্ঠ দু'জনের কপালে জুটল রাজ্যলাভ। তারপর পঞ্চবটী বনে গিয়ে যা ঘটল, তা এরকম—'কিচকিন্দা অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটাওয়ালী উপস্থিত হয়। জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রামলক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল, বালী রাজাকে বললে, 'খ্যামটাওয়ালী দুটোকে আমাদের দাও।' বালী বলে, দেব না। ঘোর যুদ্ধ। বালী রাজা বধ। খ্যামটাওয়ালী দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা, সেটা নিলে রাম, আর যেটার নাম শূর্পণখা সেটা নিলে লক্ষ্মণ।'

পরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত। লক্ষ্মণের হাতে শূর্পণখার কান নাক কাটা গেল। সে রাগে রাবণ রাজা হরণ করল সীতাকে। এ হেন নাটকীয় বিড়ম্বনায় রাম হয়ে গেল ভ্যাবা গঙ্গারাম। —রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম; লকার বুদ্ধিতে খর্জুরকণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ, ছল বল, দুর্বল, কল-কৌশল তার সকলি হস্তগত; বললে, 'দাদা, তুই কাঁদিস কেন? পাঁচ পয়সার টিকে আন, আর পাঁচ কুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্ছি। রাম তাই কল্লেন।'

অতঃপর লঙ্কাকাণ্ড। টিকে দিয়ে হনুমানের ল্যাজে আগুন বাঁধা হল। ল্যাজের বেড়া আগুনে সবংশে পুড়ে মরল রাবণ রাজা। উদ্ধার হল সীতা। এ অভিনব রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির কাহিনী মেলে না দেখে কোনো কোনো জামাই প্রশ্ন তুলেছিল। ভাষ্যকার দাবড়ানি দিয়ে এর জবাব দিয়েছে— 'বেল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিলবে কেন? কিন্তু মূল এই।'

বেল্লিকের এই কৌতুক থেকেই বঙ্কিম প্ররোচিত হন। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তিনি যে ক্রুদ্ধ হননি, লোক রহস্যের ভূমিকায় সে কথা অকপটে কবুল

করেছেন। কালামুখ মর্কটেরাই ছিল বঙ্কিমেই লক্ষ্য। লালমুখোরা সেদিন অনেক দূরে।

মর্কটমশাই বেল্লিকের মত গল্পকার নয়, সে সমালোচক। তার বিজ্ঞতার কথা প্রথমেই সে জানিয়ে দিয়েছে। —'আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' রামায়ণের মূল লক্ষ্য কি, সে সম্পর্কে শ্রীমৎহনুমদ্বংশজ মশাই যে সচেতন তাও জানা যায় কয়েক লাইন এগোলেই—'এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য বানরদিগের মাহাত্ম্যবর্ণনা। বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কা জয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

জামাই বারিকের জামাইরা যেমন রামায়ণের স্বচ্ছ আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলেন, এও যেন ঠিক তাই। মহামর্কট নিজেদের বংশগৌরবের কথা ভুলতে পারেনি। জামাইরা যেমন কুকসাহেবের আড়গড়া অথবা খ্যামটাওয়ালী ও বৈঠকখানার বাবুদের সম্বন্ধে সচেতন, মহামর্কটও তেমনি সেকালের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রমুখ আন্দোলনের কথা রামায়ণ সমালোচনার প্রসঙ্গে বিস্মৃত হয়নি। সীতার কথা লিখতে গিয়ে মর্কটমশাই লিখেছেন—'স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে এতটা ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল এবং অন্যের সংসর্গে সুসাধ্য হইয়াছিল এ জন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণে রাখেন।'

স্বার্থচিন্তা বা বৈষয়িক জ্ঞানও মর্কটের কম নয়। লক্ষ্মণের মূর্খতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সে বলেছে—'সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।' ভরতও গণ্ডমূর্খ। কেননা রাজ্য পেয়ে কেউ কি কখনো আবার ভাইকে ফেরত দেয়!

এরকম হরেক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মর্কটমশাই যে নির্বোধ নন, তা অনায়াসে প্রমাণ করেছেন। আর তিনি নিজে যে একটি রামায়ণ লিখেছেন, একেবারে শেষে সেটি জানান দিয়েছেন। বাল্মীকির মত তিনি যখন বিদ্যাবুদ্ধিও কবিত্ব হীন নন, তাঁর রামায়ণ তখন উৎকৃষ্ট হবে না কেন? কদর্য বই ফেলে লোকে

নিশ্চয় ভালো বই পড়বে। মর্কটমশাই সে আবেদন জানিয়েই উপসংহার টেনেছেন—'ভরসা করি, পাঠক মহলে এই কদর্য গ্রন্থখানি পড়া ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য ; কেননা, আমি ত বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ব-বিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। এ কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তারেণ।'

অভিনব রামায়ণকার তাঁর গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমার 'পুনশ্চ' লিখতে হল। এবং এখানেই কৌতুকের চূড়ান্ত—'আমার প্রণীত রামায়ণ আমার ভদ্রাসন বৃক্ষের নিম্নশাখায় পাওয়া যায়। মূল্য এক এক ছড়া সুপক্ক মর্তমান রম্ভা।'

মোট কথা, এ আলোচনা এক নির্দোষ কৌতুক। ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যে বিদ্ধ নয়। আঠারো শ' চুয়াত্তর সালে যেদিন লোক রহস্য প্রকাশিত হল, সেদিনও বঙ্কিম এই মর্কট কারা তা চিহ্নিত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে বঙ্গদর্শনের পাতায় যেমন কৌতুক জমে উঠেছিল, লোক রহস্য তাকেই ধরে রাখল। রচনাটি রহস্যসর্বস্ব হয়েই রইল। জামাই বারিকের মত রইল নির্দোষ।

*　　　*　　　*

পরের ইতিহাসেই নাটক। এক শাখাবিহারী নির্বোধ হনুমান কি করে লালমুখো 'বিলাতী সমালোচকে' পরিণত হলেন সেটাই সব থেকে মজার। এখানে প্রতিটি অঙ্ক ও প্রতিটি দৃশ্য রোমাঞ্চকর। অনেক ঘটনা। অনেক সংঘাত। আর কত চরিত্র এবং কত না নায়ক! তবে দুঃখ এই, আজ সে নাটকের অনেক পাতাই কালের কবলে। বিস্মৃত। নির্বাক অতীত থেকে হারানো সংলাপ আর কখনো শোনা হবে না।

নামভূমিকায় অবশ্যই ছিল বঙ্গদর্শন। রামমোহনে যার সূচনা, বঙ্গদর্শনে তার পরিপূর্ণতা। কেননা, এমন একটা স্বদেশী হাওয়া সে এনেছিল, যার দ্বারা আমরা সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। 'পত্র সূচনাতেই বঙ্গদর্শন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল—আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িবে।'

বঙ্কিমের নেতৃত্বে সেদিন আমরা দল বেঁধে বেরোলাম ভারতবর্ষ খুঁজতে। কেবল বঙ্গ নয়, আরম্ভ হল ভারতদর্শনের পালা। পথে বেরোতেই আরো নানান পথিকের দেখা মিলল। কেউ চলেছে ঘোড়ায়, কেউ বা উটের পিঠে। ভারতবিদ্যার পণ্যসম্ভার নিয়ে যেসব যবন পণ্ডিতেরা চলেছিলেন, বাধ্য হয়েই তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। দেখতে হল পণ্যগুলি নেড়ে-চেড়ে। 'ভারতকলঙ্কে'র বাঁকা গলিতে সাহেব এলফিনস্টোনের সঙ্গে দেখা হল। দু একটি কথা বলতেই বোঝা গেল, 'ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।' এমন কি ম্যাক্সমূলারের মত অমন জহুরী ও জাঁদরেল পণ্ডিতের কাছ থেকেও বেরিয়ে পড়ল এক আধটি ঝুটো মাল। আচার্য থিওডোর গোল্ডস্টুকর অবশ্য সাহেবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। জার্মান পণ্ডিত এ সতর্কতা আমল দেননি। জেমস মিলও কোনো যুক্তি না দেখিয়ে ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গে কালি মাখাতে কোনো সঙ্কোচ করেন নি। এসব দেখে সত্যি সত্যিই আমাদের ঘাবড়াবার পালা। বৃহল্লাঙ্গুলের গল্প ফেঁদে বঙ্কিম তাই ফুটনোটে ঐ অভিনব যুক্তিবিদ্যার অবতারণা করে লিখলেন—'পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে ম্যাকক্সমূলার স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা।'

বেদের অপর নাম শ্রুতি। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসছিল এ শাস্ত্র। নিশ্চয় তারা লিখতে জানত না। নইলে প্রাচীন আর্যেরা বেদ লিখে রাখল না কেন? প্রাচীন আর্যদের লিপিবিদ্যা ঐ একটি কথায় খারিজ করে দিলেন মহর্ষি ম্যাক্সমূলার। আর জেমস মিল ছিলেন মুচির ছেলে। ইণ্ডিয়া আপিসে চাকরি করতেন। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা। ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কে তাঁর একটি বিশাল গ্রন্থ আছে। সুতরাং তাঁকে আটকায় কে?

আর হুইলার সাহেবের ঘোড়া ছোটানো? ইনডোলজির যে ঘোড়ায় চেপে সাহেব মাদ্রাজ-দিল্লী-বর্মা অতি দ্রুত ছুটে চলেছিলেন, তার ক্ষুরধ্বনি ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকেও শোনা যাচ্ছিল। সাহেব প্রথম জীবনে ছিলেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা। তারপর কেরানী। পরে অধ্যাপক। এখানেই কিন্তু ইতি নয়। টপটপ করে ওপরে উঠে গেলেন। সরকারী চাকরির

প্রায় চূড়োয় গিয়ে উঠলেন। জেমস টলবয়েজ হুইলার কি যে সে লোক? ব্রিটিশ-শাসিত ভারত সম্পর্কে তাঁর দরদের সীমা নেই। 'লোকরহস্য' প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে 'দি হিসট্রি অব ইণ্ডিয়া ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট এজেস' বলে একটি গবেষণা মূলক বই লিখে ফেললেন। বৈদিক যুগ থেকে মহাভারতের কাল পর্যন্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত উদ্ধার করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। প্রাচ্যবিদ্যার বিখ্যাত প্রকাশক 'ট্রুবনার অ্যাণ্ড কোমপানিও' বই ছেপে বার করল।

ঠিক এ সময়েই বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ রালফ টমাস হচকিন গ্রিফিথ মহোদয় একটি বিরাট কাণ্ড করলেন। সাহেব অবশ্য সংস্কৃতের ভালো ছাত্র ছিলেন। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছিলেন। বোডেন স্কলার। কবিতা করে ইংরেজীতে তিনি বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করে ফেললেন। পুরো পাঁচ খণ্ডে। 'ইন ফাইভ ভল্যুমস'। প্রকাশক ঐ ট্রুবনার অ্যাণ্ড কোমপানি।

সেকালের শিক্ষিত মহলে ঐ বইগুলি নিয়ে খুব সাড়া পড়ে গেল। আমরা যারা বঙ্কিমের নেতৃত্বে ভারতদর্শনে বেরিয়েছিলাম এ হেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে চোখ বুজে ফেললাম। ফলে, হুইলার সাহেবের ঘোড়ার চাঁট খেতে হল।

এডুইন আর্নল্ড নামে এক সাহেব কবি, যিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ সরস ছন্দে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি হুইলার ও গ্রিফিথকে একসঙ্গে জড়িয়ে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় একটি সরস আলোচনা ফেঁদে বসলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ আলোচনা নানান প্রশংসায় ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। যতদিন যায়, কালা নেটিবদের ঐ আলোচনা নিরর্থক বলে মধ্যে —শেষবেশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র থাকতে পারলে না। —এগিয়ে এসে হুইলার সম্পর্কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে সব ভুলগুলি ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—'বাপু হে হুইলার, মন্দ তুমি লেখোনি, কিন্তু মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তোমার যে একবর্ণও মেলে না! 'ওয়ার্ডস, ফ্রেজেজ্ অ্যাণ্ড ইভন এনটায়ার সেনটেন্‌সেস ডু নট অকার ইন দি ওরিজিনাল ম্যানসক্রিপ্ট'—সুতরাং কল্পিত তথ্য থেকে যদি কোন সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা যায়, তাতে সবটাই ভুল হতে বাধ্য।' — কিন্তু হায়, কে কার কথা শোনে?

এরকম ছোটখাটো অনেক ঘটনা। অনেক। এতদসত্ত্বেও আমাদের চোখ ফোটে না। আমরা নির্লজ্জের মতই সাদা সাহেবদের তুষ্ট করার স্তোত্র

পাঠ করি—'হে সৌম্য, যাহা তোমার অভিমত, তাহাই করিব। আমি বুট প্যাণ্টলুন পরিব, নাকে চশমা দিব, কাঁটা চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।—আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমস্ত হিন্দু সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না।'

নেটিভ সমাজের এই নগ্নতা এবং তথাকথিত সাদা প্রভুদের রিক্ততা যুগপৎ ধরা পড়ল বিশেষ একটি ঐতিহাসিক ঘটনায়। সেকালের ইতিহাসে অমন আড়ম্বরপূর্ণ দিন আসেনি বললেই চলে।

সেদিনের নায়ক হলেন প্রিন্স্ অব ওয়েল্স্ স্বয়ং। আঠারো শ' পঁচাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে এলেন যুবরাজ। 'হিজ রয়াল হাইনেস্' একা এলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এলেন কোঁদা কোঁদা বাঘা বাঘা পণ্ডিত! এলেন 'দি স্পেসিয়ালস্'। এক একজন ভারত-বিদ্যার এক একটি জাহাজ। অন্তত রাজকীয় হিসাব সেইরকম।

তেইশে ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার। কিন্তু বারবেলা। চাঁদপাল নয়, প্রিন্সেপ ঘাটে সেদিন রাজকীয় আড়ম্বর। ঠিক বিকেল সাড়ে চারটার সময় 'সেরাপিস' জাহাজ থেকে লাল কাশ্মীরী গালিচায় পা দিলেন যুবরাজ। পিছনে পিছনে রাজার বিরাট পণ্ডিতবাহিনী। তোপ পড়ল সংবর্ধনা জানিয়ে। দু ধারে গ্যালারি। হাঁ করে সবাই এ দৃশ্য দেখলেন। পরের সন্ধ্যায় কলকাতায় আলোক সজ্জা হল। বাজি পোড়ান হল, তুবড়ি ফুটল। ভারতীয় রাজন্য-বর্গের আবির্ভাবে শহর কলকাতার আভিজাত্যের টেমপারেচার আরও কয়েক ডিগ্রী উঠে গেল।

কেউ কেউ আশা করেছিলেন, যুবরাজের এ সফরে ভারতের সনাতন সভ্যতা সম্পর্কে বিদেশিরা কৌতুহলী হবেন। অন্তত স্পেশিয়ালরা যুবরাজকে সেরকমই পরিচয় দেবেন। আর বিলেতে ফিরে গিয়ে যথার্থ ভারত-পরিচয় দেশবাসীর কাছে তুলে ধরবেন। কিন্তু কয়েক মাসের ভেতর দেখা গেল, সে আশায় ছাই পড়েছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও সখেদে স্বীকার করল—'উই হ্যাভ বিন ডিজাপয়েনটেড্।'

রাজকীয় ঢক্কানিনাদে আমরা যখন বিভোর, সেই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, বোডেন প্রফেসর মনিয়ার উইলিঅমস্ ঘুরে গেলেন ভারতবর্ষ। অক্সফোর্ডের সংস্কৃতচর্চায় যাতে আমাদের সহযোগিতা থাকে, পণ্ডিতের সেইটাই ছিল লক্ষ্য। যাই হোক, দেশে ফিরে গিয়ে 'টাইমস্'

পত্রিকায় তিনি চিঠির আকারে একটি বিবরণ দিলেন। ভারত-বিবরণ। সে চিঠি পড়ে আমাদের মন ভরে গেল। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' লিখল : '···ইম্প্রেশন্‌স হি হ্যাজ কমিউনিকেটেড টু দি ইংলিশ পাবলিক ইণ্ডিকেট অ্যান অ্যাকিউরেট অবজারভেশন, এ ব্রেডথ্‌ অব মাইনড্‌ অ্যাণ্ড এ জিনিয়াস সিম্প্যাথি হুইচ আউআর কান্ট্রিমেন ডিপলি অ্যাপ্রিসিয়েট।'

মোট কথা, এ এক আশ্চর্য উল্টাপুরাণ। যাদের কাছে অনেক আশা করা গিয়েছিল, তারা কোনো দায়িত্বই স্বীকার করল না। বিফল করল। অথচ অন্য এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে চরিতার্থ হল আমাদের আকাঙ্খা। আশা-ভঙ্গের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে তাই প্রথমে হতাশা, পরে সেই হতাশা থেকে আনল ব্যঙ্গপ্রবণতা। 'কোনো এক স্পেশিয়ালের পত্র' ক্ষুরধার ব্যঙ্গে যবন পণ্ডিতদের স্বরূপ উদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টা। বঙ্কিমের ছোঁড়া এ তীর লক্ষ্যভেদ করল। তার পরের অভিজ্ঞতা অনেক। অনেক।

'লোক রহস্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যবধান চোদ্দ বছরের। বঙ্কিম চন্দ্র এ চোদ্দ বছরে দেখেছিলেন প্রভূত। শিখেছিলেন আরো বেশী। অনেক ভণ্ড পণ্ডিতের মুখোমুখি হলেন তিনি। বিরাশি সালে স্বয়ম্ভু পণ্ডিত হেস্টির সঙ্গে ছদ্মনামের আড়ালে তিনি যে লড়াই করেছিলেন, তার উত্তেজনা বাঙলা দেশ অনেকদিন ভোলেনি। শোনা যায়, সেকালে ঐ মসীযুদ্ধের রণাঙ্গন ছিল যে পত্রিকা সেই 'স্টেট্‌সম্যানে'র বিক্রি এত বেড়ে যায় যে, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ কোন কোন দিন দুবার পর্যন্ত কাগজ ছেপেছিলেন। ছিয়াশিতে 'কৃষ্ণচরিত্র' বেরোয়। এ গ্রন্থটির রচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বিলাতী সমালোচকদের আরো ভালো করে চিনলেন। যে মহামর্কটের নামে একদা তিনি রামায়ণ ভাষ্য লিখেছিলেন, সে মহামর্কটকে এতদিনে যথার্থভাবে আবিষ্কার করলেন। তাই কালো মুখে তিনি লাল রঙ মাখতে দেরি করলেন না। 'লোকরহস্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি রামায়ণ সমালোচনাকে বিলাতী পোষাক পরালেন। তারপর মহামর্কটের নামটি কেটে দিলেন—বিলাতী সমালোচক।

কলমের একটি খোঁচায় মর্কট মশাই বিলাতী সমালোচক হলেন না, এর পিছনে রইল অনেক জ্বালা, অনেক মর্মযন্ত্রণার ইতিহাস। জামাই বারিকে যার রচনা, যবন পণ্ডিতে তার শেষ।

একটি বাড়ি একটি বই



'একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকালে —প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচি নিক্ষেপশালিনী —মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ চঞ্চলচন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্র-গামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।'

বাড়িটির এহেন কাব্যময় বর্ণনা শুনতে শুনতে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বর্ণিত বরীচের সে প্রাসাদটির কথা মনে পড়ে যেতে পারে। না, এ বাড়িটি পাষাণে গাঁথা শা মামুদের প্রাসাদ নয়। নিপুণা নর্তকীর মতো উপলবন্ধুর পথে শুস্তা নদী নাচতে নাচতে এর কোল দিয়ে বয়ে যায় নি। স্নানশালায় ফোয়ারা খুললেই যে গোলাপ-গন্ধী জলধারা গলগল করে বেরিয়ে আসবে, এ বাড়িটি সে ধরণেরও তেমন কিছু নয়। মর্মরখচিত স্নিগ্ধশিলাসন বা দ্রাক্ষাবনের গজল এ বাড়িটির কাছে সুদূর স্বপ্ন মাত্র।

তবু আরালী পর্বতের চূড়ায় যেদিন মেঘ নামত, অন্ধকার অরণ্য এবং

গুস্তার মসীবর্ণ জল প্রতীক্ষায় থাকত স্থির হয়ে, সেদিন বাংলাদেশের সহর চুঁচুড়ার এ বাড়ির আকাশে বিদ্যুদ্দন্ত বিকশিত ঝড় ছুটে আসত ছিন্নশৃঙ্খল উন্মাদের মতো।—কাছেই ছিল মুঘলটুলী। সাড়ে তিন হাজার সৈনিক নিয়ে সুবেদার সাহেব সপ্তগ্রামের মুঘল অধিকার বহাল রাখতেন। চার্নক সাহেব দেখেছিলেন এঁদের। জাফরাণ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা মুঘল নর্তকীর ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ, গোলাপি মখমলের আসন, স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র, হেনার গন্ধ, সেতারের ঝংকার, সুরভি-জল-শিকর মিশ্র বায়ুর হিল্লোল,—আর পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি—সবই ছিল। —এই পুরনো বাড়িটি দাঁড়িয়ে থেকে হয়ত সবই দেখেছে, কিন্তু তখনো সে ঐতিহাসিক হয় নি। কৌতূহলীদের দৃষ্টির কাছে নিজেকে সে মেলে ধরেছে অনেক পরে। চার্নকের কলকাতায় মহারাণীর ছেলে 'প্রিনস অব ওয়েল্‌স' যে বছর ঘুরে গেলেন, তারপরেও সাড়ে তিন বছর গেল গড়িয়ে।

মে মাস। বিশ্রী গরম। মল্লিক কাশেম ঘাটে গাড়ি গাড়ি আম এসে নামছে। ভন্‌ ভন্‌ করছে মাছি। গঙ্গার জল নেমে গেছে নীচে। সে সময় একটি নৌকা ওপারের কাঁঠালপাড়ার কোল থেকে এসে লাগল জোড়াঘাটে। চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকান্তি এক বাবু নামলেন নৌকা থেকে। সঙ্গে পরিবার পরিজন। খাট-পালঙ্ক, বাসন-কোসন এমনকি এক রাশ বই-এর প্যাকেটের সঙ্গে কয়েকটি সুদৃশ্য হুকো-গড়গড়াও নামল। এক এক করে দু-চারটি কৌতূহলীও জুটে গেল। কেউ বলল, 'উনি হাকিম'। কেউ বলল, 'চাটুজ্জেবাড়ির সেজ ছেলে—বাবু এখানকার ডেপুটি।' ফিস্‌ফিস্‌ করে অনেকে বলল: 'বাবু বড়ো রাগী—দেমাকী।'

এই রাগী ও দেমাকী বাবু আর কেউ নন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বদলির চাকরিতে অনেক ঘুরেছেন তিনি। অনেক। যশোহর-নেগুয়া-খুলনা-বারুইপুর আলিপুর প্রভৃতি নানান জায়গায় চক্কর খেয়ে এসে হুগলীতে হাজির হলেন। ইচ্ছে—বাড়ির ভাত খেয়ে চাকরি করেন। বাবা যাদবচন্দ্র তখনো বেঁচে। বৃদ্ধ বাবাকেও দেখা হবে এবং চাকরিও বজায় থাকবে—এ কি কম সুখের কথা?—আর মনের সুখে তিনি লিখবেন। পুরনো দিনের অনেক বন্ধুকে তিনি পাবেন হাতের কাছে। হলও তাই। কাঁঠালপাড়ার চাটুজ্জে বাড়িতে নতুন হাওয়া বইতে থাকল। শিব-মন্দিরের পাশে যে ঘরগুলোতে সারাবছর তালা দেওয়া থাকত, সেই ঘরগুলিতে খোলা বাতাস খেলতে আরম্ভ করল।

বাগানে ফুল ফুটতে থাকল। আর বঙ্কিম লিখতে বসলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল।'

এদিকে যাদবচন্দ্রের উইলও উঠল ঘোরালো হয়ে। বঙ্কিমের তিন মেয়ে, ছেলে ছিল না। তাই যাদবচন্দ্র বঙ্কিমকে কাঁঠালপাড়ার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। অবশ্য অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের আগ্রহে অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ছেড়েও যেতে পারেন না। শেষে যেদিন পারিবারিক রোষ তীব্র হয়ে ফেটে পড়ল, সেদিন বঙ্কিম তাঁর নায়ক গোবিন্দলালের মত ঘর ছেড়ে বেরোলেন পথে। ভ্রমরের নামে লেখা সম্পত্তি গোবিন্দলাল যেমন অভিমানভরে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, বঙ্কিমও তেমনি দূরে ঠেলে ফেললেন সঞ্জীবচন্দ্রের দেওয়া পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার। কৃষ্ণকান্ত ও যাদবচন্দ্র উভয়েই অভিনব উইলের নির্মাতা হয়ে রইলেন।

যাই হোক, বঙ্কিম এসে উঠলেন চুঁচুড়ায়। জোড়াঘাটের একটি বাড়িতে। এর আগে বাড়িটির কোনো ইতিহাস ছিল না। এবার তৈরী হতে থাকল ইতিহাস। সেকালের নামকরা খ্যাতিমানদের অভ্যাগমে গমগম করতে থাকল বঙ্কিম আবাস। বঙ্কিম গৃহিণীর সুনিপুণ অতিথি পরিচর্যায় অভ্যাগতেরা ভারি খুশি।—এলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এলেন চন্দ্রনাথ বসু। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রামগতি ন্যায়রত্ন এবং কবি হেমচন্দ্রের অভ্যাগমে এ বাড়িতে নিত্যনতুন আড্ডা জমে উঠতে থাকল।

আঠারো শ' উনআশি সালের গ্রীষ্মকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় গিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ সহরে। দেশে ফিরলেন অক্টোবর মাসে। শরৎকালে। আকাশ নির্মেঘ নীল।—সাদা মেঘের ভেলা এখানে সেখানে কচিৎ দৃষ্ট হয়। সে শরতে বাড়ি ঢোকামাত্র প্রথমেই যাঁর কথা তাঁর মনে পড়ল, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই সোজা দৌড়লেন কাঁঠালপাড়ায়। সেখানে গিয়ে দেখেন সকলের মুখ ভার। মন্দিরের পাশের ঘরগুলিতে তালা লাগানো। আর বাগানটি কাঁটা-লতায় আচ্ছন্ন।—খবর নিয়ে জানলেন—উনি চলে গেছেন। নতুন বাসা জোড়াঘাটে চুঁচুড়ায়।

হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন জোড়াঘাটে। এসে যা যা দেখলেন তা তিনি নিজেই কবুল করেছেন—'দেখিলাম চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন; একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি একতলা। বাড়িটির একটি গেট আছে;

যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্বের দেওয়ালটি গুটিকয়েক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে।'

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বসেছিলেন, সেদিন তার নীচে টলমল করছিল জল। এক বছর দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। হরপ্রসাদকে অনেকদিন পরে দেখতে পেয়ে বঙ্কিম ভারি খুঁশি হলেন। হরপ্রসাদ একথা সেকথার পর জিগ্যেস করে বসলেন—চুঁচুড়ায় এ বাসা কেন?—এর ভেতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে?'

প্রথমে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন বঙ্কিম। তারপরে গম্ভীরভাবেই বললেন: 'তুমি ঠিক ধরেছ। আমি খুশি হলাম, তোমার কাছে আমার বেশি কৈফিয়ৎ দিতে হল না।'

চন্দ্রনাথ বসু সেকালের বাংলাদেশে আরেক বিখ্যাত নাম। প্রতি শনিবার এখানে না এলে তাঁর ভাত হজম হত না। আর বঙ্কিমেরও প্রায় অনুরূপ অবস্থা। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'আমি প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। যাইবামাত্র হাসি আর আলিঙ্গন, সে কথা আর কি বলিব।' কেবল বঙ্কিমচন্দ্র নন, তাঁর গৃহিণীর নিপুণ আতিথেয়তাও এঁর কলমকে ফাঁকি দিতে পারে নি। বাইরে থেকে খাবার কিনে এনে অতিথিকে পরিচর্যা করা সেকালের কেতায় ছিল না। ঘরের খাবারেই এসব নিষ্পন্ন হত। এবং তা যে কত সুচারুভাবে হত, চন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় তার পরিচয় আছে—'বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। অন্দরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহার কাছে কখনও খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। ভাবিতাম, এসব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়? শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়। তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র।'

ঐ রকম এক শনিবার। চন্দ্রনাথের গাড়ি এসে লাগল জোড়াঘাটের বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে বাবু উঠে এলেন বৈঠকখানায়। চাকর এসে জানাল, বাবুর অসুখ। অসুস্থ বঙ্কিম নাকি বিছানায় শুয়ে আছেন। চন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে তাঁকে খবর পাঠালেন।

ওদিকে খবর পাওয়ামাত্র বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন বঙ্কিম। চারদিকে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। চন্দ্রনাথের জন্ম থালাভরা খাবার

এলো। আড্ডায় গল্পে তিনি মেতে উঠলেন। বোঝাই গেল না যে তিনি অসুস্থ।

এ বাড়িতে বসেই একদিন বঙ্কিম পাকড়াও করে বসলেন তাঁকে—'আচ্ছা মশাই আপনি বাংলা লেখেন না কেন? শুনেছি আপনি ভালো ইংরেজী লেখেন, অথচ বাংলাতে এত ভীতি কি কারণে?'

চন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন: 'ভীতি এক জায়গায়—বানানে।'

বঙ্কিম সহাস্যে বললেন: 'মানে? বানানে আবার ভয় কিসের?'

'শেষকালে বাংলা লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে হাস্যাস্পদ হব কি?'

বঙ্কিম আশ্বাস দিয়ে বললেন: 'বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত রাখা আছে। ভয় নেই, তিনি বানান ঠিক করে দেবেন।'

বঙ্কিমের অভয়বাণী পেয়ে চন্দ্রনাথ কলম ধরলেন। লিখলেন বঙ্গদর্শনে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও একটি আসন পেলেন। এ বাড়িতে যদি তিনি না আসতেন, তবে এমন অঘটন কি তাঁর জীবনে ঘটত?—আর এখানে আসার ফলেই তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হলেন।

যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস পড়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ একদা অভিভূত হয়েছিলেন, সেই শ্রীশচন্দ্রও একদা এখানে এসে হাজির হলেন। তাঁর এ আসা ছিল প্রায় তীর্থ দর্শনের অনুরূপ। সেবার উনআশি কি আশি খ্রীষ্টাব্দ। বর্ষাকাল। কলকাতায় সেদিন আবার রথের বড়ো ধুম। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাইয়ের নাম রাখাল। ঐ রাখালের মামার সঙ্গে আসছিলেন শ্রীশচন্দ্র।—সকাল থেকেই টিপি টিপি বৃষ্টি। হাওড়া স্টেশনে ঢোকার আগেই ট্রেন ফেল হয়ে গেল এঁদের।

মুস্কিলে পড়লেন শ্রীশচন্দ্র। কেননা, বঙ্কিমের আমন্ত্রণেই তিনি যাচ্ছিলেন জোড়াঘাট। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! শ্রীশচন্দ্রের নিজের ভাষাতেই বলতে হয়—'সাহিত্যচর্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্যগর্বের একটা আনন্দ হিল্লোল আমার শরীর ও মন অভিষিক্ত করিতেছিল।'—আর এহেন অভাবিত সৌভাগ্যের সময়, ট্রেন ফেল?

যাই হোক, পরের ট্রেনে রওনা দিয়ে চুঁচুড়া স্টেশনে তাঁরা পৌঁছুলেন। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তাঁরা এসে হাজির হলেন জোড়াঘাটে।

বঙ্কিম তখন পোশাক এঁটে আপিসে বেরোচ্ছেন। এগারোটা বাজতে বেশি দেরী নেই। এঁদের দেখে খুশি হলেন। বললেন: তোমাদের চিঠি পেয়েছি। সকাল থেকে ভাবছি এই এলো বুঝি?' শ্রীশচন্দ্র হাত তুলে নমস্কার করলেন রাখালের মামার মত। বঙ্কিম ঐ নমস্কার করাটা ঠিক যেন পছন্দ করতে পারলেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁকে কেমন যেন একটু বিষণ্ণ মনে হল। তারপর শ্রীশচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে এবং বেয়াই মশাইকে প্রতিনমস্কার করে বললেন: 'আপনারা বিশ্রাম করুন। আমাকে আপিস আজ যেতেই হবে। আপিস থেকে এসে কথাবার্তা হবে।'

তরুণ ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এবং এ দেখাতেই তরুণ লেখক অভিভূত। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: 'সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সৌম্যমূর্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, আর কখনও সেরূপ দেখিয়াছি মনে হয় না।'

তিনটে নাগাদ ফিরে এলেন বঙ্কিম। তখন গঙ্গায় ভরা জোয়ার। বারান্দার নীচ দিয়ে গম্ভীর গর্জনে ছুটে চলেছে জলরাশি। আপিসের পোশাক ছেড়ে বঙ্কিম এসে বসলেন একটি ইজিচেয়ারে। চাকর এসে সধূম আলবোলা পাশে নামিয়ে দিয়ে গেল। কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘনল সে ধরিয়ে দিয়ে গেল বাবুর হাতে। বাবু একটু একটু করে টান দেন, আর গড়গড়া গুড় গুড় করে সাড়া দেয়। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। ধীরে ধীরে আলোচনাও জমে ওঠে। শ্রীশচন্দ্রের মনে পড়ে যায় বিষবৃক্ষের সেই হুঁকোর স্তব। এবং স্বীকার করতে বাধ্য হন যে এসব হুঁকো-বিলাসীর মুখেই হুঁকোর স্তব সাজে।

একথা-সেকথায় উঠল চিঠিলেখার কথা। সেকালের বাঙালীরা—যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁরা নিজেদের ভেতর ইংরেজীতেই চিঠি লিখতেন। বাংলা ভাষা সেখানে পর্যন্ত ঠাঁই পেত না। বঙ্কিম বঙ্গভাষার এ অমর্যাদার কথায় বললেন: 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না, ইংরেজী ভাষাটা ইন্‌সিন্‌সিয়ার বলে মনে হয়।'

এরপর উঠল বয়স্কদের প্রতি তরুণদের শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রসঙ্গ। বঙ্কিম বললেন: 'এখনকার ছেলেরা দেখতে পাই গুরুজনকে আগের মত প্রণাম করে না, নমস্কার করে।'

খট্ করে কথাটা এসে বিদ্ধ করল শ্রীশচন্দ্রকে। মনে হল, একথার লক্ষ্য আর কেউ নন, তিনিই। এখানে এসে তিনি বঙ্কিমকে নমস্কারই করেছেন,

প্রণাম নয়।—ফেরবার সময় শ্রীশচন্দ্র আর ভুল করলেন না। প্রণাম করেই তিনি জোড়াঘাটের বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন।

এঁরা চললেন বটে, নতুন লোক ততক্ষণে আড্ডায় এসে বসলেন। এ বাড়ি কোনো মুহূর্তেই ফাঁকা হয় না।

জোড়াঘাট থেকে কয়েক পা এগোলেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেখানেও আলোচনা বসে। মাঝে মাঝে বঙ্কিম সেখানে যান। বঙ্কিমকে না পেলে ভূদেব হয়ে ওঠেন অস্থির। সে আড্ডায় রামগতি ন্যায়রত্ন এবং গোপাল গুপ্ত প্রায়ই উপস্থিত থাকেন। সেকালের হুগলী কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন গোপাল গুপ্ত। এককালে নাকি তাঁর বিরাট একজোড়া গোঁফ ছিল, পরে সে গোঁফ তিনি বিসর্জন দেন। গোঁফলুপ্ত গোপালকে অতঃপর স্ত্রীলোকের মতই দেখাত। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাণ্টাফার ক্লাশে ক্লাশে ঘুরে পড়া শুনতেন। সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হল। মৃতদার ক্যাণ্টাফার-কে নিয়ে আর গোপালের রমণী-নিন্দিত মুখশ্রীকে অবলম্বন করে সেকালের কলেজের ছেলেদের মুখে মুখে একটি মজার ছড়া গজিয়ে উঠল—

গোঁফ লুপ্ত গোপাল গুপ্ত
সংস্কৃত পড়াচ্চে,
মৃতদার ক্যাণ্টাফার
উঁকি ঝুঁকি মারছে।

ছড়ার নায়ক গোপাল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আড্ডায় নিয়মিত হাজরে দিতেন। এদিকে জোড়াঘাট মাঝে মাঝে আসত এখানে, আর এটি যেত জোড়াঘাটে।

একদিন ভুদেব খবর পেলেন যে কবি হেমচন্দ্র এসেছেন জোড়াঘাটের বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিকে এত্তেলা পাঠালেন। ছেলে মুকুন্দকে ডেকে বললেন—'জোড়াঘাটের বাড়িতে গিয়ে হেমবাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।'

জোড়াঘাটে দৌড়ল মুকুন্দ। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেচারির চক্ষুস্থির। দেখে কবি হেমচন্দ্র বসে আছেন মদের বোতোল নিয়ে। বঙ্কিম এগিয়ে এসে মুকুন্দকে বললেন: দেখো, তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবির কি কাণ্ড দেখ!'

হেমচন্দ্র হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন: 'বাপুহে, শুধু কি এটুকুই তোমার চোখ পড়ছে? তোমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মশায়ের অতিথি সৎকারটা দেখছ না! গেস্টস্ ক্যান্নট্ বি চুজার্স।'

কেবল সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অভ্যাগমে নয়, বঙ্কিমের চুঁচুড়া প্রবাস সব থেকে যে কারণে স্মরণীয়, তা হল তাঁর একটি বই লেখার জন্য। গঙ্গাতীরের এ মনোরম আবাসটি তাঁকে দিয়েছিল অগাধ শান্তি। ইজিচেয়ারে শুয়ে গঙ্গার কলধ্বনি শুনতে শুনতে তিনি স্বপ্ন দেখতেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তাঁর চোখের সামনে উঠত মূর্ত হয়ে। নানা রকম দৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন চোখের সামনে। সে সব ছবি একটু একটু করে কলম দিয়ে ধরে রাখতে আরম্ভ করলেন।

এক সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন। নীচে গঙ্গা। হঠাৎ মনে হল—তিনি যেন কোথায় চলেছেন। মিলিয়ে গেল জ্যোৎস্না। এলো নিকষ কালো রাত। অন্ধকার আর অন্ধকার। গভীর গহন বন। কেবল গাছ আর গাছ। গাছের মাথায় মাথায় জমাট অন্ধকার। নিবিড় স্তব্ধতা।—সেই ভয়ংকর স্তব্ধতা ভেদ করে কে যেন চীৎকার করে উঠল: 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

আরেক দিন। কোর্ট থেকে ফিরছেন। মুঘলটুলীর বাঁকা-রাস্তা হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি কোথাকার একটি গ্রামে গিয়ে যেন পৌছুলেন। সেখানে বাড়ি আর বাড়ি। কিন্তু সব ফাঁকা। লোকজন কেউ নেই। সারি সারি দোকান, চালা। সব নির্জন। কেবল একটি বিরাট বাড়িতে একটি পুরুষ, অসহায় স্ত্রী, আর তার কোলে ছোট্ট একটি মেয়ে। আর আরো দূরে একটি সন্ন্যাসীকে 'দশাবতার স্তোত্র' পাঠ করতে শোনা যায়,—হরে মুরারে—

বঙ্কিম সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে লিখলেন—'মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমোয়। ইংরেজ টাকা আদায় করে আর ড্যাসপ্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্নে যায়।'

দিনে দিনে বঙ্কিম একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মুঘল অশ্বারোহীদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে তিনি চমকে ওঠেন। চোখের সামনে তিনি দেখেন—মুর্শিদাবাদ থেকে খাজনার গাড়ি চলেছে। আগে পাছে সিপাই। গাড়ি চলেছে কলকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকাত। বন্দুকের গর্জন। এগিয়ে আসে কত সন্ন্যাসী। কে একজন জিগ্যেস করে—তোমরা কারা? তারা উত্তর দেয়—'আমরা সন্তান।'

সব মিলিয়ে এ জোড়াঘাটে বসে তিনি একটি বই লিখে ফেললেন। বইয়ের

নাম—'আনন্দমঠ'। 'বন্দেমাতরম্' গানটি অবশ্য আগেই লেখা হয়েছিল। আনন্দমঠ রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে গানে সুর বসল। ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বন্দেমাতরমের প্রথম সুরদাতা। চুঁচূড়ার ছেলে অক্ষয় সরকার বঙ্কিমের এ বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। হঠাৎ একদিন জোড়াঘাটে গিয়ে তিনি এ গান শুনে ফেললেন—'যখন আনন্দমঠ সূতিকাগারে তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; বঙ্কিমবাবুও ছিলেন। উভয়ের পাশাপাশি বাসা; সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রবাবুও আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ্ঞ; বড় টেবিল-হারমোনিয়াম লইয়া 'বন্দেমাতরম্' গানে তিনি একদা মল্লারের সুর বসান।'

যে অসাধারণ বইটি সেদিন লেখা হল, তার প্রথম পাঠক কে?—খাতায়-কলমে প্রথম পাঠক হিসাবে যাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে—তিনি হলেন ঐ অক্ষয় চন্দ্র সরকার। এবং তাঁর প্রথম পাঠের অভিজ্ঞতাটিও বড়োই মনোরম। স্বয়ং পাঠক মশায় তা স্বীকার করে লিখেছেন—'একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের শেষ যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতে লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দেন। আমি সন্তান বুঝিতে না পারিয়া 'সন্তান' পড়িতেছিলাম মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবার কি 'সন্তাল ইন্‌সারেকশান্' থিম হইল নাকি?' তিনি বলিলেন, 'না, সন্ন্যাসী ইন্‌সারেকসান'। আমি বলিলাম এই যে আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন 'সন্তালগণ।' তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, সন্তান। আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।'

ধারাবাহিকভাবে 'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বেরোতে আরম্ভ করল এর পরেই। স্বদেশপ্রেমের জন্ম হল শুধু বাংলায় নয়, ভারতে। আঠারোশ বিরাশিতে বেরোল ছাপা বই। শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে এ যেন এক নতুন জীবন, নতুন বেদ!



কলমে কলমে কলহ

শোভাবাজার। রাজবাড়ি। কোম্পানির আমলে এ বাড়িতে যে অনেক আড়ম্বর ও রাজকীয় সমারোহ দেখা যেত, তার স্মৃতি কলকাতাবাসীরা কোনো দিন ভুলতে পারে না। তখনো হাতীশালে হাতী। ঘোড়া সালে ঘোড়া। উনিশ শতক শেষ হ'তে আঠারো বছর বাকি। সুখের সংসার। হঠাৎ রানীমা মারা গেলেন।

রাজা স্বর্গত। হলেনই বা স্বর্গত। তাই বলে কি রানীর শ্রাদ্ধ আটকায়! চূড়ামণিদের ব্যাপারে সামাজিক সংকটের যে ছায়া পড়েছিল, সেসব দলাদলি অতিক্রান্ত। সামাজিক প্রতিষ্ঠায় শোভাবাজার তখন সত্যিসত্যিই রাজবাড়ি। রানীর স্বর্গারোহণে রাজ পরিবার তাই শ্রাদ্ধের জন্য অঢেল আয়োজন করলেন। অঢেল। শোনা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ সেকালে তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে ন লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। রানী ভবানী নাকি তাঁর স্বামীর শ্রাদ্ধে দশলাখ। আর ছাতুবাবু লাটুবাবু তাঁদের বাবার শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেছিলেন নগদ পাঁচ লাখ খরচ করে।—মোট কথা, এই ছিল সেকালের কেতা। তাই ছোট করে তখনকার

রাজা রানীমার শ্রাদ্ধ ফাঁদতে পারলেন না। শহর কলকাতায় ধুম পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং জ্ঞানী-গুণী যেখানে যত ছিলেন, সকলের ডাক পড়ল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির এলেন। এলেন কৃষ্ণদাস পাল। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর মরকত কুঞ্জ থেকে দামী গাড়ি চেপে এলেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে। বাঙলা দেশের দূর-দুরান্ত থেকেও হাজির হলেন এসে পণ্ডিত সমাজ। যাঁরা মোটামুটি নামকরা, তাঁদের সংখ্যা হাজার চারের নীচে নয়। আর অজ্ঞাত কুলশীল যে কত এসেছিল, তার হিসাব ছিল না।

কেবল দেশী লোকেরা নয়, সেকালের সাহেব-সুবোরাও এলেন একে একে। শোভাবাজারের রাজবাড়ি সাহেবদের আনুকুল্যেই প্রতিষ্ঠিত। ক্লাইবের অনুগ্রহ ও হেষ্টিংসের দাক্ষিণ্যেই নবকৃষ্ণ রাজা হলেন। নবকৃষ্ণ এ কঠিন সত্যটি কোনোদিন ভোলেন নি। তাই সুযোগ পেলেই সাহেবদের খুশি করতে খানা-পিনার আয়োজন করতেন। সে বাড়িতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সাহেবরা আসবেন, তাতে আশ্চর্য কি?

এলো অনেক সাহেব। দামী দামী অশ্বশকটে শোভাবাজারের রাজভবন ভরে গেল। ঐ রকম এক গাড়িতে এক মহামান্য সাহেবও এলেন। আর পাঁচজনের মত তিনি শাসন সংক্রান্ত পদে বহাল ছিলেন না। তিনি ছিলেন ডাফ কলেজের প্রিন্সিপাল। নাম—রেভারেণ্ড হেস্টি। ডাকসাইটে ইণ্ডোল-জিস্ট। অন্তত তিনি সে রকমই দাবি করতেন। আর এনিয়ে তাঁর দেমাকও কম ছিল না।—তবে পুতুল পূজোটা সাহেব একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। যাই হোক, সাহেব সেদিন খুব খোস মেজাজেই এ বাড়িতে এসেছিলেন। মহারাজা এগিয়ে এসে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সাহেব হাসি হাসি মুখে রাজাকে খুশি করলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গিয়ে বসলেন সভার মাঝখানে। বিরাট সভা মণ্ডপ। হাজার হাজার লোক। রাজবাড়ির আরাধ্য দেবতা গোপীনাথ জীউকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসান হয়েছিল একেবারে সভার মুখোমুখি। তাঁর রজত সিংহাসন ঝলমল করছিল রাজৈশ্বর্যে। হঠাৎ হেস্টি সাহেবের চোখ গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। আর যেই না গোপী-নাথের সঙ্গে দৃষ্টির বিনিময়, সাহেবের কালা-পাহাড়ী রক্তে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল। না, সভায় তিনি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। উত্তেজনায় উঠে পড়লেন। তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলেন।

সাহেব তাঁর কুঠিতে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু ভেতরের উত্তেজনা কমল না। পুতুল গোপীনাথ নয়, এবার সব রাগটা গিয়ে পড়ল হিন্দুধর্মের উপর। যদি উপায় থাকত, সেদিনই সাহেব এটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে 'বে অব বেঙ্গলে' ভাসিয়ে দিতেন।

সে সামর্থ্য যখন নেই, তখন নিরুপায় হয়ে তিনি তুলে নিলেন কলম। লিখে ফেললেন একটি চিঠি। আর এ লেখায় তাঁর আক্রমণ চলল হিন্দুদের ওপর। পরের দিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় ঐ চিঠিখানি ছাপা হয়ে বেরোল। শ্রাদ্ধ বাড়ির ঘটনাটি সাড়ম্বরে বিবৃত করলেন সাহেব। আর গোপীনাথের উপস্থিতির কথা লিখে প্রশ্ন তুললেন—'যে সভায় ঐ বিগ্রহকে রাখা হয়েছিল, সেখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতন জ্ঞানী-গুণীরা উপস্থিত থাকেন কেমন করে?'

এরপরই সাহেব হিন্দু দেবদেবীদের ধরে ধরে কচুকাটা করে দিলেন। প্রথমেই ধরলেন শিবকে। কেননা, সে ন্যাংটা—দিগম্বর। এঁর সম্পর্কে লিখলেন—নো ডেলিকেট মাইনড ক্যান লুক ইনটু এ শিব টেম্পল্ উইদাইট এ ...ডার'। অর্থাৎ কোন রুচিশীল লোকই কাঁধ না ঝাঁকিয়ে শিব-মন্দিরের ...কে তাকাতে পারে না। আর তার বৌ—'হরিড' ও 'ব্লাডি' কালীর কথা ... তোলাই ভালো। ঐ ঝুলন্ত জিহ্বা, গলায় খুলির মালা, বিরাট খাঁড়া—...-সব দেখে আতংক ও নৈরাশ্যই জাগে। এঁদের ছেলে হাতীমুখো গণপতিকে ...খে—অন্যে পরে কী কথা—ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত হা-হা করে হেসে ...টোপুটি খাবে। মোট কথা, এই কি মশাই, ঈশ্বরের চেহারা! আর এদের ...খে ভক্তি করতে হবে!

...আড়াই নয়, এক এক প্যাঁচেই সাহেব দেবকুলকে জবাই করতে থাকলেন। ...ছে লোকে সন্দেহ করে বসে সাহেব রেগেমেগে এ-সব করছেন—সাহেব তাই ...র বার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে—না, তিনি রাগ করেন নি। পুতুল ...জো সাহেব সহ্য করতে পারেন না, তাই এ আলোচনা। মাঝে মাঝে তাই ...মাদের ক্ষতে মলম দিয়ে লিখেছিলেন—কল্পনা কুশলী বাঙালীরা কি এতই ...র্বোধ যে তারা বিরাট ঈশ্বরকে—তাঁর ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম? ...রা মূর্খ তাদের জন্য না হয় 'ভিজিবল রিপ্রেজেনটেশন্ অব ডিভাইন' লাগতে ...রে, কিন্তু হে বাঙালী—তোমাদেরও তাই লাগবে? তবে কি ধরে নিতে ...বে এই আর্যসন্তানেরা বুদ্ধিতে ও কল্পনায় কোল, ভীল বা সাঁওতালদের থেকেও

ছোট। আর বুদ্ধি এত মোটা যে, হাতে গড়া মাটির পুতুল ছাড়া ঈশ্বরের ধ্যান এদের পক্ষে অসম্ভব।

গোপীনাথ মানেই কৃষ্ণ। সাহেব তাই গোপীনাথকেও এক হাত নিয়ে নিলেন। ইনি লিখলেন—'হোয়াট ইজ কৃষ্ণ, আফ্‌টার অল, বাট অ্যান ইমাজিনারি এমবডিমেণ্ট অব দি সেনসুয়াস ফিলিং অব দি ইস্টুট'। ষাট হাজার গোপিনীদের নিয়ে যিনি সদাই লীলা করেন—মায় বস্ত্রহরণ পর্যন্ত—সে হেন দেবতার অর্থাৎ গোপীনাথের অমন রাজকীয় উপস্থিতিতে সাহেব ব্যথিত না হয়ে পারলেন না। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি দুঃখিত হলেন। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিখলেন—হায়, ভারতবর্ষ, প্রভাত উদয় তব গগনে, সেই ভারতের এই দশা! এই পতন!!

শরৎকাল। তখনো পুজো আসেনি। তবে শরতের রোদ্দুরে শিউলি ফুলের গন্ধে এবং নির্মেঘ নীল আকাশের অসীম ব্যাপ্তি পুজোর আহ্বান রচনা করছে। ব্যাপারীরা থরে থরে জিনিস আনছে। কাগজে কাগজে আসন্ন পুজোর বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। পুজোর বাজারে কেনাকাটা চলছে।

সে রকম এক খুশি খুশি সকাল। বেরোল স্টেটস্‌ম্যান। হেস্‌টি সাহেবের লেখাটি ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এটি পড়ে নেটিবপাড়ার মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। কোর্টে-কাছারিতে এই নিয়ে চাপা ফিস্‌ফিসানিও আরম্ভ হয়ে গেল। শোভাবাজারের আড়ম্বরের আলোচনা গেল তলিয়ে। সকলের মুখেই ঐ লেখার কথা। কেউ কেউ গোপনে এক-আধখানা প্রতিবাদপত্রও পাঠাল। সে সকালে কারো কারো সঙ্গে হেস্‌টি সাহেবের চোখাচোখিও হল। এবং অত্যন্ত বিরসভাবে 'গুড মরনিং' বলতে হল। করমর্দনও বাদ দেওয়া গেল না।

শহর কলকাতা থেকে যাজপুর সেকালে অনেক দূর। বাঙলা মুলুক ছাড়লে ওড়িশা। প্রথমে জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা সড়ক। সে পথে পালকি ছাড়া কিছু চলে না। রেল লাইন তখনও পাতা হয় নি। ওই অরণ্যময় পথ দিয়ে কেবল নিয়মিত যাওয়া আসা করত ডাকের পালকি। চিঠি-পত্তর ও খবরের কাগজ প্রভৃতি ওইভাবে পৌছুত ঠিকানায়। কলকাতা থেকে যাজপুরে এ-সব যেতে রীতিমত দেরী হয়ে যেত।

সেই যাজপুরে এক দেশী হাকিম ছিলেন। যেমনি তেজী, তেমনি রাগী। সাহেবদের অধীনে কাজ করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের আহাম্মুকি একদম সহ্য করতে পারতেন না। জলে থাকলেও ঐ সাহেব-কুমীরদের সঙ্গে ছিল নিত্য-বিবাদ। ঐ ডেপুটিবাবু সুদূর যাজপুরে বসে স্টেটসম্যান কাগজে হেস্টি সাহেবের পুরো লেখাটি পড়লেন। যদিও লেখাটি চিঠি, কিন্তু বলায় প্রবন্ধকারের ঢঙ্ আছে। কেমন যেন কুৎসিত চাতুরী নিয়েছেন সাহেব। নাঃ, লেখাটিকে ক্ষমা করা যায় না কিছুতেই। কোনো কোনো জায়গায় সাহেব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। কৃষ্ণ-উপাসনার প্রসঙ্গে যে সব ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা রীতিমত নিন্দনীয়। ওর ফলে নাকি এদেশে কাপুরুষ, ঠক, কামুক, বেশ্যা এবং অশ্লীল কবিসমাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর ভারতের কথায় দুঃখ করে লিখেছেন—কে তোমাকে হীন বেশ্যাকুলের জননীতে পরিণত করল ?

এ-সব পড়ে সেকালের স্টেটসম্যানের সম্পাদককে ডেপুটিবাবু চিঠি লিখে পাঠালেন—মশাই, পুজো এসে গেল। পুজোর আগে এ-সব বাজে কথার চিঠি না ছাপিয়ে আসন্ন ছুটীতে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন ছাপালেই ভালো করতেন। বেচারি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট পলকে হিন্দুধর্ম ধ্বংস করার আগে আরো একটু পড়াশুনা করতে হবে। হয়ত কথাগুলি একটু কড়া শোনাচ্ছে। কিন্তু মোনিয়ার উইলিঅবমসের স্মরণ ছাড়া তিনি এক কদমও এগোতে পারেন না, তাঁর জন্যে আর কি মিষ্টি কথা রাখা যায় বলুন।

শেষ-বেশ লিখলেন—সাহেব যদি পরামর্শ নেন, তবে বলি মূল সংস্কৃত তিনি দুই পাতা উল্টে দেখুন। কাকে বলে বৈদান্তিক মতবাদ এবং কাকে বলে হিন্দু ধর্ম, তা তিনি বুঝতে পারবেন। অন্ততঃ গুবলেট করে বসবেন না। ভাগবৎ গীতা, শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র বা এ জাতীয় বই-দু-চারখানা পড়ুন। হিন্দু দর্শনের শাখাগুলি সম্পর্কে পরিচিত হোন। তবে এ-সব পড়ার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের শরণ নিলে চলবে না। কেননা, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে কি পথ দেখাতে পারে ? যাঁরা ধর্মে বিশ্বাসী এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হবে।

চিঠিটা একটু কড়া হয়ে গেল। কিন্তু এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। একেবারে শেষাশেষি সাহেবকে একটি ধন্যবাদও জানালেন ডেপুটিবাবু। তবে এ ধন্যবাদ অজ্ঞতার জন্যে। চিঠির শেষে নিজের নাম সই করলেন খচ্ খচ্ করে। আবার পরে কি ভেবে সইটি দিলেন কেটে। পরিবর্তে

লিখলেন—'রামচন্দ্র'। নব্য পরশুরামের দর্প-চূর্ণ করার জন্তই হয়ত এ নাম নিলেন।

যথাসময়ে এ প্রতিবাদলিপি পৌছুল গিয়ে কলকাতায়। আরো পাঁচটা চিঠির সঙ্গে ছাপা হয়ে বেরোল স্টেটসম্যানের পাতায়। এ চিঠিখানি পড়ে সাহেবও ফেটে পড়লেন। রেগে আগুন, তেলে বেগুনে। পরশুরামের মতই হুঙ্কার ছাড়লেন। কুঠারের বদলে টেনে নিলেন কলম। আর সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় লিখে পাঠালেন—অনেকেই আমার নানারকম সমালোচনা করেছেন দেখলাম। সে সবের উত্তর দিয়ে আপনার কাগজের জায়গা শুধু শুধু আমি নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু একালের এক ব্রাহ্মণবীর—রামচন্দ্র পত্রিকা মারফৎ অনেক উপদেশ আমাকে দিয়েছেন দেখছি। এজন্য অনেক ধন্তবাদ। যদি কেউ প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, আমি হিন্দুধর্ম আর বৈদান্তিক মতবাদকে মিশিয়ে ফেলেছি—তাহলে তাঁর উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণে প্রস্তুত। নতুবা নয়।

হেস্টি সাহেবের এ চিঠি বেরোল ছাপা হয়ে। তাঁর রাগ কিন্তু এখনো প্রবল। রামচন্দ্রের চিঠির সব কথার জবাব যে তিনি দেননি, তখন আবিষ্কার করলেন। তাই ঐ জবাবের জন্ম আর অপেক্ষা না করে আরো দুখানা চিঠি একের পর এক লিখে পাঠালেন। ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের ওপর যেখানে কটাক্ষ বর্ষণ করা হয়েছিল, সে অংশটির ওপর সাহেবের ছিল বেজায় ক্রোধ। ছোট ছোট ছেলেরা যেমন পাণ্ডিত্য দেখানোর ঝোঁকে প্রতিপক্ষকে কোনো শক্ত বানান জিজ্ঞেস করে বসে বা কোনো কঠিন শব্দের অর্থ জানতে চায়, কিংবা আধখানা গোঁফ বাজি রাখে সম্ভ যুবকেরা—সাহেবও তেমনি একটি ছেলে-মানুষী করে বসলেন। সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের জন্ম গদা ঘুরিয়ে প্রথম চিঠির জবাব আসতে না আসতে লিখে ফেললেন দ্বিতীয় চিঠি। এখানে সাহেব বলতে চাইলেন—বাপু হে যখন পণ্ডিতদের তুমি যে অন্ধ বলেছ —এখন সেই অন্ধদের সাহায্য বাদ দিয়ে এক বৈদিক ভক্তির মানে করত দেখি। বৈদিক উক্তিটি হল—'চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেব বন্ধোবংক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেত। —এর অর্থ উদ্ধারের জন্ম দুর্গাপূজার সব ছুটিটাই সাহেব রামচন্দ্রকে দিতে চাইলেন। আর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যে চার হাজার পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁদের সময় দিতে চাইলেন যতদিন খুশি।

এদিকে যাজপুরে কাগজ পৌছুতে না পৌছুতে এবং এর জবাব রামচন্দ্রের

কাছ থেকে আসতে না আসতে সাহেব আরো একটি চিঠি লিখে ফেললেন। এবার তিনি নিজেকে জনক রাজা বলে ঘোষণা করলেন এবং পৌত্তলিক নেতাদের তাঁর ধনুক ভাঙার জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন।

সারা কলকাতা ঐ কলমে কলমে লড়াই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কয়েকদিন পরেই রামচন্দ্রের কাছ থেকে চিঠি এলো। তিনি জানালেন, মিঃ হেস্‌টি যে-রকম বুক ফুলিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা না করে পারা যায় না। একটি ছোট সেলাম ঠুকে, তাঁর চ্যালেঞ্জ নিলাম।

রামচন্দ্র কিন্তু বৈদিক উক্তিটির মানে করতে বসলেন না। তিনি মূল বক্তব্যটিতে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মূর্তি পূজো এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কটা কী তাই বোঝাতে চাইলেন। অত্যন্ত শান্তভাবে তিনি সাহেবের উগ্ররূপটি ব্যাখ্যা করলেন। বাঙলা দেশের একটি বিখ্যাত আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদের আয়োজিত শোকানুষ্ঠানকে তিনি অকারণ উত্তেজনায় আহত করেছেন, সাহেব কি তা মনে রেখেছিলেন? হিন্দু ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলি এবং সংস্কৃত ভাষার গভীর সংকেতগুলি ভারতীয় পণ্ডিতদের থেকে ইয়োরোপীয় ইনডো-লাজিসটরা সব থেকে বেশি বুঝবে কেমন করে? এবং তা কি কখনও সম্ভব? —ম্যাক্সমুলার, গোল্ডস্টুকার, কোলব্রুক, মুইয়ের, ভেবর ও রথের মত প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিত সমাজ চিরকালের নমস্য। এঁদের পরিচিতির জন্য হেস্‌টি সাহেবের ওকালতি দরকার কি? এঁদের সম্পর্কে সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু এঁদেরও সাহেব যখন বলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতের থেকে ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা বেশি বোঝে তখন সে বালসুলভ উক্তি কেউ কি মেনে নিতে পারে? হিন্দু ধর্মের মূলনীতি আর তার বিস্তৃত বিবরণ বিশ্লেষণ করা কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের কাজ নয়, এই ছিল আমার বক্তব্য। এ বক্তব্য আরো একটু প্রসারিত করে বলা যেতে পারে। ধর্মনীতি ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য আর তার দর্শনে এমন বহু বিষয় আছে যা বুঝতে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা কোনো দিনই সমর্থ হবেন না। কেননা, তাঁদের সে সংস্কার নেই।

এই চিঠিটির শেষে রামচন্দ্র লিখেছেন, হেস্‌টি সাহেব যদি জেদ ধরেন, তবে আমার আসল নাম শেষের চিঠিতে জানাব। আপাততঃ শুধু সাহেবের অবগতির জন্য কার্ড পাঠালাম। বেচারি রামচন্দ্র একজন সামান্য ব্যক্তি—

-দেখে সাহেব হয়ত খুবই হতাশ হবেন। কিন্তু এ প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান অন্ততঃ এ বিষয়ে মিঃ হেস্‌টি নিঃসন্দেহ হবেন।

এদিকে শহর কলকাতায় সেদিন দারুণ উত্তেজনা। সাহেব ও নেটিব উভয় মহলেই এ ধারণা দৃঢ়মূল যে রামচন্দ্র যে সে কেউ নয়। কেউ বলেন, উনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র—কেউ বলেন ইনি ব্রাহ্মণ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। অমন তীক্ষ্ণ ইংরেজী দেখে অনেকে আবার এঁ সব অনুমান উড়িয়ে দেন। অনেকে আশা করে ছিলেন, রামচন্দ্র বৈদিক উক্তির হরধনু ভেঙে একালের জনক হেস্‌টিং সাহেবের গালে চুনকালি দেবেন। কেউ বলল: না, এ উত্তরই ঠিক হয়েছে। এতে সাহেবদের শিক্ষা হবে। শহর কলকাতায় উত্তেজনা এভাবে বেড়েই চলে। স্টেটস্‌ম্যান কাগজ সকালে বেরোতে না বেরোতে হাওয়া হয়ে যায়। দারুণ চাহিদা। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ দুবার করে কাগজ ছাপতে থাকলেন।

এদিকে রামচন্দ্রের কার্ড পেয়ে ছ্যাঁৎ করে ওঠে সাহেবের বুক। সাহেব অবশ্য সেভাব গোপন রেখে লিখলেন—আমি ভেবেছিলাম, রামচন্দ্র বুঝি হিন্দু-ধর্মের এক কেষ্ট-বিষ্টু—কিন্তু নাম দেখে নিরাশ হলাম। আমার অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর চিঠি হাসির খোরাক যোগাচ্ছে। উনি আরো চিঠি লিখলে, আরোও কৌতুক পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে দুর্গাপুজো এসে গেল। ঢাকে কাঠি পড়ল। চারদিক ঘিরে কেবল পুজো আর পুজো। সাহেব কলকাতা শহরের যেদিকে তাকান সেদিকেই ঐ মূর্তিপুজো। তাঁর কালাপাহাড়ী রক্তে অকারণ চাপ বৃদ্ধি হয়। উত্তেজনা বাড়ে।

পুজোর পরেই রামচন্দ্রের চিঠি ছাপা হল। বিরাট চিঠি। চিঠির প্রথমাংশে রামচন্দ্র লিখলেন—সাহেব এবং তাঁর অন্তরঙ্গ মহলকে প্রতিশ্রুত কৌতুক উপভোগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। দুর্গাপুজোর সময় ব্রাহ্মণদের কাজ আনন্দোৎসব করা, ঝগড়া নয়—তাই এ বিলম্ব।

রামচন্দ্র এখানে একটি গল্প বললেন। গল্পের নায়ক এক জাহাজী সাহেব। অনেকদিন ধরে রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় জাহাজে ঘুরে সে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। ভারতীয় উপকূলে এসে এক কালো লোকের কাছে সে কিছু খাবার চাইল। কালো আদমি তাকে খেতে দিল একটি নারকেল। ওর ভেতর যে শাঁস আছে তাও বলে দিল। আগে ঐ সাদা নাবিক কখনো এ বস্তু খায়নি। তাই ছোবড়াকেই সে মনে করল শাঁস। অনেকক্ষণ ধরে ছোবড়া চিবিয়ে বিরক্ত

হয়ে শেষবেশ সে নারকেলটি কালা নেটিবের মাথায় ছুঁড়ে মারল। ভারতীয় নারকেল সম্পর্কে সাহেব নাবিকের যে মত, হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে হেস্‌টিরও তাই মত। সংস্কৃতের ছোবড়া খেয়ে বেচারি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিতিবিরক্ত। রামচন্দ্র এখানে তাঁর সুবিস্তৃত চিঠিতে দেখাতে চেষ্টা করলেন—ক্রিয়াকর্ম, মূর্তিপূজো এবং জাতিভেদের ছোবড়ার সঙ্গে শাঁস হিন্দুধর্মের সম্পর্কটা কী।

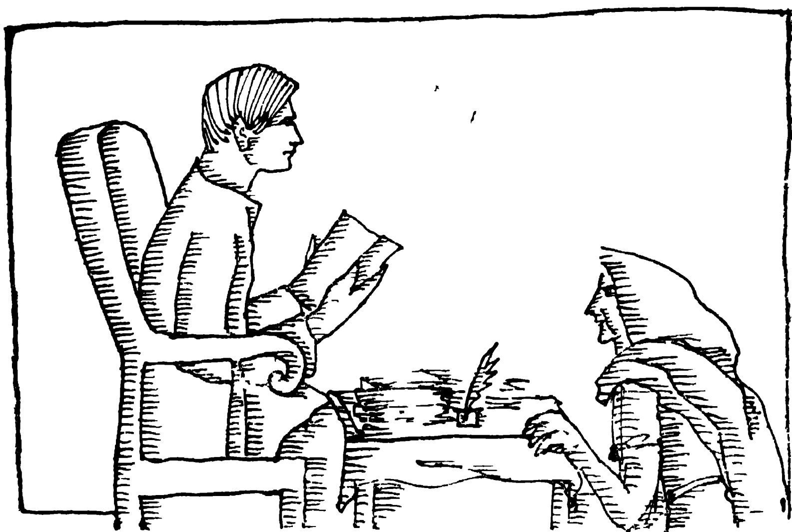
একবার শেষের দিকে হেস্‌টি সাহেবের সেই বৈদিক উক্তির প্রসঙ্গে লিখলেন —একালের রামচন্দ্রের পক্ষে যবন জনকের ধনুক ভাঙা হল না। কারণ লাভ কী? এই জনক মশাই কি তাঁর জানকীকে উপহার দিতে পারবেন?

এ চিঠির জবাবে হেস্‌টি আরেকবার দাঁত কিড়মিড় করে গদা হাতে নিষ্ফল আক্রোশ দেখিয়েছিলেন। নির্বোধের মত তিনি বলে ফেলেছিলেন—হিন্দুধর্মের ভেতর ছোবড়া ছাড়া শাঁস বলে কিছু নেই। অনধিকার প্রবেশকারী রামচন্দ্রকে তাড়াবার জন্য। তিনি ডাক দিয়েছিলেন অধিকতর ওয়াকিবহাল পণ্ডিতদের। আর বাঙালীদের ক্ষত-বিক্ষত পিঠে মলমের সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিলেন—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলে রামচন্দ্রের থেকে ভাল ইংরেজি লিখতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু আট-ঘাট সামলে আরো সতর্ক হয়ে তাঁরা যে যুক্তি সন্নিবেশ করতে পারতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যে বিরাট 'কলমে কলমে কলহ' হয়ে গেল, সে বিবাদে সাহেবের এটি শেষ চিঠি। কিন্তু এর আগেই যাজপুরের সেই জঙ্গল থেকে হাকিমবাবু তাঁর নামটি পাঠিয়ে দিয়েছেন খবরের কাগজে। ছাপাও হয়ে গেছে সে নাম। আনন্দে উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে কৌতূহলী পাঠকেরা দেখেছেন —সে নামটি হল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে আনন্দমঠ। সেখানে অসংখ্য সন্তানের কামান গর্জনে টলমল করে উঠেছিল কোম্পানির রাজত্ব। সুতরাং সেই 'আনন্দমঠের রচয়িতা ছাড়া উদ্ধত সাহেবকে কে উচিত শিক্ষা দেবে!

সেকালের নেটিব বাঙালীরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কলমের লড়াই দেখে এবং তাতে পরাভূত সাহেব হেস্‌টিকে দৌড়ে পালাতে দেখে ভারি খুশি হল। আর রাজবাড়ির শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়ায় সে অভিজ্ঞতাও হল এই প্রথম।



॥ সাহেব নেটিবে নাটক ॥

সাহেবটির নাম ছিল এডওয়ার্ড। জেলাশাসক হয়ে তিনি যেদিন হাওড়ায় এলেন, তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ঝকমকে চেহারা। এক লহমায় দেখলে পঁয়ত্রিশ ত দূরের কথা তাঁকে বরং তিরিশের কম বলেই মনে হত্। অথচ এই হাওড়া আসার আগে পাক্কা বারোটি বছর সরকারী কাজে তিনি বৃত ছিলেন। আর সেদিন সরকারী কাজ করা মানেই নানা ঝঞ্ঝাটে থাকা। দিনে দিনে ঝানু হওয়া। যাই হোক, এডওয়ার্ডের চেহারায় অন্ততঃ ঐ ঝানু চাকুরের ভাবটি দীর্ঘকাল ফুটে ওঠে নি। বরং কেমন যেন একটি শিশু শিশু ভাব ছিল তাঁর অবয়বে। ইটনঅক্সফোর্ডের তিনি যে এক ডাকসাইটে ছাত্র, তাও অনুমান করা যেত না। দক্ষতার সঙ্গে দেহের গরমিলই ছিল এডওয়ার্ডের চেহারার বৈশিষ্ট্য।

স্যার রিচার্ড টেম্প্ল যেদিন ছোটলাট হয়ে বাঙলা দেশের তক্তে এসে বসেন, তারো বছর চারেক আগে এদেশে এসেছিলেন এডওয়ার্ড। 'বঙ্গদর্শন' বেরোতে তখনো দু বছর বাকি। মাইকেল-দীনবন্ধু সকলকেই বহাল তবিয়তে সমাসীন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সবে তিনখানি উপন্যাস লিখে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজদের প্রভাব দৃঢ়মূল

হয়েছে।—জেলা শহরগুলিতে একে একে গড়ে উঠছে মিউনিসিপ্যালিটি, এহেন মাহেন্দ্র মুহূর্তে এডওয়ার্ডের আবির্ভাব হল।

অবশ্য এই সাহেবের পিতৃদেবও ছিলেন এদেশের এক বড় চাকুরে। চাকুরি জীবনের সবটাই তাঁর কেটেছিল এদেশে। এই বাঙলায়। শাসক হিসাবে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা সেকালে ওপর মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। নিজের যোগ্যতাতেই তিনি ছোটলাটের জুনিয়ার সেক্রেটারী হন। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও বোর্ড অব রেভিন্যুর সদস্যপদও তিনি অলঙ্কৃত করেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন বহাল তবিয়তেই ছিলেন। আমাদের নবযুগের নায়কেরা যেদিন একে একে শুকিয়ে মরে গেল, তখনো তিনি অম্লান। আঠারোশ চব্বিশে—যে বছর মাইকেলের জন্ম হয়, সেই একই সনে তিনিও ভূমিষ্ঠ হন সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে। দু'জনের জন্ম তারিখটি পর্যন্ত কাছাকাছি। যে বছর মধুসূদন মাইকেল হলেন, ঠিক তার পরের বছর চাকরি নিয়ে সাহেব এলেন এদেশে। আর এ চাকরি থেকে তিনি অবসর নেন মধুসূদনের দেহান্তরেরও অনেক পরে।

এহেন লোকের ছেলে কখনো কি অপদার্থ হয়? নৈব নৈব চ। তাই প্রোমোশনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেরী হয়নি এডওয়ার্ডের। চাকরির ক বছরের ভেতরেই তিনি রিচার্ড টেম্প্‌লের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। কেবল বাঙলায় নয়, সুদূর বোম্বাই মুলুকে গিয়ে সেখানকার লাটসাহেবের কাছে কাজ করে এলেন। অতঃপর ঘুরলে ঘুরতে এলেন হাওড়ায়। জেলা শাসকের পদ। কিছুদিনের জন্য অবশ্য অস্থায়ী। দক্ষতা দেখাতে পারলে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি রইল।

সাহেব অবশ্য দক্ষতা দেখানোর ত্রুটি রাখলেন না। বিচার বিভাগ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি ব্যাপারেই তিনি চোখমুখ খোলা রাখলেন। সামান্য অপরাধেও যাতে অপরাধী বেকসুর খালাস না পায় তার জন্য হাকিমদের কড়া নির্দেশ দিলেন।

এমন সময় একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

এবং তা এই রকম। —হাওড়া পৌরসভায় হাজার হাজার লোকের ভেতর এক বুড়িও বাস করত। বেচারির সামান্যই সঙ্গতি ছিল। কোনরকম টায়ে টায়ে দু বেলা চলে যেত তার। এমন কোনো আত্মীয়পরিজন ছিল না, যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। আহার্য থেকে বাসস্থান সবই

জোগাড় করে নিতে হত বেচারিকে। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটি ঘর ছিল সে বুড়ির সম্বল। হঠাৎ সে পর্ণকুটীরে একটি নোটিশ এসে হাজির। পৌরসভা থেকে প্রেরিত নোটিশ। ইংরেজী নয়, সরল বাঙলায় সে বিজ্ঞপ্তিতে একটি ছত্র লেখা : আপনি যদি জলীয় পদার্থ দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করেন, তবে আইনতঃ দণ্ডার্হ হইবেন।'

বুড়ি থ। এ অদ্ভূত সর্তকবাণীর অর্থ কি? জোলো জিনিস দিয়ে কে আর কবে ঘর ছেয়েছে? তা না, সম্ভব! আর যাই হোক, গোল পাতার ছাউনীকে নিশ্চয় জলীয় বলা যায় না। বুড়ির ঐ নোটীশ পাড়ার ছেলেদের পড়াল। একবার নয়। বার বার। ধরে ধরে নানা লোককে এর মানে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেউই সদুত্তর দিয়ে বুড়িকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। পাড়ার এক কর্তা ব্যক্তি ডেকে বলল : 'দেখো বুড়ি তোমার ঐ নোটিশের একটাই মানে হয়। নজর দিও, ঘরে যেন এক ফোঁটাও জল না পড়ে। ভালো করে ছাইও।'

না, এ ব্যাখ্যাও বুড়িকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তবে সাত-পাঁচ ভেবে শেষবেশ বুড়ি চুপ করেই গেল। কিন্তু বুড়ি নীরব হলে কি হয়, পৌরসভার এবার পালা এলো সরব হবার। সেখান থেকে হঠাৎ একদিন একদল লোক এসে পাকড়াও করল বেচারীকে। সকলের চোখে মুখেই বিস্ময়, কি ব্যাপার? —বুড়ি নাকি পৌরসভার বিধি অমান্য করেছে, তাই এ বিধি। স্বয়ং চেয়ার-ম্যান ফৌজদারী মামলা দায়ের করলেন বুড়ির বিরুদ্ধে। গড়াতে গড়াতে এ মোকদ্দমা গিয়ে হাজির হল এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে। সাহেব নিজে এ মোকদ্দমার দায়িত্ব নিলেন। পাঠিয়ে দিলেন একদেশী হাকিমের এজলাসে। তবে এ মামলার নিষ্পত্তি সম্পর্কে তাঁর কৌতুহল রইল উন্মত হয়ে।

আর যে দেশী হাকিমের এজলাসে এ মোকদ্দমাটি উঠল, বিচারক হিসাবে এঁর সেদিন খুব নাম ডাক। বেচারি বুড়ি হন্যে হয়ে একবার উকিলের বাড়ি যায়, আবার দৌড়ে ফিরে আসে কোর্টে। ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে হাউ হাউ করে কাঁদে এবং চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেয়। মোদ্দাকথা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটি যে কি তা সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না।

যাই হোক, যথাসময়ে বুড়ির মামলা একদিন কোর্টে উঠল। সেই দেশী হাকিমের এজলাস। হাকিমবাবুর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল নোটিশটি। পড়লেন তিনি এ কাগজটা। ভালোই বাঙ্‌লা জানতেন, কিন্তু পৌরসভার

বিজ্ঞপ্তির মর্ম কোনক্রমেই তাঁর বোধগম্য হল না। হোঁচট খেলেন বার বার 'জলীয়'—সে আবার কি। শেষ পর্যন্ত যখন কিছুই অর্থ করা গেল না, তখন পৌরসভার কাছ থেকে মূল ইংরেজি নোটিশটি চেয়ে পাঠানো হল। পেয়াদা দৌড়ল তড়ি ঘড়ি। সেকালে হাওড়া পৌরসভার সেক্রেটারী ছিলেন যিনি তিনি হলেন এক সাদা চামড়ার মানুষ। নাম ডনিখরণ। বাঙ্‌লা জানেন। ঐ নোটিশটির বাঙ্‌লা তর্জমা তিনিই করেছিলেন।

কোর্ট থেকে উর্দিপরা পেয়াদা এসে যখন মূল নোটিশটি চেয়ে বসল, সাহেব সেদিন মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেন। বিড বিড় করে আপন ভাষায় হয়ত একটু গালাগাল ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু কোর্টের পেয়াদাকে যেহেতু ফেরানো যায় না, তাই মুল ইংরেজি নোটিশটি তাকে দিতেই হল।

এদিকে নেটিব হাকিম ইংরেজি বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে হেসে খুন। যে 'জলীয়' শব্দটিকে নিয়ে এত সমস্যা—কোর্ট-কাছারি, বুড়ির কান্না এবং পৌরসভার এত দাপট, সে শব্দটির মূল ইংরেজি দেখা গেল—'কমবাস্‌টিবল্‌'। বাঙ্‌লায় এর প্রতিশব্দ হল, 'দাহ্য'। সেকালে শহর-গঞ্জে প্রায়ই আগুন লাগত। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত একেকটি লোকালয়। আগুনের ভয় বাঁচাবার জন্য পৌরসভা হয়ত বলতে চেয়েছিল—'দাহ্য বস্তু দিয়ে যেন ঘর ছাওয়া না হয়। বাঙলা ভাষা বিশারদ ডনিখরণ সাহেব হয়ত বলতে চেয়েছিলেন—'জলীয়'। কিন্তু বানান ভুলের জন্য বেচারির ও শব্দটি একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। হল হিতে বিপরীত। আর বুড়ি বেচারির যে দুর্ভোগ হল, তার কথা না তোলাই ভালো। হাকিমের তাই করুণা হল। নেটিববাবু বুড়িকে তাই বেকসুর খালাস দিয়ে দিলেন। জাজমেন্‌টের পাতায় বড়ো বড়ো করে লিখলেন, 'নোটিশের অর্থ বোধগম্য হইল না। নোটিশ ইন্‌সাফিসিয়েন্‌ট বোধে আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইল।'

ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বুড়ি। দৌড়ল গঙ্গাস্নান করতে। হয়ত পীরের দরগায় শিরনি চড়াল। আর দেশী হাকিমকে সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে থাকল। মনে হল, এ হাস্যকর ব্যাপারটি এখানে চুকে গেল। একটি প্রহসনের সমাপ্তি হল বুঝি।

কিন্তু যা হবার নয়, তাই কি কখনো হয়? তাই আরেক নাটকের সূচনা দেখা গেল। নেটিব হাকিমের জাজমেন্‌টের কালি শুকোতে না শুকোতে নতুন করে বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হয়ে গেল। বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া।

টানা পাখার তলায় বসে জেলা শাসক এডওয়ার্ড সেদিন সম্ভবতঃ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। হয়ত পাখাপুলার অবসাদে ও ক্লান্তিতে একটু ঢুলছিল। হঠাৎ সে সময় মামলার নিষ্পত্তির খবর উল্টো দিক থেকে সাহেবের কাছে একটু নাটকীয় করেই নিবেদন করা হল। কেউ বলল, 'ডনিখরণের এ অবমাননা।' কেউ বলল, 'সাদাদের ওপর ঐ কালা হাকিমের রাগ চিরকালের।'—হাকিমবাবু বাঙলায় বই লেখেন কি না, তাই সে গরবে পা পড়ে না মাটিতে' এমন মন্তব্যও কেউ কেউ করলো।

ডনিখরণ সাহেবের কাছেও নিশ্চয় এ খবর পৌঁচেছিল। সম্ভবতঃ গেল রাজ্য গেল মান, বলে তিনিও দৌড়ে এসেছিলেন এই ম্যাজিস্ট্রেট এডওয়ার্ডের কাছে। বিপদে সাহেবেরা যদি সাহেবদের না দেখে, তবে কে দেখবে?—হয়ত এ প্রশ্নই উদ্যত ছিল এডওয়ার্ডের দিকে।

আর এ মোকদ্দমা সম্পর্কে স্বয়ং জেলা শাসক যে কৌতূহলী ছিলেন, সে তত্ত্ব আগেই বিবৃত করা গেছে। মামলার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুল সমস্যায় পৌঁছুনোর আগেই শুধু একটি শব্দার্থ নিয়ে মোকদ্দমাটি যে এ ভাবে ফেসে যাবে, ম্যাজিস্ট্রেট তা মোটেই আশা করেন নি। অতঃপর সকলে মিলে যখন দেখিয়ে দিল যে, ওটি একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়, তখন তিনি ক্ষুব্ধ না হয়ে পারলেন না। সে ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল ক্রোধে। আর রাগ হলে লোকের হিতাহিত বা ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান থাকে না। এডওয়ার্ডেরও তাই হল। বিষয়টি অত তলিয়ে না দেখে, নেটিব হাকিমকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি একটি অধিকার বহির্ভূত কাজ করে ফেললেন। হাকিমবাবুর জাজ মেন্‌টটিকে তলব করে পাঠালেন তিনি। তারপর সেই জাজমেন্‌টের ওপর সকলের সামনেই খস্‌ খস্‌ করে লিখে দিলেন,—'হিজ ভ্যানিটি ইন্‌ দি নলেজ অব বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ হ্যাজ মিজলেড দি জাজমেন্‌ট'। অর্সত্যার্থ, ভাষা-জ্ঞানের অহমিকাই হাকিম মশাইকে ঠিক ঠিক বিচার করতে দেয়নি।

জাজমেন্‌টের ওপর এ জাতীয় মন্তব্য লেখা এক ধরনের অপমান। এ অপমানের খবর যথাসময়ে হাকিমবাবুর কানে গিয়ে পৌঁছুল। আর পাঁচজন কালা হাকিমদের মতন ইনি ভীতু ছিলেন না। বরং একটু বেশী সাহসী ছিলেন। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যদি বা সম্ভব, সেকালে সাহেবদের সঙ্গে বিবাদ করে এ দেশে বাস করা মোটেই কিন্তু সম্ভব ছিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও সাহেব কুমীরকে হাকিম পরোয়া করতেন না। অন্যায় দেখলেই তিনি ফেটে পড়তেন।

ম্যাজিস্ট্রেটও তাই এঁর ক্রোধের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না। সাহেবে-নেটিবে এবার সত্যি সত্যিই একটি নাটক জমে উঠল। ইনিও টানাপাখার তলায় 'হার ম্যাজিস্‌টিজের এজলাসে বসে ম্যাজিস্টেট এডওয়ার্ডকে লিখে পাঠালেন—মহাশয়, অন্ততঃ বিচার বিভাগে আপনি আমার থেকে কেওকেটা কেউ নন। আমার বিচারকে এ সমালোচনা করার অধিকার আপনার নেই। সুতরাং ঐ অনভিপ্রেত ঘটনাটির জন্য এক মাসের ভেতর আপনি যদি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী না হন, তবে এর প্রতিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।—জাজমেন্টখানি এবং ঐ সংক্রান্ত কাগজগুলি কমিশনার সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

এহেন কড়া চিঠি পেয়ে এডওয়ার্ড একেবারে স্তম্ভিত। একবার নয়, বার বার তিনি পড়লেন, এবং ভাবতেই পারলেন না কোনো নেটিব ডেপুটী এ চিঠি ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখতে পারে। দেশী হাকিমের এ স্পর্ধার কোনো কি জবাব নেই?—যাই হোক, সাহেব কিন্তু ঐ চিঠিকে আমল দিলেন না। উত্তর দেবার প্রয়োজন ত দূরের কথা। কমিশনারকেও কাগজপত্র পাঠানো হল না বরং সাহেব উল্টে ভাবতে লাগলেন, কি করে এর বদলা নেওয়া যায়।

এদিকে হাকিমবাবুও কিন্তু তক্কে তক্কে আছেন। কেবল একটু সুযোগের অপেক্ষা—হ্যাঁ, যথাসময়ে একটি সুযোগও এসে গেল। সেকালের ওই অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন জন বিমস্‌। বিমস্‌ ছিলেন ভারতপ্রেমিক। ভারত-প্রেম থেকে ভারততত্ত্ববিদ্‌ হিসাবে খ্যাত হন। এডওয়ার্ডের থেকে বারো বছর আগে এসেছিলেন এদেশে। বয়সেও তিনি ছিলেন দশ বছরের বড়ো। ভারতে এসে বছর তিনেক কাটান তিনি পাঞ্জাবে। তারপর শেষে আসেন বাঙলা দেশের নিম্নভূমিতে। ভারত-বিদ্যায় তিনি রীতিমত দক্ষতা অর্জন করেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে তিনি প্রায়শই লিখতেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়ারির'ও তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল সব থেকে বেশি। বেশ কয়েক বছর আগে 'আউট লাইন্‌স অব ইণ্ডিয়ান ফিললজি' বলে একটি বই লেখেন এদিকে হাকিমবাবুরও লেখা অভ্যাস ছিল। ঐ লেখার সেতুবন্ধেই একদা মিলন হল দু'জনের। সে মিলন থেকে এলো হৃদ্যতা। ইতিমধ্যে সাহেব সংস্কৃত

ব্যাকরণ সম্পর্কেও একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। আর বাঙলা ব্যাকরণ নিয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনা করে যখন ছকে ফেলেছেন, ঠিক সেই সময় পাল্কী করে হাকিমবাবু গিয়ে হাজির হলেন তাঁর বাঙলোয়।

হ্যাঁ, সাহেব তখন কুঠিতে ছিলেন। হাকিমবাবুকে দেখে ভারি খুশি হলেন তিনি। প্রথমে কুশল বিনিময় হল। তারপর দু'জনের আলোচনা এগোল বাঙলা ব্যাকরণের দিকে। অতঃপর শব্দার্থ তত্ত্বে। আর ঠিক সেই সময় পৌরসভার সেই নোটিশের গল্পটি হাকিমবাবু খুলে বললেন সাহেবকে।

সাহেবত হেসেই খুন। এমন জীবন্ত ভাষাতত্ত্ব জীবনে তিনি কখনো শোনেন নি। এরপর এডওয়ার্ডের কাণ্ড-কারখানা শুনে তিনি গম্ভীর হলেন। বললেন, ঠিক আছে।

বিমস্ সাহেব যখন ঐ কথাগুলি বলেন, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন হয়ত স্বরটা সে কারণে একটু উঠে গিয়েছিল। দরজার ওপারে পর্দার ধারে দাঁড়িয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেরেস্তাদার। হয়ত কোনো বিশেষ কাজে সে এসেছিল। যাই হোক, যে কটি কথা তার কানে গিয়েছিল, তড়িঘড়ি সে সেকটি কথা এডওয়ার্ডের কানে পৌছে দিল।

বিমস্ সাহেব যে জেদী লোক, তা এডওয়ার্ডও জানতেন। তাই সে এবার রীতিমত ঘাবড়ে গেল। একটি তুচ্ছ ঘটনা থেকে এরকম নাটকও যে হতে পারে সাহেব তা একদম কল্পনাও করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, হাকিমবাবু ক্ষমা চাইবেন, আর তা হলেই ঘটনাটি মিটে যাবে। আর এদিকে মনে মনে সাহেবের একটু অপরাধ বোধও ছিল। কেননা, তিনি যা জাজমেণ্ট লিখেছেন, তা যে ঠিক পথ নয়, এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সম্ভবতঃ অপকর্মের সান্ত্বনা হিসেবে হাকিমবাবুর গোপন অ্যানুয়েল রিপোর্টটি ভালোই লিখেছিলেন। ভেবেছিলেন, ডেকে এবার একদিন পিঠ চাপড়ে দিলেই ডেপুটিবাবু খুশি হয়ে যাবেন।

কিন্তু এমন নাটক যে হতে পারে, তাতো ভাবেন নি। পাঙ্খাপুলার সেদিন জোরে জোরেই পাখা টানছিল, তবু এডওয়ার্ড ঘামতে থাকলেন। কলম কামড়ে এবার ভাবতে বসলেন কেমন করে এ বিপর্যয় রোধ করা যায়। যে ক্ষতি হয়েছে, তার মেরামত কি সম্ভব? ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে তখন তিনি অফিসিয়েটিং। অস্থায়ী। কমিশনার সাহেবের এক কলমের খোঁচায় কি হতে কি হয় কে জানে? তার ওপর মান-সম্মান? নাঃ, তার কথা না তোলাই ভালো।

এইভাবে অনেক ভেবে চিন্তে সাহেব শেষবেশ ডেকে পাঠালেন সেরেস্তাদারকে। বললেন, 'হাকিমবাবু যখন আদালত থেকে বাড়ি ফিরবেন, তখন আমাকে এত্তেলা দিও।'

বিকেল বেলা। যথাসময়ে সেরেস্তাদার এসে সাহেবকে খবর দিয়ে গেল। হাকিমবাবু সবে তখন কাছারী থেকে পা বাড়িয়েছেন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। এডওয়ার্ড পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। আশা করা গেল নাটকের চরম মুহূর্তটি বুঝি আসন্ন হয়ে উঠল। এখনই হয়ত সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। কিন্তু না, সে রকম কিছু ঘটল না। যা ঘটল তা অবশ্যই নাটকীয়। কিন্তু অন্য অর্থে। সাহেব এগিয়ে গিয়ে হাকিমের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। বললেন, 'গুড আফটার নুন।' হাকিমও অনুরূপ ভাষায় তা ফিরিয়ে দিলেন। সাহেব বললেন, 'বাবু, তুমি কি দেখেছ আমার বার্ষিক রিপোর্টে তোমার সম্পর্কে কি লিখেছি?'

'না, তোমরা তোমাদের রিপোর্টে কি লেখ, তা দেখা আমার অভ্যাস নেই।'

সাহেব বললেন, 'তোমার সম্পর্কে আমি খুব উঁচু প্রশংসার কথা লিখেছি।'

'তাতে কি? ও সব জানবার জন্য আমার এতটুকুও আগ্রহ নেই।'—খুব বিষণ্ণ স্বরেই উত্তর দিলেন হাকিমবাবু।

এডওয়ার্ড দেখলো কথা জমছে না। কেমন যেন তাল কেটে যাচ্ছে। তাই তড়িঘড়ি আসল কথাটিই ফেঁদে বসলেন: বাবু, কিছুদিন আগে তোমার জাজমেন্টের ওপর একটি মন্তব্য লিখেছিলাম, মনে আছে কি? আর তাই পড়ে কমিশনারের কাছে কাগজ পাঠাতে অনুরোধ করে তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলে, মনে আছে নিশ্চয়?

'আছে।'

'আমি বলি কি, তুমি এসব ফিরিয়ে নাও।'

হাকিমবাবু একটু হেসে বললেন, 'ফিরিয়ে নিতে আমার এতটুকুও আপত্তি নেই। তবে কি জানো, তুমি ক্ষমা না চাইলে তা কেমন করে সম্ভব?'

'কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের একটি সম্মান আছে, তা মানো ত?'

'মানি। কিন্তু সকলে কি সে মান রাখতে জানে?'

সাহেব মাথা চুলকোলেন। এ কথার যে কোনো জবাব নেই, তা তার চেয়ে আর কে বেশি বোঝে? তাই ঐ কটাক্ষটিকে বেমালুম হজম করে

বললেন, 'বাবু, আমি যদি আমার মন্তব্য তুলে নি' তাহলে তুমি তোমার ঐ চিঠি ফিরিয়ে নেবে তো?'

'নিশ্চয়।'

পাঁচজনের কথা শুনে এডওয়ার্ডের ধারণা হয়েছিল দেশী হাকিমটি বেজায় কুটিল। অত্যন্ত কুচক্রী। কিন্তু এখন যা দেখলেন তাতে তাঁর ধারণা একবাবে উল্টো হয়ে গেল। অমন স্পষ্ট মানুষ যে তিনি কখনও দেখেন নি, মনে মনে তিনি বার বার সে তত্ত্ব স্বীকার করলেন। তাই আবেগে উচ্ছ্বাসে নেটিববাবুকে জড়িয়ে ধরলেন সাহেব। টেনে নিয়ে গেলেন নিজের চেম্বারে। আর্দালিকে তলব দিলেন। সেই বিবদমান জাজমেন্টটি আনিয়ে নিয়ে তাঁর সেই মন্তব্যের তলায় লিখে দিলেন—'আই রিগ্রেট আই পাস্‌ড্ দি অ্যাবাভ রিমার্কস। আই উইথ ড্র দেন।'—কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সাহেব তাঁর মন্তব্যটি প্রত্যাহার করে নিলেন।

হাকিমবাবুও সেই 'কলম দিয়ে একটি প্রত্যাহার লিপি লিখলেন। লিপির তলায় বড়ো বড়ো অক্ষরে নাম সই করলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সেদিনের ধূসর অপরাহ্ণটি বিরহ মিলনের খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভরা মন নিয়ে সেদিন দুজনেই বাড়ি ফিরে এলেন। একটি নাটক যা বিষাদের ভেতর দিয়ে শেষ হতে পারত, তার উপসংহার এলো আশ্চর্য মাধুর্যের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর উপন্যাসের থেকেও এক জটিল ঘটনার নায়ক হয়ে গেলেন।

* * *

এদিকে এডওয়ার্ডের কাছে হঠাৎ যেন একটি নূতন দিগন্ত খুলে গেল। আর পাঁচটা সাদামাটা সাহেবের মত নেটিব দুনিয়াকে যে চোখে তিনি দেখতেন, সে দেখা বদলে যেতে দেরী হল না। জন বিমস্-এর মতন তিনিও হয়ে উঠলেন ভারতপ্রেমিক। অতঃপর কালো লোকদের জন্য তিনি যে পরিশ্রম করলেন তা রীতিমত অভাবনীয়। 'ডিক্‌স্‌নারী অব ইণ্ডিয়ান্ বায়োগ্রাফী' —এডওয়াড বাকল্যাণ্ডের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সেকালের ভারত ইতিহাসে যাঁরা বিখ্যাত ব্যক্তি; তাঁদের জীবনী এ গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। না, কেউই বাদ পড়েন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী যত্নের সঙ্গে লিখেছেন এডওয়ার্ড। কেবল নেটিব নয়, ভারতসেবায় নিযুক্ত অসংখ্য সাহেবদের নাম ও জীবনী এ গ্রন্থে সংযুক্ত।

এডওয়ার্ডের লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থটি যা বহু সমাদর লাভ করেছে, সেটি হল —'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনরস্‌'। বইটি সুবৃহৎ। তাই দুটি খণ্ডে বিভক্ত। এ বিরাট বইয়ের পাতায় পাতায় সেকালের নানা খুঁটিনাটি ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সরকারী পুঁথিপত্র থেকে এর সকল উপকরণ সংগৃহীত। মোদ্দাকথা, এটিকে একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য করলেও খুব একটা বেশি কিছু করা হয় না। গ্রন্থখানির উপসংহারে সেকালের নেটিব সমাজের মনীষীকুলের জীবনচিত্র আঁকা আছে। সে চিত্রশালায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দেননি এডওয়ার্ড। বরং এ ছবিটি ভালোই এঁকেছেন তিনি।

বাবু গৌরবের শেষ সন্ধ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে।

সেবার সিপাহী যুদ্ধের বছর। বারুদের গন্ধে ম ম করছে ভারতবর্ষ। সেকালের ভারতবর্ষে না ছিল রেলগাড়ি, না মোটরগাড়ি। দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন নৌকো করে। জলপথে। আগ্রা ফোর্টের তলা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক অপরূপ দৃশ্য তিনি দেখলেন। দেখলেন—শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাকে। কেল্লার বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। সানন্দে সপারিষদ। চোখে-মুখে সাম্রাজ্য জয়ের খুশি। তৈমুর-বাবরের বংশধর সেদিন ঘুড়ির খেলাতেই তৃপ্ত। ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি অতীতের স্মৃতিমাত্র।

কয়েক মাস পরে ডালহৌসী পাহাড় থেকে যখন নেমে আসছেন, তখন আরেক ছবি দেখলেন দেবেন্দ্রনাথ। কানপুরের কাছ দিয়ে চলেছেন তিনি। মিউটিনির পর্ব সমাপ্ত। আগেপিছে সশস্ত্র পাহারা। বাহাদুর শাকে ধরে নিয়ে চলেছে ইংরাজেরা। শেষ মুঘল চলেছেন মুঘল যুগের অবসান ঘোষণা করে। ঘুড়ি ওড়ানোর পালা শেষ করে পা-পা করে চলেছেন কারাগারে। নির্বাসনে।

মুঘল-মহিমা এইভাবেই একদিন অস্ত গেল। ঐ অস্ত-সন্ধ্যার দুর্লভ লগ্নটির সাক্ষী হয়ে রইলেন কলকাতার এক বাবু। ইতিহাসের এ আরেক আশ্চর্য ঘটনা। মুঘল বিলাসিতার পুচ্ছ ধরে বাবু-সভ্যতার যে বিকাশ, তারও অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো ধীরে ধীরে। তাই শেষ মুঘল বাহাদুর শাকে নির্বাসনে পাঠাবার লগ্ন থেকে আবার বাবু নির্বাসনও আসন্ন হয়ে উঠল কলকাতায়। শেষ মুঘলের মত শেষ-বাবুদের শেষদিনগুলি বড়োই করুণ! বড়োই বিষাদে ভরা!—দেবেন্দ্রনাথকে এ-দৃশ্যও দেখতে হয়েছিল।

আটবাবুদের আটশ' খেয়ালের কথা সেদিন গল্প। আতর দিয়ে সেদিন কারো আর ঘর মোছা হয় না। সোনার থালা, সোনার বাটি রূপকথার কাহিনীতে আশ্রয় নিল। পাড়ের কর্কশতায় বাবুদের সৌখীনতা ব্যথিত হলে, পাড় ছিঁড়ে কাপড় পরতেন বাবুরা। এখন পাড়সমেত কাপড় জোটানোই ভার! বাবু নিজের খরচ চালাতে পারেন না, তাই বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করা হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব।

মুঘলদের অনেক স্মৃতি ছিল যা দেখে পরবর্তীকাল তাদের মনে রাখতে পারে। তাজমহল থেকে দেওয়ান-ই-আম পর্যন্ত মুঘল-মহিমা ছিল অম্লান। কিন্তু বাবুদের স্মৃতি কী রইল ?—না, বাবুদের বিলাসিতার স্মারকও না-থাকা হল না কলকাতায়। হুতোম লিখলেন, 'অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনুমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে স্মরণে রাখে।'

সংলাপ ছাড়া যেমন নাটক হয় না, ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে যেমন হয় না হ্যামলেট্, অনুরূপভাবে বাবুআনি বাদ দিয়ে বাবুকুলের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। আর এই বাবু-আনির ঠাট বজায় রাখতে বেচারিরা একদম ফুরিয়ে গেল।

আট বাবুর এক বাবু নীলমণি হালদারের কথাই ধরা যাক। বিত্তে ও বিলাসিতায় তাঁর বাদশাহী গরিমা ছিল পুরনো কলকাতায়। এঁর অগ্রজ ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ হালদার। সেকালে চুঁচুড়ার ডাকসাইটে ধনী। পে'র সাহেবের প্রাসাদ-প্রতিম বাগানবাড়ী হালদারমশাই এক ডাকে কিনে ফেলে-ছিলেন। আর এ বাড়ীতে তিনি যে আনন্দের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। অঢেল খানাপিনার ব্যবস্থা ছিল। বাঈজীরা আসত পশ্চিম থেকে। লখনৌ ফ্যাশানে চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা ও মাথায় বাঁকা টুপি পরে বাঈয়ের ভেড়ুয়া সেজে বাবু, সোজা গিয়ে বসতেন নাচের মসলিসে। তরল পানীয় টলমল করে উঠত কাঁচপাত্রে। দেখতে-দেখতে রাত ভোর হয়ে আসত। না, কেবল এসবই না। বাবুর চণ্ডীমণ্ডপেও ধুমধাম করে দুর্গা পুজো হত। সে আড়ম্বরের কথা বিজ্ঞাপিত হত কলকাতার কাগজে-কাগজে। মোটকথা লোকে বলত, 'বাবু তো বাবু হালদার বাবু।'

কনিষ্ঠ নীলমণি হালদারও ওইভাবে নাম কিনেছিলেন। বাবু মহলে ছিল তাঁর অসম্ভব খাতির।—হঠাৎ একদিন এ খাতির উবে গেল। হুতোমের উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে—নদীর স্রোতের মত, বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত একদিন সব আড়ম্বর কোথায় যেন গেল হারিয়ে। শোনা গেল, কারেন্সী নোট ও কোম্পানীর কাগজ জাল করছিলেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দ্বীপান্তর। ছোটভাই

নীলমণি। হাতে-নাতে ধরা না-পড়ার দরুণ দ্বীপান্তরের দণ্ড থেকে কোন রকমে রেহাই পেলেন। তাঁর হল, সুদীর্ঘ কারাদণ্ড। বেচারীরা আজ ছিলেন বাদশাহ, কাল হয়ে গেলেন ফকির। হালদার বাড়াতে নেমে এল বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

অন্যে পরে কা কথা, মতিলাল শীলের কথাই ধরা যাক। তাঁর মত দানবীর ও দয়াশীল কে ছিলেন? অবশ্য সেকালে এ গুণগুলি বাবু-আনির অঙ্গ বলেই বিবেচিত হত। কৃপণ হলে ধনী হওয়া যেত, কিন্তু বাবুর স্বীকৃতি পাওয়া ছিল ভার। নিমু গোস্বামী ছিলেন এর উদাহরণ। অনেক পয়সা ছিল তাঁর, কিন্তু ছিল না তাঁর পাল-পার্বণ। চৈত্র মাসের রাসটুকুই তিনি কেবল জাঁকিয়ে রাখতেন। অনেক বাঁশ খাটিয়ে মঞ্চ বানাতেন। ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি দিয়ে আলোক সজ্জা করতেন বটে, তবে তা তেমন ঝলমলে হত না। ফলে, লোকজনের কটু-কাটব্য তাঁকে শুনতেই হত। নিন্দুকের মুখে-মুখে নিমুর সম্পর্কে একটি ছড়া প্রায়ই ঘুরে বেড়াত এবং তা হল,—

'জন্মের মত কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস,
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাই—বোঝা-বোঝা বাঁশ।'

মতিলাল শীল ছিলেন নিমুর ঠিক একেবারে উল্টো পিঠ।—তাঁর জন্ম হয়েছিল লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে। উনিশ শতক আসার আট বছর আগে। যৌবনে তিনি কলকাতার কেল্লায় একটি কাজ পেলেন। কেরানীগিরির কাজ। এই সঙ্গে আরম্ভ হল ছিপি-বোতলের ব্যবসা। এর পরে হলেন মুৎসুদ্দি। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছে করতেন মাল দেওয়া-নেওয়া। ক্যাপ্টেনদের ছেড়ে একদিন তিনি ধরলেন বড় বড় সওদাগরী হৌস। এইভাবে অতি অল্প সময়ের ভেতর উপার্জন করলেন প্রভূত ঐশ্বর্য। অপরিমিত বিত্ত।

এ বিত্তের অধিকাংশই ব্যয় করলেন দান-ধ্যানে। তারপর সিপাহী যুদ্ধের বছর তিন আগে স-সম্মানে ও সগৌরবে তিনি ত্যাগ করলেন ইহলোক।

কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের পরই নানারকম আজগুবি গল্প ফিরতে লাগল লোকের মুখে-মুখে। অনেকেই বলল, তিনি মারা যান নি। মারা যাবার ছল করে বসে আছেন গা-ঢাকা দিয়ে। কেন?—কেন? স্বভাবতই আরেক দলের মুখে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হল। আজগুবি গল্প তখন জানাল যে, কোন এক অপকর্মের দায়ে প্রিভিকাউন্সিলের কাছে নাকি শীলমহাশয় অভিযুক্ত হয়েছেন। শাস্তি পেয়েছেন নির্বাসন। আর সেই নির্বাসন দণ্ড এড়াবার

জন্যই নাকি গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছেন মতিলাল শীল। আঠারোশ চুয়ান্ন সালের তিরিশে জুনের 'হরকরা' কাগজে এ কিংবদন্তীর বিবরণ তুলে ধরা হল,—

'It is said that the great millionaire is not really dead but that he has made away with himself with the object of avoiding the consequences of a sin which has been given against him by the Privy Council, by whose decision he has made himself liable to transportation.'

হায়! দানশীল মতিলালের চরিত্রে এ কি কলঙ্কলেপন! যাঁর শ্রাদ্ধে তিন লাখ টাকা খরচ হতে চলেছে, তাঁকে নিয়ে একি রসিকতা! মহিষাদলের রাজার সম্পত্তি এক লাখ টাকার দায়ে কেড়ে নিচ্ছিলেন বলেই কি এই কলঙ্কারোপ?

না, মতিলাল সম্পর্কে এই অবমাননাকর গল্প কেউ বিশ্বাস করে নি। হরকরা এ রটনাকে বলেছিল—'অ্যাবসার্ড স্টোরি।' আর কালা-আদমিদের এ গুজব-প্রিয়তার ওপর টিপ্পনি কেটে লিখেছিল,—

'We mention it as a good example of native mendacity on the one hand and native credulity on the other.'

কেবল গুজব-প্রিয়তা নয়, দেশীয় লোকদের মন যে কত রিক্ত এ কিংবদন্তী হ'ল তার প্রমাণ।

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করল না কেউ, 'কেন এ রিক্ততা?' সাধারণ মানুষের মন বাবুদের সম্পর্কে রিক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁদের পরিণতি দেখেই। বেশীর ভাগ বাবুই মরবার আগে অসম্মানের মালা পরেছিলেন গলায়। তাই সাধারণ মানুষ ভেবেছিল—মতিলালও ঐ বাবুদের থেকে আলাদা কিছু নন। তিনিও আর পাঁচটা বাবুর মতন।

সাধারণের চোখেই কেবল নয়, বাবুদের গৌরব ছোট হয়ে এলো তাঁদের অনুগতদের কাছেও। বিশেষ ভৃত্যমহলে। কে বাবু, কে নফর তা চেনা দায় হয়ে উঠল। দারোয়ানরা গোঁফে তা দিয়ে বাবুর ওপরেও বাবুগিরি করতে থাকল। আর এ কর্তৃত্ব যে কি ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক হুতোমে তার বিবরণ আছে।

সেবার এক বাগবাজারের বাবুর জন্মতিথি। তখন ইংরেজী প্রথায় জন্ম-তিথির খুব চল। গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, নতুন কাপড় পরে

দেশীয় প্রথায় যে জন্মতিথি পালিত হয়ে থাকে, সেদিন তা পরিত্যক্ত। কুটুম্ব ভোজনটিও যথারীতি বাদ। তবে বন্ধু-বান্ধব পেয়েছে নতুনতর মর্যদা। ঘেটের কোলে ঘাটে পা দিয়ে অনেকেই সেদিন বাবুর মর্যাদায় পালন করছেন জন্মতিথি। বাড়ীর গেট সাজানো হত গ্যাসের আলোয়। তারপর ?—তারপর বেতর গোছের আমোদ। নাচ ও ইংরেজী খানার চূড়ান্ত। চোহেলের একশেষ। চুলে ও গোঁফে কলপ লাগিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচের আসরে গিয়ে বস।—এসব ছিল জন্মদিনের বাবু-আনি।

বাগবাজারের বাবু এ ধরনের আড়ম্বর-এর ভেতর গেলেন না। কেবল গুটি-কতক ফ্রেণ্ডকে খাওয়াবেন, এটুকুই সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং তদনুসারেই চলল উদ্যোগ-আয়োজন।

জন্মতিথির দিন সকাল থেকে লেগে গেল বাদলা। সে বাদলায় সবই এসে পৌছুল। কিন্তু যা এলো না, তাহ'ল মাছ। আর মাছ ছাড়া বাঙ্গালী বাড়ী কি ভোজ হয় ? বিশেষত তা যদি আবার বাবুর বাড়ি হয় ! এদিকে নিমন্ত্রিত অতিথিরা দেখা দিতে থাকলেন গুটি-গুটি। একে-একে এলেন বন্ধু-বান্ধব।

মাছের জন্য বাবু বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বড়ই। নানান জায়গায় লোক পাঠালেন। হুকুম দিলেন, যে করেই হোক মাছ চাই।

এমন সময় হঠাৎ সের দশ-বারো ওজনের একটি রুই মাছ কাঁধে করে এক জেলে এসে হাজির। এ অভাবিত ঘটনায় বাবু খুব খুশি। ভীষণ খুশি। উল্লাসে উতরোল। প্রফুল্ল মনেই তিনি জেলেকে জানালেন, 'বাপু, এটির দাম কে নেবে ?—তুমি ?—তা, তুমি যা দাম চাইবে তাই পাবে।'

জেলে জোড় হাত করে বলল, 'হুজুর, এর দাম সামান্য। বিশ ঘা জুতো মারলেই এ মাছ পাবেন।'

বিশ ঘা জুতো ? এ আবার কেমন দাম ? বাবু ভাবলেন ঐ জেলেটির বোধহয় মাথা খারাপ। আর বাদলার দিনে একপাত্র চড়িয়ে এসে মাতলামী করাও কিছু বিচিত্র নয়। অনেকে তার এই উদ্ভট কথা নিয়ে মজা করতে থাকল। কেউ-কেউ আবার আরম্ভ করে দিল ঠাট্টা-মস্করা।—জেলে কিন্তু তার মতে অটল। বিশ টাকা নয়, বিশ ঘা জুতো পেলেই সে খুশি। আর ঐ বিশ ঘা জুতো পেলেই সে মাছ হস্তান্তর করবে। নতুবা নয়।

শেষ-বেশ ঐ দামেই রাজী হতে হল বাবুকে। রাজী হলেন তিনি জেলেকে বিশ ঘা জুতো মারতে। তবে আস্তে-আস্তে। এক-এক ঘা করে।

এক-এক করে সবে যখন দশ ঘা মেরেছেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠল জেলে। বলল : 'হুজুর এবার থামতে হবে। আমার একজন অংশীদার আছে, বাকীটা তার পাওনা।'

বাবু বললেন, 'কে সে অংশীদার ? কোথায় সে ?'

জেলে জোড় হাত করে বলল, হুজুর, সে অংশীদার হল আপনার দরওয়ান। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে কিছুতেই সে ভেতরে ঢুকতে দিতে চায় নি। অর্ধেক দাম কবুল করে তবে হুজুরের দেখা পেয়েছি। এবার বাকী দশ ঘা জুতো তাই তারই পাওনা।'

দামের রহস্যটি জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বাবু বুঝলেন যে তাঁর ওপরও একজন আছে। তিনি দারোয়ান হলেও বাবুর-বাবু। জেলের কল্যাণে বাবু এঁকে আবিষ্কার করেছিলেন। দশ ঘা জুতোও হয়ত তাকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে একবারে জবাব দিতে পেরেছিলেন কি না তা জানা যায় না। অন্ততঃ হুতোম সে তথ্য বিবৃত করেন নি।

বাবু গৌরব সেদিন অস্তাচলে। তাই এ অনুমান বোধহয় মিথ্যা নয়, প্রতাপশালী ভৃত্যের প্রভুত্বই বাবু সেদিন মেনে নিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। নতমস্তকে।

তবে এর থেকেও চমকপ্রদ ঘটনা আছে। তা একাধারে মনোরম ও রোমহর্ষক। আর বাবু-আনির সেখানে চূড়ান্ত।

গণিকা চর্চাটি বাবুদের যে প্রধানত বিলাস তা আগেই বলা গেছে। এটি না থাকলে বাবুই হন না। বড়লোকদের এটি এলবাত পোশাক। বিকেল হতে যা দেরী, বাবুরা বগী হাঁকিয়ে সেজে-গুজে চললেন বাগান-বাড়ী। ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী। কে দেখবে তাকে ? কে থাকবে তার পাহারায় ?—না, শেষ আমলের বাবুরা সেদিকে উদাসীন। যাঁরা ওরই ভেতর একটু সাবধানী, তাঁরা তাঁদের বৈঠকখানায় বসে গণিকা সম্ভাষণ করতেন। আর যাঁরা মা-বাপকে লুকিয়ে বেরিয়ে যেতেন অভিসারে তাঁরা চাকরদের ওপরই নির্ভর করতেন বেশী। শোবার ঘরে চাকরকে রেখে যেতেন স্ত্রীকে পাহারা দেবার জন্য। চাকর শুয়ে থাকত ঘরের মেঝেয়। আর স্ত্রী ? তিনি তুলসী পাতা ব্যবহার করে শুয়ে থাকতেন পালংকে।—গভীর রাতে বা তারও অনেক পরে আমোদ লুটে বাবু ফিরে এসে দরজায় টোকা মারতেন। চাকর চটপট উঠে দরজা খুলে দিত।

বাবু খুব খুশি মনেই বিছানায় আশ্রয় নিতেন। তাঁর স্ত্রীর চরিত্র ও কুস্থানের অভিসার দুই-ই গোপন থাকত, এ কি কম কৌশলের কথা! হুতোম এঁদের সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেবার জন্য লিখেছেন—'পাঠকগণ যারা ছেলেবেলা থেকে 'ধর্ম যে কার নাম তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগ্য মোসাহেবই যাদের হাল' তারা যে সব রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাকবে, এ বড় আশ্চর্য নয়!'

না, আশ্চর্য নয়। শোনা যায় এক নবাব নিজে হাতে জুতো পরতে না-পারার জন্য শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। গর্দান গিয়েছিল। মৃত্যুকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন তবু নবাবী-আনা কালিমালিপ্ত করেন নি। শেষ বাবুরাও প্রায় তাই করেছেন। তাঁদের বেশ্যাবাজির জন্য এবং খেয়ালের শিকার হয়ে নিজের স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছেন চাকরের কাছে, একি কম গৌরবের কথা? পুরাণে-ইতিহাসে এহেন গৌরবোজ্জ্বল বংশ কটি আছে?

বাবুরা পুরাণ-ইতিহাস ছাড়া বলেই বোধহয় তাদের পারিজাতটুকুও হল দেশ-কাল ছাড়া। পাঠানদের হটিয়ে এসেছিল মুঘলরা, মুঘলদের হারিয়ে ইংরেজ। বাবুরা কিন্তু কাউকে হটায় নি, তারা এসেছিল নিজেরাই। সম্ভবত প্রাকৃতিক কারণে। 'বাবুদের তাই কেউ হটালো না, নিজেরাই খসে পড়ল। জীর্ণ পাতার মতন। টুপটুপ করে খসে পড়ল। গাছের তলা বিছিয়ে। তারপর প্রকৃতি নিজেই তাদের একদা দিলেন উড়িয়ে। দিলেন পরিষ্কার করে।

তবে তার আগের দিন পর্যন্ত বাবুরা কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী চেপেই চললেন।

রাজনারায়ণ বসু এঁদের সম্পর্কে লিখলেন, 'এখনকার বাবুরা অতি কৃপাযোগ্য, গাড়ী-ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না।'

এক বাবু চলেছিলেন বাড়ীর পথে। গাড়ী চড়ে। বাড়ী কলকাতার থেকে একটু দূর। হয়ত দমদম। হয়ত কাশীপুর। গাড়ীখানি চলেছিল ধীরে ধীরে। অতি ধীরে। গাড়ীর সঙ্গে যে ঘোড়াটি লাগান ছিল সেটি অত্যন্ত কৃশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। টেকচাঁদ ঠাকুর পক্ষিরাজের বংশধর। সপাসপ চাবুক পড়ছে পিঠে, কিন্তু ঘোড়ার চাল বদল হবার উপায় নেই। বাবু দু-দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছেন। হঠাৎ নিজেদের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পথ দিয়ে চলে যেতে দেখলেন বাবু। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন, 'শিরোমণিমশায়! আসুন, আমার গাড়ীতে আসুন।'

শিরোমণিমশায় একবার চোখ তুলে চাইলেন, তারপর বললেন, 'বাবু! আমার একটু তাড়া আছে। আমাকে শীঘ্র বাড়ী যেতে হবে।'

সুতরাং বাবুর ঘোড়ার গাড়ীতে শিরোমণিমশায়ের চাপা হল না। চারদিকে এসেছে তাড়া। কর্মব্যস্ততা ঘিরে ধরেছে সকলকে। বাবুদের কর্মহীন আলস্যের জগতে যাবার মতন বেকার লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া গেল না।

এরপর থেকেই বাবুরা হারিয়ে গেলেন। তরঙ্গায়িত বাবরি চুল আর দেখা গেল না। দেখা গেল না ঐ মানুষগুলিকে বুলবুলির লড়াইয়ে অথবা বাঈজীদের নাচের মজলিসে। বেড়ালের বিয়েতে কলকাতা কোন দিন আর মেতে উঠল না। কোন দিন না।

তরঙ্গক্ষুব্ধ নতুন যুগ এসে অতীতের সব স্মৃতি-চিহ্ন গেল মুছে দিয়ে। না ইতিহাস, না সমাজ কেউ এঁদের স্বীকৃতি জানাল না। বাবু বংশের ইতিহাসে নেমে এলো নিকষকালো রাত।